ফিচার সংকলন ১

সমৃদ্ধির সোপানে স্বদেশ

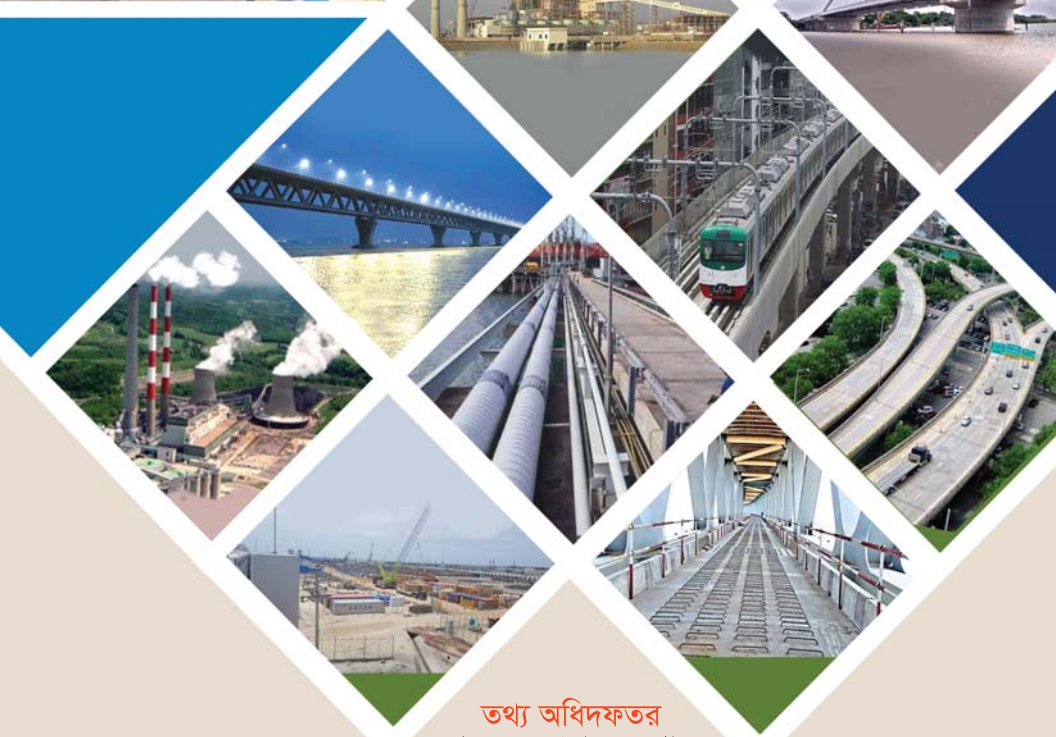

তথ্য অধিদফতর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

সমৃদ্ধির সোপানে স্বদেশ

ফিচার সংকলন-১

সমৃদ্ধির সোপানে স্বদেশ

তথ্য অধিদফতর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

ফিচার সংকলন-১
সমৃদ্ধির সোপানে স্বদেশ

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০২২

স্বত্ব©তথ্য অধিদফতর

প্রধান সম্পাদক
মো. শাহেনুর মিয়া, প্রধান তথ্য অফিসার

সম্পাদক
ইয়াকুব আলী, সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার

সম্পাদনা পরিষদ
পরীক্ষিৎ চৌধুরী, সিনিয়র তথ্য অফিসার
এ এম ইমদাদুল ইসলাম, সিনিয়র তথ্য অফিসার

সম্পাদনা সহকারী
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
সেলিনা আক্তার
মো. জামিন মিয়া
মো. মাহবুব সরকার
মো. রোকনুজ্জামান
মো. রেদোয়ান আল করিম

প্রচ্ছদ
মোমিন উদ্দীন খালেদ

গ্রাফিক্স
মো. ফাহাদ হোসেন

মুদ্রণ
মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং, ১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০
মূল্য : ৫০০.০০ টাকা

Shomriddhir Shopane Swadesh, a collection of articles
Published by Press Information Department (PID), Ministry of Information and Broadcasting
Bangladesh Secretariat, Dhaka-1000, Phone : 55100811, 55100138
Email : piddhaka@gmail.com
Price : TK. 500.00

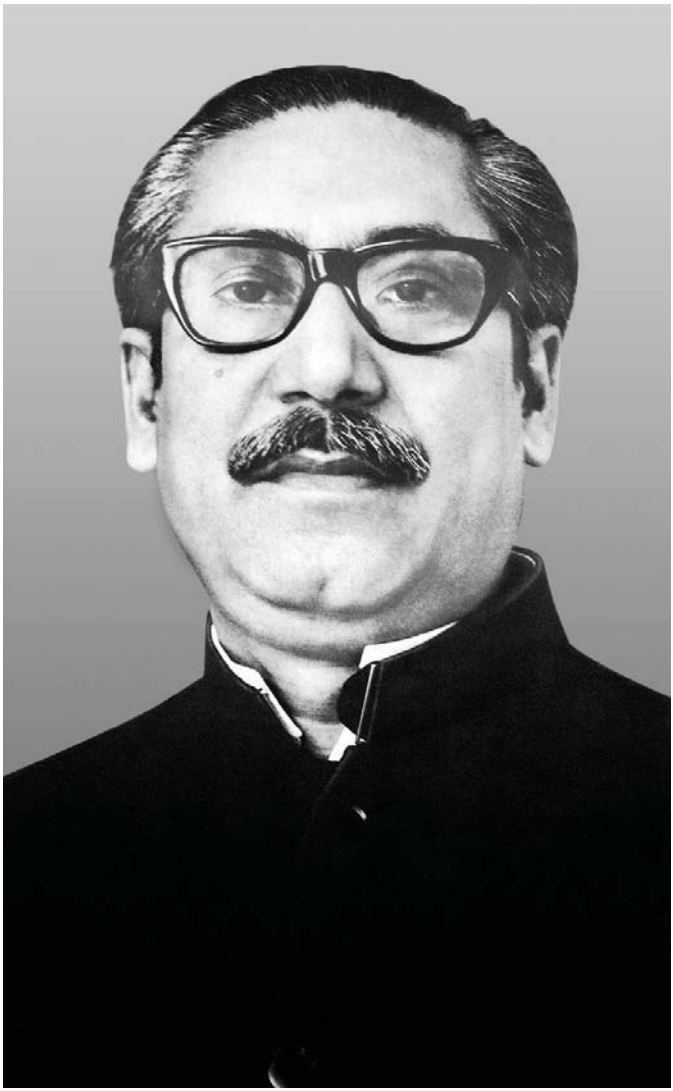

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ভূমিকা

গণমাধ্যমে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের প্রচারের দায়িত্ব তথ্য অধিদফতরের ওপর অর্পিত। প্রচার কাজের অংশ হিসেবে তথ্য অধিদফতর গণমাধ্যমে নিয়মিতভাবে ফিচার ও আর্টিকেল প্রকাশ করে থাকে। ১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ সময়কালে অধিদফতর দেড় শতাধিক ফিচার ও আর্টিকেল প্রচার-প্রকাশ করেছে। এগুলোর মধ্য হতে ৪১টি ফিচার ও আর্টিকেল বাছাই করে এ সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব ফিচার-আর্টিকেলের লেখকগণের অনেকেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের (এসডিজি) লক্ষ্যসমূহ এবং সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ওপর রচিত ফিচার-আর্টিকেল এবারের সংকলনে অগ্রাধিকার পেয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের নানা দিক ছাড়াও মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ, মানবাধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, জ্বালানি নিরাপত্তা, দুর্নীতি প্রতিরোধ, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, নারী ও শিশু অধিকার এবং পর্যটন ইত্যাদি বিষয়ের ওপর প্রকাশিত ফিচার এবারের সংকলনে স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য, লেখাগুলো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক ও অনলাইন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। এসব বিষয় নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে যারা কাজ করেন তাদের জন্য সংকলনটি সহায়ক হবে। এছাড়া সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও অগ্রাধিকার সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতে চান এমন অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্যও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভাণ্ডার হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমাদের আশা।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ এমপি এবং মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার মহোদয়ের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনায় আমাদের এ প্রয়াস আলোর মুখ দেখেছে। তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সম্পাদনা পরিষদসহ সংকলনটি প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

সূচিপত্র

'ঝড়-বৃষ্টি-আঁধার রাতে আমরা আছি তোমার সাথে' বাংলাদেশের আলোকবর্তিকা ॥ ১৫
তোফায়েল আহমেদ

হৃদরোগ প্রতিরোধে প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ ॥ ২২
ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিক

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী : মুক্তিযুদ্ধে সংবাদ-সাময়িকীপত্র ॥ ২৭
জাফর ওয়াজেদ

কসাই টিক্কা খান বিশ্ববিদ্যালয় চ্যান্সেলর! ॥ ৩৩
অজয় দাশগুপ্ত

করোনার সঙ্গে ডেঙ্গু ॥ ৩৭
অধ্যাপক ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ

মানবাধিকার, বঙ্গবন্ধু ও মানবিক মুল্যবোধ ॥ ৪২
নাছিমা বেগম, এনডিসি

বঙ্গবন্ধু হত্যা : প্রতিবাদী আন্দোলনের চাপা পড়া ইতিহাস ॥ ৪৭
মুহাম্মদ শামসুল হক

Juvenile Delinquency Efforts to Put Derailed Teenagers on Track ॥ ৫২
Md. Saifullah

টেকসই উন্নয়নে সরকার ও গণমাধ্যমের পারস্পরিক সহায়তা ॥ ৫৭
পরীক্ষিৎ চৌধুরী

বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধী বনাম আটকে পড়া বাঙালি ॥ ৬৪
জাফর ওয়াজেদ

পঞ্চাশে বাংলাদেশ ॥ ৭২
পাশা মোস্তফা কামাল

কিশোর অপরাধ : বিপথগামীদের ফেরাতে সরকারি উদ্যোগ ॥ ৭৬
মুহ. সাইফুল্লাহ

‘ওজোনস্তর রক্ষা করি, নিরাপদ বিশ্ব গড়ি’ ॥ ৮১
মো. আশরাফ উদ্দিন

আগামীর বাংলাদেশে প্রবীণরা থাকবেন নিরাপদে ॥ ৮৬
মাসুমুর রহমান

বাংলাদেশ ও একজন শেখ হাসিনা ॥ ৮৯
মোতাহার হোসেন

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল ॥ ৯২
নাসরীন মোস্তফা

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ॥ ৯৭
মীর মোহাম্মদ আসলাম উদ্দিন

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে চামড়াশিল্প ॥ ১০১
এ এইচ এম মাসুম বিল্লাহ

Bangabandhu’s Historic 7 March Speech A Masterpiece by a Poet of Politics ॥ ১০৪
Taslima Akter

শিশুদের সাঁতার শেখানোর আবশ্যকতা ॥ ১১০
মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান

একজনই শেখ হাসিনা : কেন তাঁকে নিয়ে লিখব ॥ ১১৩
আফরোজা নাইচ

আমার গ্রাম, আমার শহর ॥ ১১৭
ইমদাদ ইসলাম

কোরবানির চামড়ার ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতে গৃহীত পদক্ষেপ ॥ ১২০
মো. আব্দুল লতিফ বকসী

লেখক বঙ্গবন্ধু : ‘যেন অগ্নি-উগারী বান’ ॥ ১২৪
পরীক্ষিৎ চৌধুরী

তথ্যপ্রবাহ দুর্নীতি হ্রাস করে ॥ ১৩০
সাঈদ হাসান

টেকসই আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সরকারের অঙ্গীকার ॥ ১৩৪
রেজাউল করিম সিদ্দিকী

বিশ্ব মান দিবস হোক ভোক্তার অধিকার ॥ ১৩৮
তারিক মোহাম্মদ

প্রতিষ্ঠিত হোক সকল শিশুর অধিকার ও সুরক্ষা ॥ ১৪৩
মো. আলমগীর হোসেন

বৈষম্য নয়, বন্ধন ॥ ১৪৮
মাহবুবুর রহমান তুহিন

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন : প্রয়োজন জনসচেতনতা ॥ ১৫২
মোছা. সাবিহা আক্তার লাকী

উদ্ভাবনের হাত ধরেই আগামীর পৃথিবীতেও ডাকসেবার প্রয়োজনীয়তা অব্যাহত থাকবে ॥ ১৫৬
ম. শেফায়েত হোসেন

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব প্রতিরোধ ॥ ১৬০
তানজিনা পারভিন

Skilled youth for developed nation ॥ ১৬৪
A H M Masum Billah

আমার শৈশব, আমার অধিকার ॥ ১৬৮
কাজী শাম্মীনাজ আলম

ডিজিটাল বৈষম্য : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ॥ ১৭২
মো. বেলায়েত হোসেন

বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা ও আজকের কৃষি ॥ ১৭৫
মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন

আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস ২০২১ : আসুন, বাঘ সংরক্ষণে সরকারের সহযোগী হই ॥ ১৭৯
দীপংকর বর

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হাইকোর্টের নির্দেশনা ॥ ১৮৩
তসলিমা আক্তার

দুর্নীতি প্রতিরোধ : শুধু আইন নয়, বদলাতে হবে মানসিকতা ॥ ১৯০
মো. রমজান আলী

অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর অবদান ॥ ১৯৪
সেলিনা আক্তার

প্রবৃদ্ধির জন্য পর্যটন ॥ ১৯৮
মাহবুবুর রহমান তুহিন

নারীর প্রতি নির্যাতন বন্ধে চাই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ॥ ২০২
উম্মে ফারুয়া

‘ঝড়-বৃষ্টি-আঁধার রাতে আমরা আছি তোমার সাথে’ বাংলাদেশের আলোকবর্তিকা

তোফায়েল আহমেদ

বাংলার গণমানুষের নন্দিত নেত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আজ ৪১ বছর পূর্ণ হলো। ১৯৮১ সালের ১৭ মে নির্বাসিত জীবনের অবসান ঘটিয়ে স্বজন হারানোর বেদনা নিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রিয় মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন। যেদিন প্রিয় নেত্রী স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন সেদিন শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল না, ছিল সর্বব্যাপী সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ। স্বৈরশাসনের অন্ধকারে নিমজ্জিত স্বদেশে তিনি হয়ে ওঠেন আলোকবর্তিকা, অন্ধকারের অমানিশা দূর করে আলোর পথযাত্রী। দীর্ঘ চারটি দশক অত্যাচার-অবিচার, জেল-জুলুম সহ্য করে নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতার সাথে আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব দিয়ে চারবার গণরায়ে অভিষিক্ত করে সরকার গঠন করে রাষ্ট্র পরিচালনায় যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। পঁচাত্তরের পর আওয়ামী লীগ যখন ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছিল, সেই দুঃসময়ে তিনি দলের হাল ধরেন। সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা তখন সামরিক শাসনের দুঃশাসনে নিপতিত। স্বৈরশাসনের অবসান ঘটাতে তিনি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ’৮১-এর সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার ওপর দলের নেতৃত্বভার অর্পণ করে তাঁর হাতে আমরা তুলে দিয়েছিলাম দলের রক্তেভেজা সংগ্রামী পতাকা। যেদিন তিনি প্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরে এলেন সেদিন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা মনে করেছিলেন শেখ হাসিনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকেই ফিরে পেয়েছেন। ’৭৫-এর ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর কতিপয় বিপথগামী বিশ্বাসঘাতকের হস্তে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু নির্মমভাবে নিহত হন। নিষ্পাপ শিশু রাসেলকেও সেদিন হত্যা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা যদি সেদিন দেশের বাইরে না থাকতেন তাঁরা আমাদের মধ্যে থাকতেন না। দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পান। দৃঢ়তা ও সক্ষমতা নিয়ে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে সংবিধানকে কলঙ্কমুক্ত করে জাতির পিতার হত্যার বিচারের কাজ শুরু করেন। ২০০১-এ বিএনপি ক্ষমতায় এসে সেই

বিচার বন্ধ করে। ২০০৮-এর নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে তিনি শুধু বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের কাজই সম্পন্ন করেননি, মানবতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাজ করে চলেছেন। সমগ্র বিশ্ব যখন করোনা মহামারিতে আজ বিপর্যস্ত, তখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার দেশের মানুষের জন্য বিনা মূল্যে টিকার ব্যবস্থা করেছে। এই ক্রান্তিকালেও তিনি লক্ষাধিক গৃহহীন মানুষকে ঘর তৈরি করে দিয়েছেন, যা জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ তথা মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে গৃহহীনদের জন্য উপহার।

'৭৫-এর পর কঠিন সময় অতিক্রম করেছি আমরা। স্বৈরশাসক জেনারেল জিয়ার নানা রকম ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও সফলভাবে কাউন্সিল অধিবেশন সম্পন্ন করার মাধ্যমে কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রের ঘৃণিত চক্রান্ত আমরা ব্যর্থ করতে পেরেছিলাম। কাউন্সিল অধিবেশনের সার্বিক সাফল্য কামনা করে সেদিন শেখ হাসিনা বার্তা প্রেরণ করে বলেছিলেন, 'আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে এগিয়ে যান।' বার্তাটি সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক সম্মেলনে পাঠ করেছিলেন। দলের শীর্ষ পদ গ্রহণে তাঁর সম্মতিসূচক মনোভাব সম্পর্কে কাউন্সিলরদের উদ্দেশে বলেছিলাম, 'আমরা সকলেই একটি সুসংবাদের অপেক্ষায় আছি।' শেখ হাসিনা তাঁর বার্তায় সর্বপ্রকার দ্বন্দ্ব-বিভেদ ভুলে 'আত্মসমালোচনা ও আত্মশুদ্ধির' মাধ্যমে কাউন্সিলর ও নেতাদের বঙ্গবন্ধুর কর্মসূচি সোনার বাংলা বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে গণবিরোধী স্বৈরশাসকের ভীতু মন কেঁপে উঠেছিল। দেশে ফেরার আগে স্বৈরশাসক জেনারেল জিয়ার নির্দেশে 'শেখ হাসিনা আগমন প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করা হয়। আওয়ামী লীগের সর্বস্তরের নেতাকর্মীকে এ ব্যাপারে সতর্ক ও সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়েছিলাম আমরা।

'৮১-এর ১৭ মে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বৃষ্টিমুখর দিনে বিকাল সাড়ে ৪টায় তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পদার্পণ করেন। সারা দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে সেদিন বিমানবন্দরে সমবেত হয়েছিল। লাখো জনতা 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানিয়ে আরো স্লোগান তুলেছিল–'শেখ হাসিনার আগমন শুভেচ্ছা-স্বাগত'; 'শেখ হাসিনা তোমায় কথা দিলাম, মুজিব হত্যার বদলা নেব'; 'ঝড়-বৃষ্টি-আঁধার রাতে, আমরা আছি তোমার সাথে'; 'বঙ্গবন্ধুর রক্ত বৃথা যেতে দেব না'; 'আদর্শের মৃত্যু নেই, হত্যাকারীর রেহাই নেই'। বিমান বন্দর থেকে প্রিয় নেত্রীকে নিয়ে যখন মানিক মিয়া এভিনিউতে যাই রাস্তার দুই পাশে লক্ষ লক্ষ লোক। এমন

দৃশ্য যা বর্ণনাতীত। সভামঞ্চে উঠে ক্রন্দনরত অবস্থায় সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'আমি সর্বহারা। আমার কেউ নেই। আপনাদের মাঝেই আমার হারানো পিতা-মাতা, আমার ভাই, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে আমি খুঁজে পেতে চাই। আপনাদের কথা দিলাম এই দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য আমি জীবন উৎসর্গ করব।' মানিক মিয়া এভিনিউয়ের জনসমুদ্রে সর্বস্তরের জনতার উদ্দেশে বক্তৃতায় জাতির কাছে যে অঙ্গীকার তিনি ব্যক্ত করেছিলেন পরবর্তী সময়ে সেসব প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করে আজও তা অব্যাহত রেখেছেন।

দেশে ফেরার পর তাঁর নেতৃত্বে সামরিক শাসনবিরোধী দুর্বার গণ-আন্দোলন সংঘটিত হয়। তৎকালীন সামরিক শাসকের নির্দেশে '৮৩-এর ফেব্রুয়ারিতে তাঁকেসহ আমাদের সামরিক গোয়েন্দারা চোখ বেঁধে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায় এবং বিনা কারণে একটানা ১৫ দিন আটকে রাখে। '৮৪-এর ফেব্রুয়ারি ও নভেম্বরে তাঁকে ফের গৃহবন্দি করা হয়। '৮৫-এর মার্চে তাঁকে তিন মাস এবং আমাকে ছয় মাস বিনা বিচারে আটকে রাখে। জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী থাকা সত্ত্বেও '৮৬-এর ১০ নভেম্বর তিনি যখন সচিবালয় অবরোধ কর্মসূচির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তখন পুলিশ তাঁর প্রতি গুলিবর্ষণ করে এবং জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে গাড়িতে উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় তাঁর গাড়ি ক্রেন দিয়ে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে। পরদিন ১১ নভেম্বর তাঁর বিরুদ্ধে ১ মাসের আটকাদেশ দেওয়া হয়। '৮৮-এর ২৪ জানুয়ারি চট্টগ্রামে তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর গাড়িবহরে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। সেদিন বঙ্গবন্ধুকন্যাকে রক্ষায় প্রায় অর্ধশত নেতাকর্মী প্রাণ বিসর্জন দেন। '৯০-এর ২৭ নভেম্বর স্বৈরাচার কর্তৃক জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর শেখ হাসিনাকে বঙ্গবন্ধু ভবনে অন্তরীণ করা হয়। প্রবল গণরোষের ভয়ে সামরিক সরকার ওই দিনই তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। '৯৪-এ তাঁর আহ্বানে ট্রেন মার্চের সময় ঈশ্বরদী রেলস্টেশনের উত্তর প্রান্তে বন্দুকধারীরা তাঁর কামরা লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে। সেদিনও তিনি সৌভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যান। ২০০৯-এর ফেব্রুয়ারিতে পিলখানা হত্যাযজ্ঞের পর ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন ও নিউ ইয়র্ক টাইমসের ১৪-১৫ মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'আমি থামব না, এসব ষড়যন্ত্র উদঘাটন করতেই হবে। আমি নিজের জীবনের জন্য ভীত হয়ে পড়লে গোটা জাতি ভীত হয়ে পড়বে। আমি জানি, কিছু বুলেট আমায় তাড়া করছে।' সত্যিই ঘাতকের চোখ শেখ হাসিনার ওপর থেকে সরে যায়নি। ঘাতকের সর্বশেষ নিষ্ঠুর আঘাত এসেছিল ২০০৪-এর

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার মধ্য দিয়ে। সেদিন নেত্রী প্রাণে বেঁচে গেলেও জীবন দিতে হয়েছে আইভী রহমানসহ আওয়ামী লীগের ২৪ জন নেতাকর্মীকে। শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে সর্বমোট ২১ বার হামলা করা হয়েছে। অকুতোভয় শেখ হাসিনার বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি আমাদের মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতোই অসীম সাহসী, চিত্ত তাঁর ভয়শূন্য!

জাতির পিতা দুটি লক্ষ্য নিয়ে রাজনীতি করেছেন। একটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা, আরেকটি অর্থনৈতিক মুক্তি। তিনি আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন, অর্থনৈতিক মুক্তি দিয়ে যেতে পারেননি। অর্থনৈতিক মুক্তির সেই অসমাপ্ত কাজটি দক্ষতা, নিষ্ঠা ও সততার সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাস্তবায়িত হচ্ছে। '৯৬ থেকে ২০০১ এবং ২০০৯ থেকে আজ পর্যন্ত শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক বিশ্বে মর্যাদার আসনে আসীন করেছেন। শেখ হাসিনার শাসনামলের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে দেখব, বিস্ময়কর উত্থান বাংলাদেশের। 'বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট' উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে আমরা ৫৭তম দেশ হিসেবে স্যাটেলাইট ক্লাবের গর্বিত সদস্য হয়েছি। এই একটি কারণে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের সুনাম অনন্য উচ্চতায় উঠেছে। 'নিউক্লিয়ার নেশন' হিসেবে আমরা বিশ্ব পরমাণু ক্লাবের সদস্য হয়েছি। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হতে জাতিসংঘের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের যেসব শর্ত রয়েছে, ইতোমধ্যে বাংলাদেশ তা পূরণ করে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে প্রবেশ করেছে। পদ্মা সেতুতে বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন বন্ধ করার পরেও দৃঢ়তার সাথে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর কাজ শুরু করে আজ তা সমাপ্ত। আর্থ-সামাজিক বিকাশ নিশ্চিত করার ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচকে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের শীর্ষ পাঁচটি দেশের একটি। সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের কৃতিত্বের জন্য জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এ পর্যন্ত বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত করেছে।

মানবসূচক উন্নয়নে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় বিস্মিত জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন বলেছেন, 'অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের উচিত বাংলাদেশকে অনুসরণ করা।' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত বছরগুলোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং মাথাপিছু আয় যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, এই হার অব্যাহত থাকলে সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, '২০৪১-এর মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত

দেশে উন্নীত হবে।' শিক্ষার হার বেড়েছে, দারিদ্র্যের হার কমেছে, শিল্প ও কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে, নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে। বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত গ্রামগুলো শহরে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রিয় মাতৃভূমির স্বার্থকে সমুন্নত রাখতে শেখ হাসিনা অঙ্গীকার করেছিলেন, '৫০ বছরের গ্যাসের মজুদ না রেখে আমি গ্যাস রফতানি করব না।' সেই অঙ্গীকার তিনি সমুন্নত রেখেছেন এবং দেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতকে শক্তিশালী করতে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। '৯৬-এ তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব লাভের পর পার্বত্য শান্তি চুক্তি করেছেন। '৯৮-এর বন্যায় ভিজিএফ কার্ড প্রবর্তনের মাধ্যমে বন্যার্ত প্রায় তিন কোটি মানুষকে নিরবচ্ছিন্নভাবে খাদ্য সরবরাহ করেছেন, যা এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। ফারাক্কার পানিবণ্টনে বঙ্গবন্ধু সরকার শুষ্ক মৌসুমে পেয়েছিল ৪৪ হাজার কিউসেক পানির নিশ্চয়তা। পানি সমস্যার সমাধানে তিনি ঐতিহাসিক গঙ্গাচুক্তি করেছেন। চুক্তি অনুযায়ী পাওয়ার কথা ৩৪ হাজার কিউসেক, অথচ তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে শুষ্ক মৌসুমে ৬৪ হাজার কিউসেক পর্যন্ত পানি পাওয়া গেছে। '৯৬-এ আওয়ামী লীগ যখন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে তখন দেশের খাদ্য ঘাটতি ছিল ৪০ লাখ মেট্রিক টন। সেই খাদ্য ঘাটতি পূরণ করে বাংলাদেশকে তিনি উন্নীত করেছেন খাদ্য রপ্তানিকারক দেশে। পার্বত্য অঞ্চলে অশান্তি দূর করে ঐতিহাসিক 'শান্তিচুক্তি' সম্পাদন করেছেন। ২০১৪-এর ৭ সেপ্টেম্বর ইউনেস্কোপ্রধান ইরিনা বোকোভা শেখ হাসিনার হাতে 'শান্তিবৃক্ষ' পদক তুলে দেওয়ার সময় বলেছিলেন, 'সাহসী নারী শেখ হাসিনা সারা পৃথিবীকে পথ দেখাচ্ছেন।' দারিদ্র্য মোচন, শান্তি স্থাপন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, সুশাসন, মানবাধিকার রক্ষা, আঞ্চলিক শান্তি, জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য খাতে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে নারী ও শিশুমৃত্যুর হার কমানো এবং ক্ষণধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁর প্রশংসনীয় অবদান বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০১৫-এর ২৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ৭০তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে পরিবেশবিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়নস অব দি আর্থ' প্রদান করা হয় তাঁকে। নির্যাতিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে মানবতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সারা বিশ্বে তিনি পরিচিত হয়েছেন 'মাদার অব হিউম্যানিটি' উপাধিতে। বিশ্বের খ্যাতনামা বিভিন্ন বিদ্যাপীঠ তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে।

২০০৮-এর নির্বাচনে জয়লাভের পর শেখ হাসিনা ভারতের সাথে সীমান্ত চুক্তি ও সমুদ্রসীমা নির্ধারণ চুক্তি করেন। তাঁর নেতৃত্বে দেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে

অতিকায় সব মেগাপ্রজেক্ট। পদ্মা রেল সেতু সংযোগ প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, রামপাল মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট, মাতারবাড়ী আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট, মহেশখালী এলএনজি টার্মিনাল, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল, ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট প্রকল্প তথা মেট্রো রেল, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর এবং দোহাজারী থেকে ঘুমধুম পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের উদ্যোগ–এ সবই তাঁর নেতৃত্বে যুগান্তকারী কাজ। বিদ্যুৎ উৎপাদনে তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন। পূর্বসূরিদের রেখে যাওয়া বিদ্যুতের বিপুল ঘাটতি সাফল্যের সাথে মোকাবিলা করে জনজীবন থেকে লোড শেডিং দূর করেছেন। দেশে বিদ্যুতের ইনস্টলড ক্যাপাসিটি এখন ২৫,৫১৪ মেগাওয়াট। বিগত বছরে রাজধানী ঢাকার উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন। ফলে ঢাকার চেহারাই পাল্টে গিয়েছে। নয়নাভিরাম হাতিরঝিল প্রকল্প, চলাচলের সুবিধার জন্য নিত্যনতুন ফ্লাইওভার তাঁর অবদান। দেশের মানুষ বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের সুবিধা ভোগ করতে শুরু করেছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। আগামী জুন মাসে যান চলাচলের জন্য পদ্মা সেতু খুলে দেওয়া হবে। ঢাকা শহর যানজটমুক্ত করতে মেট্রো রেলের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে মেট্রো রেল চালু হয়েছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ সকল ক্ষেত্রে এগিয়ে।

সামাজিক জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে আজ আমরা এগিয়ে চলেছি। তিনি নিয়মিত পড়াশোনা করেন। ক্যাবিনেট মিটিংগুলোতে যথাযথ হোমওয়ার্ক করে সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে মিটিংয়ে আসেন। একনেক বা ক্যাবিনেট মিটিংয়ের দু-এক দিন আগেই মিটিংয়ের আলোচ্যসূচি, প্রস্তাবাবলি ফাইলে দেওয়া হয়। যখন একটি বিষয় প্রস্তাব আকারে পেশ করা হয়, তখন সেই বিষয়ের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো তিনি সভায় সবিস্তারে তুলে ধরেন এবং সঠিকভাবে প্রতিটি প্রস্তাবের ওপরে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁর এই অবাক করা প্রস্তুতি সকলকে মুগ্ধ করে। সারা দিন তিনি কাজ করেন। ভীষণ পরিশ্রমী, হাস্যোজ্জ্বল ও আবেগময়ী মানুষ তিনি। ধর্মপ্রাণ হিসেবে প্রতি প্রত্যুষে তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামাজ আদায় করে তবেই তিনি দিনের কাজ শুরু করেন। পিতার মতোই গরিবের প্রতি তাঁর দরদ অপরসীম। বঙ্গবন্ধুর ফান্ড আমার কাছে থাকত। তিনি গরিব-দুঃখী মানুষকে অকাতরে সাহায্য করতেন। আমাকে নির্দেশ দিতেন তাদের সাহায্য

করো। জাতির পিতার কন্যার কাছে গরিব-দুঃখী মানুষ যখন হাত পাতে পিতার মতো তিনিও তাদের সাহায্য করেন। আমাদের দেশে যাঁরা বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক, সমাজসেবক তাঁদের বিপদাপদে পাশে দাঁড়ান। একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা শেখ হাসিনা একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক। পিতা-মাতার মতো সাদামাটা জীবনে অভ্যস্ত সংস্কৃতবান এবং খাঁটি বাঙালি নারী তিনি। বাংলার মানুষের প্রতি তাঁর দরদ এবং মমত্ববোধ, তাঁর জ্যোতির্ময় পিতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চেতনা থেকে আহরিত। তবে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে তিনি শুধু বঙ্গবন্ধুকন্যা হিসেবে পরিচিত; বরং আপন যোগ্যতায় স্বমহিমায় বাংলার কোটি মানুষের হৃদয়ে তিনি অধিষ্ঠিত। শুধু বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়ক নয়, আন্তর্জাতিক নেতা হিসেবে ইতোমধ্যে বিশ্বজনমত ও নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণে তিনি সক্ষম হয়েছেন।

একটা কথা মাঝে মাঝে মনে হয়, সেদিন শেখ হাসিনার হাতে যদি আওয়ামী লীগের পতাকা তুলে দেওয়া না হতো তাহলে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার ও মানবতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাংলার মাটিতে হতো না। যেখানে বেগম খালেদা জিয়া যুদ্ধাপরাধী-মানবতাবিরোধী অপরাধীদের গাড়িতে জাতীয় পতাকা তুলে দিয়ে বাঙালি জাতিকে কলঙ্কিত করেছিলেন, সেখানে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে বাংলার মানুষকে কলঙ্কমুক্ত করে চলেছেন। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি যা বিশ্বাস করতেন, তা-ই পালন করতেন; একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে তার সাথে আপস করতেন না এবং ফাঁসির মঞ্চে গিয়েও মাথা নত করতেন না। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাও জাতির পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে সেই আদর্শ অর্জন করেছেন। তিনিও লক্ষ্য নির্ধারণ করে কাজ করেন এবং সেই লক্ষ্য পূরণে থাকেন অবিচল। আজ ভাবতে কত ভালো লাগে, সেদিন বঙ্গবন্ধুর রক্তেভেজা আওয়ামী লীগের পতাকা শেখ হাসিনার হাতে তুলে দিয়ে আমরা যে সঠিক কাজটিই করেছিলাম তা প্রমাণিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে আলোকিত করে চলেছেন। সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ হবে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা।

লেখক : আওয়ামী লীগ নেতা; সংসদ সদস্য; সভাপতি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

হৃদরোগ প্রতিরোধে প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ

ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিক

বর্তমানে কোভিড-১৯-এর ফলে বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যব্যবস্থার ওপর প্রভাব পড়েছে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মচাঞ্চল্য স্থবির হওয়ায় অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারত্ব দেখা দিয়েছে। মানুষ জানে না এই মহামারি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসতে আরো কত দিন লাগবে। তবে ভ্যাকসিন নিতে হবে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে; যেমন–বারবার হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে, বাড়ির বাইরে গেলে সার্বক্ষণিক মাস্ক ব্যবহার করতে হবে এবং যতদূর সম্ভব জনসমাগমস্থল এড়িয়ে চলতে হবে। তবে বর্তমানে বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে বড়ো ঘাতক ব্যাধি হচ্ছে হৃদরোগ। এই রোগে প্রতিবছর বিশ্বে এক কোটি ৮৬ লাখের বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করে। কোভিড-১৯-এর ফলে সমগ্র বিশ্বে মৃত্যুবরণকারীর সংখ্যা ৪৬,৬৬,৩৩৪ (১৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত)।

আমাদের দেশেও প্রতিবছর প্রায় পৌনে দুই লাখ মানুষ হৃদরোগে মারা যায়, যা দেশের মোট মৃত্যুর ৩০ শতাংশ। এই হৃদরোগীদের বড়ো একটি অংশ অকালমৃত্যুর শিকার হয়, যা আমরা চাইলে সহজেই প্রতিরোধ করতে পারি। আমাদের মনে রাখা দরকার, হৃদরোগের মতো যেকোনো অসংক্রামক রোগের চিকিৎসার চেয়ে তা প্রতিরোধ করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একবার কেউ এই রোগে আক্রান্ত হলে তিনি আর পুরোপুরি সুস্থতা লাভ করতে পারেন না। তা ছাড়া তাঁদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় অন্যান্য রোগের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, বর্তমান বৈশ্বিক মহামারি কোভিডের এই সময়ে যেসব করোনা রোগীর হৃদরোগ, শ্বাসতন্ত্রের রোগ, ক্যান্সারের মতো অন্য অসুখ রয়েছে, করোনায় তাদের মৃত্যু ও জটিলতা বৃদ্ধির আশঙ্কা বেশি। তাই করোনার মতো এ ধরনের সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে হলে আমাদের অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে জোর দিতে হবে। কোভিডকালে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন অসংক্রামক রোগে আক্রান্তরা একাধিক ঝুঁকির মুখে রয়েছে। একদিকে তাদের করোনায় আক্রান্ত হলে জটিলতা বৃদ্ধির আশঙ্কা বেশি;

অন্যদিকে অনেকে করোনা সংক্রমণ এড়াতে গিয়ে নিয়মিত চিকিৎসাসেবা নিতে হাসপাতালের মতো জনাকীর্ণ এলাকায় যেতে পারছে না। তাই বর্তমান সময়ে এসব রোগীর ব্যাপারে আমাদের এখনই সচেতন হওয়া জরুরি। এ জন্য এ বছর বিশ্বজুড়ে বিশ্ব হার্ট দিবসের প্রতিপাদ্য রাখা হয়েছে–'Use heart to connect your heart', যার বাংলা করা হয়েছে, 'হৃদয় দিয়ে হৃদয়ের যত্ন নিন'।

এ বছর বিশ্ব হার্ট দিবসে হৃদরোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে জোর দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোভিড মহামারির কারণে অনেকেই বাইরে হাঁটতে যেতে পারছেন না। তাঁরা চাইলে ঘরে বসে হালকা ব্যায়াম করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে অনলাইনে নানা রকম ব্যায়ামের ভিডিও রয়েছে, যা সহজেই অনুসরণ করা যেতে পারে। আজকাল রক্তচাপ ও হার্টবিট পরিমাপে সক্ষম স্মার্টওয়াচ বাজারে পাওয়া যায়। এমন স্মার্টওয়াচ ব্যবহারের ফলে রোগীরা সব সময় তাঁদের শরীরের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারবেন। তা ছাড়া স্মার্টফোনে অনেক রকম অ্যাপ ব্যবহার করা যায়, যার মাধ্যমে রোগীরা সরাসরি ভিডিও কলের মাধ্যমে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন। ওয়ার্ল্ড হার্ট ফেডারেশনের মতে, বিশ্বের অর্ধেক জনগোষ্ঠী এখনো ইন্টারনেট সুবিধার বাইরে রয়েছে। এর ফলে তাঁরা হৃদরোগ প্রতিরোধ, নির্ণয় ও চিকিৎসার কাজে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এমন সুবিধাবঞ্চিত হৃদরোগীদের ঝুঁকি বেশি। অন্যদিকে যাঁরা এসব ডিজিটাল টুলের সুবিধা নিতে পারেন তাঁরা অনেকটা নিরাপদ। আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে হৃদরোগীরা তাঁদের পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, চিকিৎসক ও সেবা প্রদানকারীদের সাথে যুক্ত থাকতে পারেন। আমাদের দেশে বিপুলসংখ্যক মানুষ মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহার করে। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে দেশজুড়ে ইন্টারনেটের ব্যবহার অনেক বেড়েছে, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সহজ করেছে। বিশেষ করে করোনা মহামারির এই সময়ে চিকিৎসাক্ষেত্রে টেলিমেডিসিনসেবার প্রসার ঘটেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনা হেল্পলাইন রোগীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। একইভাবে হৃদরোগের মতো অসংক্রামক রোগগুলোর জন্যও একটি হেল্পলাইন করা যেতে পারে, যেখানে রোগের লক্ষণ, চিকিৎসা, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পেতে পারেন।

হৃদরোগের পেছনে নানা কারণ রয়েছে। যেমন–অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ, শাকসবজি ও ফলমূল না খাওয়া, ফাস্ট ফুড, চর্বিজাতীয় জিনিস বেশি খাওয়া, কায়িক পরিশ্রম না করা, তামাক ব্যবহার, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, অতিরিক্ত লবণ ও ট্রান্সফ্যাট গ্রহণ, স্থূলতা, বায়ুদূষণ ইত্যাদি। তাই এসব রোগ প্রতিরোধ সরকারের একার পক্ষে নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসাসেবার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। হৃদরোগ প্রতিরোধে আমাদের সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে দেশে হৃদরোগ প্রতিরোধে কাজ করে আসছে।

হৃদরোগ প্রতিরোধমূলক কাজের অংশ হিসেবে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি–এনসিডিসির সাথে Resolve to Save Lives, USA-এর সহযোগিতায় সিলেট বিভাগ এবং কিশোরগঞ্জ ও জামালপুর জেলার ৫৪টি উপজেলায় উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। এসব উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এনসিডি কর্নারে উচ্চ রক্তচাপ আক্রান্ত রোগী শনাক্তকরণ, নিবন্ধন ও ফলোআপ করা হয়। পাশাপাশি তাদের সরকার থেকে বিনা মূল্যে ওষুধও সরবরাহ করা হয়। এই কর্মসূচির ফলে উপজেলা হাসপাতালে নিবন্ধিত রোগীদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের হার অনেক বেড়েছে। মূলত মুজিবশতবর্ষ উপলক্ষে এনসিডিসি দেশজুড়ে ২০০ এনসিডি কর্নার স্থাপনের যে পরিকল্পনা নিয়েছে তার সাথে মিল রেখেই এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ হৃদরোগের অন্যতম প্রধান ঝুঁকি তামাকের ব্যবহার হ্রাসে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। বিভিন্ন সময়ে তামাক পণ্যের ওপর স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ নীতিমালা প্রণয়ন, তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা প্রণয়ন ইত্যাদি কাজে মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি এই বিষয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে নিয়মিত অ্যাডভোকেসিও করা হয়েছে।

তামাক নিয়ন্ত্রণে বর্তমান সরকার যথেষ্ট আন্তরিক। বিশ্বে প্রথম কোনো রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন, যা বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হয়েছে। এই ঘোষণা বাস্তবায়নে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল এফসিটিসির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার

নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। তাঁর সেই নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্যস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্প্রতি তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালী করতে উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনকে শক্তিশালী করতে কিছু ক্ষেত্রে সংশোধন দরকার তার মধ্যে রয়েছে : সব ধরনের গণপরিবহন ও পাবলিক প্লেসে তামাক ব্যবহার শতভাগ নিষিদ্ধ করা, দোকানে তামাকজাত দ্রব্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা, তামাক কোম্পানির সিএসআর নিষিদ্ধ করা, ই-সিগারেট আমদানি, উৎপাদন, বিক্রি ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা, তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে মুদ্রিত সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবার্তার আকার বৃদ্ধি করা এবং তামাক দ্রব্যের খুচরা বিক্রি নিষিদ্ধ করা। এই সংশোধনীগুলো আনা গেলে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি আরো কার্যকরভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে পারবে, ফলে দেশে অসংক্রামক রোগের প্রকোপ অনেকাংশে প্রতিরোধ করা যাবে।

প্রক্রিয়াজাত খাবারে লবণ ও ট্রান্সফ্যাট নিয়ন্ত্রণে শক্তিশালী নীতি প্রণয়ন ও কর্মসূচি গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান সরকার ইতোমধ্যেই 'খাদ্যে ট্রান্সফ্যাট এসিড নিয়ন্ত্রণ প্রবিধানমালা, ২০২১' প্রণয়নের খসড়া চূড়ান্ত করেছে। আশা করা যাচ্ছে, এটা অতি দ্রুত চূড়ান্ত করা হবে। খাবারে লবণ নিয়ন্ত্রণেও এমন বিধান করা উচিত।

হৃদরোগ প্রতিরোধে সরকারের নানা উদ্যোগের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পর্যায়েও সচেতনতা বাড়াতে হবে। বিশেষ করে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাওয়া, তামাক থেকে দূরে থাকা, জর্দা, সাদা পাতা না খাওয়া এবং নিয়মিত শরীরচর্চা করা অত্যন্ত জরুরি। সেই সাথে নিয়মিত ডায়াবেটিস ও রক্তচাপ পরিমাপ করতে হবে। ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের নিয়মিত ওষুধ সেবন করে যেতে হবে। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এসব ক্ষেত্রে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করছে। টেলিভিশন ও পত্রিকার পাশাপাশি জনসচেতনতা তৈরিতে বৈশ্বিক চর্চা অনুসারে বাংলাদেশে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে এ ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায়।

হৃদরোগ প্রতিরোধের পাশাপাশি চিকিৎসাসেবার বিস্তারেও নানামুখী উদ্যোগ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। তৃণমূল পর্যায়ে হৃদরোগের চিকিৎসা সহজলভ্য করে তুলতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে, বাংলাদেশে চিকিৎসা ব্যয়ের প্রায় ৭৪ শতাংশই রোগীকে বহন করতে হয়। তাই হৃদরোগের মতো ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে বহু মানুষকে প্রতিবছর দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে

যেতে হচ্ছে। অনেকে অর্থের অভাবে পর্যাপ্ত চিকিৎসাসেবা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানে সর্বজনীন স্বাস্থ্য বীমা বা ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ চালু করা জরুরি।

এভাবে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সম্মিলিত উদ্যোগ নেওয়ার মাধ্যমেই আমরা হৃদরোগসহ সব ধরনের অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবো। মনে রাখতে হবে, সুস্থ-সবল জাতি ছাড়া দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আমাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

লেখক : বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও হার্ট ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী : মুক্তিযুদ্ধে সংবাদ-সাময়িকীপত্র

জাফর ওয়াজেদ

ফিরে যদি তাকাই পেছনে, ৫০ বছর আগে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ পানে, তবে দেখতে পাই–মৃত্যু, নৃশংসতা, নির্বিচারে গণহত্যা, নারীর সম্ভ্রমহানি, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, ঘরবাড়ি ছেড়ে স্বজন হারিয়ে কোটি মানুষের দেশত্যাগ, শরণার্থী শিবিরে আশ্রয়। দেখতে পাই, বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের উজ্জ্বলতম অর্জন-পর্ব 'মুক্তিযুদ্ধ'। রণাঙ্গন থেকে রণাঙ্গনে অস্ত্র হাতে যুদ্ধরত ছাত্র, যুবা, কৃষক, শ্রমিক, মাঝিমাল্লা, সেনা, পুলিশ, ইপিআর, আনসারসহ নানা পেশার মানুষকে। সাহসে, অঙ্গীকারে, বীরত্বে, আত্মদানে, জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য বানিয়ে সম্মুখসমরে শত্রুহননে মত্ত হওয়ার এমন দিন বাঙালির ইতিহাসে আর কখনোই আসেনি। এটা অনস্বীকার্য যে বাঙালি জাতির ধারাবাহিক স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার সম্মিলিত ফসল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। এ যুদ্ধ ছিল বাঙালির জাতিসত্তা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও আত্মানুসন্ধানের লড়াই। বাঙালির অহংকার, গৌরব আর আত্মপরিচয় তুলে ধরার ভিত্তি বলা যায় মুক্তিযুদ্ধ। শিশুঘাতী, নারীঘাতী, বর্বরতম প্রতিরোধে এমন সম্মিলিত সংগ্রামের ইতিহাস, নিজের বুকের রক্তে এমন করে আগে কখনো লেখেনি জাতি বাঙালি।

৫০ বছর আগে আরো দেখতে পাই, অহিংস গণ-অসহযোগ আন্দোলন থেকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ; সংসদীয় গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে স্বাধীনতার রক্ত পতাকাত্তোলন। বিশ শতকের বিশ্ব রাজনীতিতে এমন ঘটনা অকল্পনীয় এবং অভাবনীয় যেমন, তেমনই অভূতপূর্বও। এই অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। মুক্তিযুদ্ধের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে দেখা গেছে, বাঙালির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ভ্রাতৃত্ববোধের এবং সহমর্মী, সহকর্মী, সমব্যথী, সমচেতনার, সদাজাগ্রত থাকার সময়কাল। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির ইতিহাসের শুধু অসাধারণ ঘটনাই নয়, স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসের অসাধারণ ঘটনা। এই যুদ্ধে বাঙালি জনগণের অংশগ্রহণ ছিল ব্যাপক। সাধারণ বাঙালি সশস্ত্রভাবে পাকিস্তানি হানাদার ও দখলদার বাহিনীকে প্রতিরোধে মত্ত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালি জনগণের যুদ্ধ তথা জনযুদ্ধ।

স্বল্পসংখ্যক বিশ্বাসঘাতক ছাড়া সে সময়ের সাড়ে সাত কোটি বাঙালিই ছিল মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতার পক্ষে। সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্য ইপিআর, পুলিশ, আনসার বাহিনীর বিদ্রোহী সদস্য থেকে শুরু করে লাখ লাখ ছাত্র-তরুণ-যুবক-নারী-কৃষক ও সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী, চিকিৎসক, নার্স, প্রকৌশলী, সরকারি চাকরিজীবী, কলকারখানার শ্রমিক, ঘাটের মাঝি, মাঠের কৃষকসহ নাম না-জানা বাঙালি সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। দেশের অভ্যন্তরে দখলদার হানাদার বাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে অনেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় ছিলেন। অনেকে ধরা পড়েন, তাঁরা আর ফিরে আসেননি। জল্লাদরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। অনেকের লাশ পাওয়া যায়নি। গণকবর আর বধ্যভূমিতে আকীর্ণ বাংলাদেশ।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ছিল পাকিস্তান। সব যুদ্ধেরই পক্ষ ও প্রতিপক্ষ থাকে। এক পক্ষ অন্য পক্ষের বিরোধিতা করাটাই স্বাভাবিক। আর এই বিরোধিতা যে কেবল ভূমিতে, আকাশে, জলপথে মারণাস্ত্র নিয়ে লড়াই, তা-ই শুধু নয়। বিরোধিতার চূড়ান্ত পরিণামে যে সংঘর্ষ তাতে যেমন সামরিক কৌশল ব্যবহার করা হয়, একই সঙ্গে রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং যোগাযোগীয় কৌশলও ব্যবহৃত হয়। পুরাকাল থেকেই যোগাযোগ তথা গণমাধ্যম তাই যুদ্ধের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। অনস্বীকার্য যে মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রজন্মের চূড়ান্ত ঘটনা। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী এবং তাদের এ দেশীয় দোসর আলবদর, আলশামস, রাজাকার ও দালালরা পরাজিত হয়। হানাদাররা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যুদ্ধ ও সংবাদমাধ্যমের সম্পর্ক সব সময়ই সাংঘর্ষিক। যেকোনো যুদ্ধে, প্রাচীন হোক অথবা বর্তমানকালের হোক, যোগাযোগমাধ্যম ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে স্বার্থ ভিন্নতার বিষয়টি বড়ো বাস্তবতা। সংবাদমাধ্যমের মূল কাজ সত্য প্রকাশ করা। ঘটনার অনুপুঙ্খ তথ্য পাঠযোগ্যভাবে সংবাদ ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেয়। যুদ্ধে প্রধানত দুটি পক্ষ থাকে। সংবাদমাধ্যমের আদর্শিক অঙ্গীকারের জন্য দুটি পক্ষ সম্পর্কে, যুদ্ধযুদ্ধ ঘটনার দৈনন্দিন ফলাফল সম্পর্কে জনসাধারণকে যতদূর সম্ভব পর্যাপ্ত তথ্য দেওয়ার দায়িত্ব সংবাদমাধ্যমের পেশাগত দায়বদ্ধতার অংশ। এমনকি জাতিগত, রাষ্ট্রগত কিংবা রাজনৈতিক ভাবাদর্শগত কারণে যে পক্ষকে একটি সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠান সমর্থন করে, সে ক্ষেত্রেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য; কিন্তু যুদ্ধকালে এ ব্যাপারটি ঘটে না। বরং সংবাদমাধ্যম হয়ে ওঠে সাবেক

যুদ্ধভূমি। শুধু তা-ই নয়, কৌশলগত প্রয়োজনেই যুদ্ধমান সামরিক বাহিনী কিংবা সরকার সংবাদমাধ্যমকে সব তথ্য দেয় না। তথ্য সংগ্রহ এবং প্রেরণে বাধা দেয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও ঘটনাস্থল থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে সাংবাদিকদের টেলিগ্রাফের মাধ্যমে সংবাদ অফিসে পৌঁছাতে হতো। অবশ্য এ সময়কালে কেবল সংযোগ আরো বিস্তৃত হয়েছে। যুদ্ধ 'কাভার' করার ক্ষেত্রে 'রিয়েল টাইম লাইভ রিপোর্টিং' বলতে যা বোঝায়, তার শুরু কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বেতারের মাধ্যমে। আর টেলিভিশনের মাধ্যমে বিশ্ব তথা যুক্তরাষ্ট্র বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছে ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়। এভাবেই যুদ্ধে বাস্তবতা, দৃশ্য-শব্দ, মৃত্যু, ধ্বংস, আহাজারি মানুষের বসার ঘরে ঢুকে পড়ে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের খণ্ড খণ্ড চিত্র এবং বিদেশি টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের কল্যাণে বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে।

পূর্ব বাংলায় ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকাল পর্যন্ত এ দেশে মোট তেইশটি (২৩) দৈনিক পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। ছিল বেতার এবং পরবর্তীকালে টেলিভিশনও। পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনের প্রায় চব্বিশ (২৪) বছর, অল্প কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে সংবাদমাধ্যম বাঙালির মুক্তিসংগ্রামকে সফল পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল; কিন্তু পঁচিশে মার্চ হানাদার বাহিনীর 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর আওতায় গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ শুরুর পর এসব পত্রিকা সম্পূর্ণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। কয়েকটি পত্রিকা অফিস জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। শুধু সংবাদপত্রই নয়, বেতার-টিভিসহ পুরো যোগাযোগব্যবস্থারই নিয়ন্ত্রণ নেয় দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী। দেশের বাস্তব অবস্থা দেশি-বিদেশি জনগণ যাতে জানতে না পারে, সে জন্য সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠ রোধ করেছিল। আরোপিত হয়েছিল সেন্সরশিপ। তাদের নৃশংস তৎপরতাকে ধামাচাপা দিতে যতই কলাকৌশলের আশ্রয় নিক না কেন, তাতে কামিয়াব হয়নি। দেশে যে মুক্তিযুদ্ধ চলছে, বাঙালি যে স্বাধীনতার জন্য লড়ছে, সেসব প্রকাশের নিষেধাজ্ঞা ছিল শক্তাশক্তি। মুক্তিযোদ্ধাদের দুষ্কৃতকারী, ভারতের চর, ইসলামের শত্রু, পাকিস্তানের দুশমন অভিধা দেওয়া হতো সংবাদপত্রসহ গণমাধ্যমে। দখলদার পাকিস্তানিরা সারা দেশে গণহত্যা চালিয়ে বাঙালি নিধনে মত্ত থাকলেও সেসব খবরাখবর তাদের নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র, বেতার-টিভিতে প্রচারিত হতো না। অবরুদ্ধ দেশে বাঙালি এসব খবরাখবর মোটেই বিশ্বাস করেনি। বরং স্বাধীনতাকামী বাঙালিই বাঙালির কাছে খবর

পৌঁছে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম, বিশেষ করে বেতার এ সময় হয়ে ওঠে মুক্তিকামী বাঙালির তথ্য চাহিদা পূরণের নির্ভরযোগ্য উপায়। ভারতসহ বিদেশি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরাখবরও বেতার থেকে উদ্ধৃত করা হতো। সেসব সংবাদপত্র এ দেশে না এলেও বিদেশি বেতারের কল্যাণে তা জানা হয়ে যেত। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম রণাঙ্গন তখন হয়ে উঠেছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। পঁচিশে মার্চ গণহত্যা শুরুর পরদিনই ২৬ মার্চ স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারের পর সারা দেশের মানুষ জনযুদ্ধে নেমেছিল। সে সময় সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে পারেনি বেশ কিছুকাল। যুদ্ধকালে দেশের মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা সে সময় পালন করেছিল ঐতিহাসিক দায়িত্ব। এসব মাধ্যমে কর্মরত শব্দসৈনিকরা মুক্তিকামী বাঙালির স্বাধীনতাবোধ এবং চেতনাকে সংহত ও শাণিত করে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও দেশকে হানাদারমুক্ত করার সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছিল। দখলদার বাহিনীর প্রপাগান্ডা ও মিথ্যাচার প্রচারযন্ত্রের বিপরীতে স্বাধীন বাংলা বেতার, আকাশবাণী, বিবিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

মুক্তাঞ্চল থেকে বাংলাদেশ সরকার ছাড়াও আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, সিপিবি সাপ্তাহিক মুখপত্র বের করত নিয়মিত। বাংলার বাণীও সে সময় প্রকাশ হতে থাকে। কলকাতায় বাংলা-ইংরেজি পত্রিকাতেও মুক্তিযুদ্ধের খবরাখবর থাকত। সেসব পত্রপত্রিকা যাতে দেশের ভেতরে না আসতে পারে, সে জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল দলখদার হানাদার বাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে ১ মার্চ ১৯৭১ ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা ১১০ নম্বর সামরিক বিধি জারি করে। উল্লেখ করার বিষয় এখানে যে এসব বিধিনিষেধ, কালাকানুন–সবই এক পর্যায়ে এসে এ দেশের সাংবাদিকরা ভঙ্গ করেছেন। এর আগে ১৯৫৮ সালের সামরিক অধ্যাদেশে সংবাদপত্রের ওপর প্রি-সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়েছিল। পূর্ব বাংলার সাংবাদিকরা এসব আইনের বিরুদ্ধে নানা সময়ে প্রতিবাদীও হয়েছিলেন। পূর্ব বাংলার সাংবাদিকতার ইতিহাস, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস। জাতীয় চেতনাকে শাণিত করার এই অস্ত্রটিকে দখলে আনার জন্য পাকিস্তানি জান্তা শাসকদের চেষ্টার অবধি ছিল না।

সংবাদপত্র শুধু মানুষকে তথ্য দেয় না, জনগণকে শিক্ষিত করে, জনচৈতন্য এবং জনমতকে প্রভাবিত করে। এ কারণেই পূর্ববঙ্গে স্বাধীন সংবাদপত্র যাতে বিকশিত না হয়, সে জন্য সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করতে চেয়েছে পাকিস্তানি

সামরিক শাসকগোষ্ঠী শুরু থেকেই। পাকিস্তানি উপনিবেশ আমলে ২৪ বছরে এ দেশে সাংবাদিকতা বিকাশের স্পষ্ট বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের কাল পর্যন্ত প্রথম পর্ব। সামরিক শাসনের কাল ১৯৫৮ থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দ্বিতীয় পর্ব এবং ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত তৃতীয় পর্ব। প্রতিটি পর্বেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং দেশের স্বাধিকারের জন্য সাংবাদিকদের সাহসী ভূমিকার ইতিহাস যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে পাকিস্তানি শাসকদের সঙ্গে আপস ও আঁতাতের কলঙ্ক। পূর্ব বাংলা গণ-আন্দোলনের প্রচণ্ড বিস্ফোরণোন্মুখ পরিবেশ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সংগ্রাম প্রতিবার নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে। জনমত সৃষ্টি, জনমতের বিশ্বস্ত বাহন হিসেবে সংবাদপত্রকে জনতার সামনে উপস্থাপিত করার কাজে সাংবাদিকরা কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। তাই পর্যালোচনায় দেখা যায়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ সাংবাদিকরা বারবার কারাবরণ করেছেন ও স্বৈরাচারী শাসকদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। পূর্ববঙ্গে সংবাদপত্রশিল্পের বিকাশের পেছনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাব প্রত্যক্ষ ছিল। তবে দু-একটি পত্রিকা সামরিক সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থের মুখপত্র হিসেবে কাজ করেছে। বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা ঘোষণার পর তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের অনুসারী ছিল না ইত্তেফাক ছাড়া প্রধান ধারার অন্য কোনো পত্রিকা। তবে সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে সব পত্রিকা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক কর্মসূচিকে বিপুল সমর্থন জুগিয়ে গেছে। শেখ মুজিবের স্বদেশ ও তাঁর মানুষের মুক্তির সংগ্রামের সমান্তরালে এগিয়েছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার আন্দোলন। আমাদের বাঁচার দাবি ছয় দফা কর্মসূচি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে, সত্তরের নির্বাচনে মুজিবের দলকে নিরঙ্কুশ বিজয় এনে দেওয়ার ক্ষেত্রে–সর্বোপরি তাঁকে এ দেশের মুক্তিকামী জনগণের নামে অবিসংবাদিত জননেতা হিসেবে গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সংবাদপত্র অমূল্য ও নিঃস্বার্থ ভূমিকা পালন করেছে। দেখা গেছে যে পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে যখনই গণ-আন্দোলন তীব্র রূপ নিয়েছে, সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা তাঁদের ওপর আরোপিত সব নিয়ন্ত্রণ, হুমকি, জেলের ভয় অতিক্রম করে ছাত্র, জনতা এবং রাজনীতিবিদদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

এটা স্বীকার করতেই হবে যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক-মুহূর্ত পর্যন্ত এ দেশে সাহসী সাংবাদিকতার যে সংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল, সাংবাদিকরা সংগ্রামী যে ঐতিহ্য নির্মাণ করেছিলেন, পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর প্রথম আঘাতেই

তা ভেঙে যায়। হানাদারদের লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে ছিল সংবাদপত্র অফিস এবং সংশ্লিষ্ট সংবাদকর্মী ও সাংবাদিক। হানাদারদের গোলার আঘাতে একের পর এক আক্রান্ত হয় স্বাধীনতার সপক্ষের পত্রিকা অফিস ও কর্মরত সাংবাদিকরা।

২৫ মার্চ রাতেই কামানের গোলায় ধ্বংস করা হয় দ্য পিপল ও গণবাংলা পত্রিকার অফিস। গোলার আঘাতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন দ্য পিপল অফিসে কর্মরত ছয়জন সাংবাদিক। ২৬ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকের অফিসটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ২৮ মার্চ দৈনিক সংবাদের অফিস পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অফিসে কর্মরত সাংবাদিক শহিদ সাবের অগ্নিদগ্ধ হয়ে মর্মান্তিকভাবে মারা যান। ২৬ মার্চ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে শুরু হয় সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস–২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। সংবাদপত্র ছিল সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে সেই যাত্রা খুবই করুণ, মর্মান্তিক।

এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়ে আসছে যে যেকোনো যুদ্ধে প্রথম মৃত্যু ঘটে সত্যের। সংবাদপত্র অফিসে আক্রমণ এবং সাংবাদিকদের হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাসের পরবর্তী ৯ মাসের জন্য সংবাদপত্র অফিস 'সত্যের কসাইখানা' হওয়ার পথ খুলে দেয়।

লেখক : একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

কসাই টিক্কা খান বিশ্ববিদ্যালয় চ্যান্সেলর!

অজয় দাশগুপ্ত

বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ গণহত্যা, ধর্ষণ ও লুটপাটের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রধান দায়িত্ব যার ওপর অর্পিত হয়েছিল, বেলুচিস্তানের কসাই নামে পরিচিত সেই নিষ্ঠুর ঘাতক টিক্কা খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বা আচার্য ছিলেন! ভূমিকম্পের যেমন এপিসেন্টার থাকে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী ঢাকায় যে জেনোসাইড শুরু করেছিল, তারও এপিসেন্টার ছিল এবং সেটা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ট্যাংক, সাঁজোয়া গাড়ি, মেশিনগান, মর্টার ও রাইফেল সজ্জিত হিংস্র বাহিনীর প্রধান তিনটি টার্গেট ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্প এবং পিলখানার সীমান্তরক্ষী বাহিনী ইপিআর সদর দফতর।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত আকস্মিক ছিল না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ১৯৫২ সালে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘৃণ্য পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে দিয়েছিল। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির পর এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরাই ছিল আইয়ুব খানের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনের সামনের সারিতে। আওয়ামী লীগের পূর্ব পাকিস্তান কমিটির সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্বায়ত্তশাসনের ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি প্রদান করেন এবং জনগণ বিপুলভাবে এ কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানাতে থাকে। আইয়ুব খান কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করে এ আন্দোলন দমনের অপচেষ্টা চালান। তাঁর লক্ষ্য ছিল শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসি প্রদান; কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ বা ডাকসুর নেতৃত্বে যে ঐতিহাসিক ১১ দফা আন্দোলন গড়ে ওঠে তার কারণে এ চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। শেখ মুজিবুর রহমান নিঃশর্তে মুক্তিলাভ করেন এবং জনগণ তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' হিসেবে বরণ করে নেয়।

১৯৭১ সালের ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদ অধিবেশন (৩ মার্চ ঢাকায় নির্ধারিত) স্থগিত করায় বাংলাদেশের জনগণ বুঝে যায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন

আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না পাকিস্তানের সামরিক জান্তা। 'জয় বাংলা, বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো; তোমার-আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা'—এসব স্লোগান দিয়ে জনগণ রাজপথে নেমে আসে। ১ মার্চ সন্ধ্যায় ইকবাল হলের নাম পরিবর্তিত হয় নতুন নাম শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ হলের নাম দেওয়া হয় সূর্য সেন হল। স্বাধীনতার আন্দোলন যখন সশস্ত্র পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে তাঁরাই যে হবেন নায়ক!

২ মার্চ বটতলায় বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ২৫ মার্চের পর রাগে-ক্ষোভে সেই বটগাছটি সমূহে উৎপাটন করে অজানা স্থানে ফেলে দেয়। এখন যে বটগাছটি আমরা দেখি মহিরুহ রূপে, সেটির চারা ১৯৭২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি রোপণ করেছিলেন মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি। তিনি মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। ঐতিহাসিক বটতলায় নতুন একটি চারা রোপণের বিরল সম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল। এ বটগাছটি বেড়ে উঠছে স্বাধীনতার সমান বয়সি হিসেবে।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সে সময়ের রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ময়মনসিংহের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অপরাধ' যে অনেক। এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ছাত্র-জনতাকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শুরু হয়ে যায় সামরিক প্রশিক্ষণ, পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীকে মোকাবিলার জন্য সামরিক প্রস্তুতি। ছাত্রীরাও এতে অংশ নিতে শুরু করে। কয়েক দিনের মধ্যে গোটা বাংলাদেশে এ ধরনের সমর-প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। ২৫ মার্চের পর এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী এবং তাদের এ দেশীয় দোসররা টর্চার ক্যাম্পে পরিণত করেছিল। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই ছিল হানাদারদের ভয়ংকর নিষ্ঠুরতার চিত্র।

২৫ মার্চ অপারেশন সার্চলাইট বাস্তবায়ন শুরু হয়। হানাদাররা গ্রহণ করে পোড়ামাটির নীতি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধের ডাক দেন। তাঁকে গ্রেফতার করে শত্রুরাষ্ট্র পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র স্থানে চলে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড। এর মধ্যেই বিশেষভাবে টার্গেট করা হয় জগন্নাথ হলের সাবেক প্রভোস্ট বিশ্বখ্যাত দার্শনিক ড. জিসি দেব, ওই সময়ের প্রভোস্ট ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা এবং মধুর ক্যান্টিনের মালিক মধুসূদন দে'কে। সবার প্রিয় মধুদা তাঁর ক্যান্টিনে শুধু চা-শিঙাড়া বিক্রি করতেন। ছাত্ররা তাঁর ক্যান্টিনে বসে বাংলাদেশ গঠনের পরিকল্পনা করত,

সমাবেশ করত এতে তিনি বাধা দিতেন না। গোয়েন্দারা তাদের সহযোগী হতে তাঁকে ভয়ভীতি ও প্রলোভন দেখায়; কিন্তু তিনি তাতে সায় দেন না। এ কারণে পরিবারের সদস্যসহ তাঁকে নিষ্ঠুরভবে হত্যা করা হয় ২৬ মার্চ সকালে। জগন্নাথ হলের গণকবরে আরো অনেকের সঙ্গে তিনি সমাহিত হয়েছেন।

পাকিস্তানের হানাদারদের ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের ওপর রোষ তো হবেই। টিক্কা খানকে 'পূর্ব পাকিস্তানের' গভর্নর ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ। তাঁকে অনেক আগে থেকেই অভিহিত করা হতো বেলুচিস্তানের কসাই হিসেবে। সেখানের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমনের জন্য এই নরপিশাচ ভয়ংকর সব কৌশল অনুসরণ করেছিলেন; কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ৮ মার্চ তাঁকে গভর্নর হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করাতে অস্বীকৃতি জানান। পরে তিনি শপথ নেন ৯ এপ্রিল, ২৫ মার্চ বাংলাদেশকে বধ্যভূমিতে পরিণত করার জন্য নিষ্ঠুর অভিযান শুরুর দুই সপ্তাহ পর।

গভর্নর হিসেবে টিক্কা খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর পদে অধিষ্ঠিত হন। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ধূলিকণা ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের রক্তে রঞ্জিত, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এ অপরাধের প্রধান হোতা! ১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সনদ প্রদান করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা কার্জন হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রবল বিক্ষোভ আয়োজন করে ভুণ্ডুল করে দেয়। কারণ তিনি বাঙালির স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছেন। ছাত্র-শিক্ষকদের অকল্যাণের জন্য কাজ করছেন। তিনি ধিকৃত একজন ব্যক্তি। টিক্কা খান গণহত্যাকারী, তিনি সমাবর্তনের পথে যাননি। মুক্তিযোদ্ধারা তখন ছিলেন ইয়াহিয়া-টিক্কা খানের ঘাতক বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সর্বত্র সক্রিয়। হানাদার বাহিনীর দুর্গ ঢাকাতেও তৎপর ছিলেন তাঁরা। টিক্কা খান এবং তাঁর বর্বর বাহিনীর বেসামাল অবস্থা; কিন্তু তাঁদের অপরাধকর্ম চলছিলই। ১৯৭১ সালের ১ সেপ্টেম্বর চ্যান্সেলরের ক্ষমতা প্রয়োগ করে তিনি বাংলা বিভাগের জনপ্রিয় শিক্ষক মোহাম্মদ মুনিরুজ্জামানকে চাকরিচ্যুত করেন এবং ছয় মাসের জন্য কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন [এ নির্দেশের কপি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদর্শন করা হচ্ছে]। অধ্যাপক মুনির চৌধুরী, জ্ঞানতাপস হিসেবে পরিচিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আবদুর রাজ্জাক, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরীসহ আরো অনেক শিক্ষক, যাঁরা স্বাধীনতার পথে বাঙালিকে জাগিয়ে তোলায় অবদান রেখেছিলেন তাঁরা টিক্কা খানের রোষে পড়েন। তিনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যা

অভিযানের একনিষ্ঠ সমর্থক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ করেন। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুষ্কৃতকারীদের উচ্ছেদ করা হয়েছে'—হানাদারদের দোসর এই উপাচার্য সেটা বলতেন গর্বের সঙ্গে। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে অনন্য অবদান রাখা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কলঙ্কিত করার জন্য একের পর এক অন্যায় পদক্ষেপ নিতে থাকেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর প্ররোচনায় এই উপাচার্য নামের কলঙ্ক সৈয়দ সাজ্জাজ হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠকে কুখ্যাত রাজাকার বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে দেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যা-ধর্ষণের সহযোগী গোলাম আযম-মতিউর রহমান নিজামীর নেতৃত্বাধীন জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘকে পৃষ্ঠপোষকতা দেন কুখ্যাত আলবদর বাহিনী গড়ে তুলতে। এই আলবদররাই ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষক মুনির চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, সন্তোষ ভট্টাচার্য, রাশেদুল হাসানসহ স্বাধীনতাসংগ্রামে প্রেরণাদাতা বিপুলসংখ্যক বুদ্ধিজীবীকে হত্যার জন্য সরাসরি দায়ী।

চ্যান্সেলর টিক্কা খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নিষ্ঠুর অপরাধের সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন হাসান জামান, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, মোহর আলী, এ কে এম আবদুর রহমান, আবদুল বারীসহ কয়েকজন শিক্ষক নামধারী ব্যক্তিকে। তাঁদের অপরাধের ক্ষমা নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শতবর্ষ পালন করছে ২০২১ সালে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীর বছরেই পরিচালিত হয়েছিল নারকীয় গণহত্যা। এর প্রধান হোতা ছিলেন এমন এক ব্যক্তি, যাঁকে 'চ্যান্সেলরের মর্যাদা' প্রদান করা হয়েছিল। এ যে কী অপমান ও লজ্জার! চ্যান্সেলর হিসেবে নরঘাতক টিক্কা খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কী কী অপরাধমূলক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং দুষ্কর্মে যাঁদের সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন সেসব দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার সময় এখনো ফুরিয়ে যায়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে গবেষণার ব্যবস্থা করবে এবং তা দেশবাসী শুধু নয়, বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থাপন করবে, এটাই প্রত্যাশা থাকবে।

লেখক : বীর মুক্তিযোদ্ধা ও একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক

করোনার সঙ্গে ডেঙ্গু

অধ্যাপক ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ

করোনা মহামারির মধ্যে নতুন করে শুরু হয়েছে ডেঙ্গুর তাণ্ডব। সারা পৃথিবীসহ বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রা করোনার তাণ্ডবে বিপর্যস্ত-বিধ্বস্ত, পার করছে ক্রান্তিকাল। প্রাণঘাতী এই ভাইরাসের আঘাতে আমাদের দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি, বিশেষ করে চিকিৎসাক্ষেত্র অনেকটাই হুমকির মুখে। কোনো হাসপাতালে শয্যা, ওয়ার্ড, আইসিইউ, এইচডিইউ খালি নেই। রোগীদের অক্সিজেন, ভেন্টিলেশনের সংকট কাটিয়ে ওঠা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। কর্মরত ডাক্তার, নার্স, আয়া, ওয়ার্ডবয় এবং অন্য স্বাস্থ্যকর্মীরা ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত, আতঙ্কগ্রস্ত। চলমান করোনা দুর্যোগের মধ্যে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় জনমনে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আরো বেড়ে গেছে। এপ্রিল-মে থেকে শুরু করে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর পর্যন্ত ডেঙ্গুর সময়। এটা প্রতিবছর হয়েই থাকে, ২০১৯ সালের অভিজ্ঞতাও আমাদের আছে; কিন্তু এ বছর হঠাৎ করে করোনার তাণ্ডবের পাশাপাশি ডেঙ্গুর হানা পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে। অন্যান্য জেলায় ডেঙ্গু কিছুটা নিয়ন্ত্রিত থাকলেও রাজধানীতে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার প্রতিদিন বেড়েই চলছে। করোনার তাণ্ডবে ডেঙ্গুর হানায় রাজধানীবাসী নাকাল।

ডেঙ্গু হলে জ্বর তীব্র মাত্রার হয়–১০৩ থেকে ১০৫ ডিগ্রি পর্যন্ত হতে পারে। মাথা ব্যথা ও চোখের পেছনে ব্যথা এবং গায়ে, কোমর, শরীর ও গিরায় গিরায় প্রচণ্ড ব্যথা হয়। এটাকে 'ব্রেক বোন ফিবার' বা 'হাড়ভাঙা' জ্বর বলে। জ্বরের চার-পাঁচ দিন পর সারা শরীরে লাল এলার্জির বা ঘামাচির মতো র‍্যাশ উঠতে পারে। প্লাটিলেট কমে নাক, মুখ, দাঁতের মাড়ি থেকে রক্তক্ষরণ, রক্তবমি ও কালো পায়খানা হতে পারে। রক্তক্ষরণ হলে তাকে বলে 'ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিবার'। রক্তনালির ভেতর থেকে রক্তরস বেরিয়ে পেটে, বুকে পানি জমতে পারে। কোনো কোনো রোগীর 'ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোম' হতে পারে, যেটি মৃত্যুর কারণ হয়। চার-পাঁচ দিন পর পর জ্বর কমে যায়, এ সময়েই এই জটিলতাগুলো দেখা দেয়, একে বলে 'ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড'।

করোনায়ও জ্বর হয়, তবে এতটা তীব্র মাত্রার নয়। কোভিড বারবার তার চরিত্র বদলাচ্ছে। বর্তমানে যে ধরনটি ছড়িয়ে পড়ছে তাতে জ্বর তীব্র মাত্রার নয়, আবার দীর্ঘস্থায়ীও নয়। দুই-তিন দিনের মাথায় জ্বর সেরে যায়। আবার কোনো জ্বর বা উপসর্গ ছাড়াও অনেক আক্রান্ত রোগী দেখা যায়। অন্য লক্ষণগুলো হলো মাথা ব্যথা, শরীর ব্যথা, ক্লান্তি, অবসাদ, গলা ব্যথা, সর্দি, কাশি। এর সাথে অরুচি ও নাকে ঘ্রাণ বা গন্ধ না পাওয়া কোভিডের একটি বড়ো লক্ষণ, তবে সবার তা না-ও হতে পারে। কারো কারো পেটে ব্যথা, ডায়রিয়াও হতে পারে। কোভিডেরও জটিলতা শুরু হয় জ্বর কমে যাওয়ার পর, কারো পাঁচ-সাত দিন পর। ফুসফুসের সংক্রমণের হার সামান্য থেকে অনেক ভয়াবহ হতে পারে। ফলে কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা এবং রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যেতে পারে। এই সময়ে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে অক্সিজেন দিতে হয়। প্রয়োজনে আইসিইউ বা এইচডিইউতে স্থানান্তর করতে হয়, তা না হলে রোগী মারাও যেতে পারে।

ডেঙ্গু ও কোভিড-১৯ দুটিই ভাইরাসজনিত রোগ হলেও দুটির মধ্যে কিছু পার্থক্যও আছে। দুটিতেই জ্বর প্রথম ও প্রধান উপসর্গ। ডেঙ্গুতে জ্বরের মাত্রা তীব্র হতে পারে–১০৩ থেকে ১০৫ ডিগ্রি পর্যন্ত, আর করোনায় জ্বর এতটা তীব্র হয় না। ডেঙ্গুতে শরীরের যেকোনো অংশে ব্যথা প্রচণ্ড হতে পারে, তবে করোনায় ব্যথা হলেও অতটা প্রচণ্ড আকার ধারণ করে না। ডেঙ্গুতে জ্বরের চার-পাঁচ দিনের মাথায় শরীরে র‍্যাশ হতে পারে, এমনকি রক্তের প্লাটিলেট কমে গিয়ে শরীরের যেকোনো অংশ থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে।

করোনায় শরীরে র‍্যাশ হয় না, এমনকি প্লাটিলেট কমে গিয়ে রক্তক্ষরণের ঝুঁকিও তেমন নেই। ডেঙ্গুতে রক্তনালির ভেতর থেকে রক্তরস বেরিয়ে এসে পেটে-বুকে পানি জমতে পারে। এই জটিলতা করোনায় হয় না। করোনায় সবচেয়ে আক্রান্ত করে ফুসফুস। ফলে শ্বাসকষ্ট, কাশি, বুকে ব্যথা এবং শরীরের অক্সিজেন কমে যেতে পারে। এ ছাড়া করোনায় শরীরের যেকোনো অংশ আক্রান্ত হতে পারে; যেমন–লিভার, কিডনি, হার্ট, ব্রেন, এমনকি রক্ত জমাট বাঁধতে পারে। এ ধরনের জটিলতা ডেঙ্গুতে খুব কমসংখ্যক রোগীর হতে পারে। তাকে বলে 'এক্সপান্ডেড ডেঙ্গু সিনড্রোম'।

যেহেতু এখন দুটি রোগের ব্যাপক সংক্রমণজনিত ক্রান্তিকাল চলছে, আবার একই রোগী কোভিড এবং ডেঙ্গুতেও আক্রান্ত হতে পারে। তাই জ্বর হলে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই। পরিবারে ছোটো-বড়ো যে কারো জ্বর

হলে সতর্ক হতে হবে। ডেঙ্গুতে জ্বরের জটিলতা শিশুদের বেশি হয়, এমনকি মৃত্যুহারও শিশুদের বেশি। আবার কোভিডে বয়স্ক, যাদের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, কিডনি রোগ ইত্যাদি আছে তাদের সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি। অন্তঃসত্ত্বা নারীদের জন্য দুটি রোগই ঝুঁকিপূর্ণ। দুটি সংক্রমণই আক্রান্ত রোগীর কাছ থেকে অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে পড়তে পারে, একটা মশার কামড়ের মাধ্যমে, অন্যটা ছোঁয়াছুঁয়ি এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে। তাই জ্বর এবং অন্যান্য উপসর্গ হলে নিজেকে পরিবারের অন্য সদস্যদের থেকে আলাদা করে নেবেন। আলো-বাতাসপূর্ণ একটি আলাদা কক্ষে বিশ্রাম নিন। প্রচুর পানি, তরল ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করুন। যত দ্রুত সম্ভব টেলিফোনে, অনলাইনে বা হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ডেঙ্গু নির্ণয়ের জন্য এনএসওয়ান অ্যান্টিজেন আর কোভিড নির্ণয়ের জন্য আরটিপিসিআর বা র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করে ফেলুন। এ ছাড়া রক্তের কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট দুই ক্ষেত্রেই দরকার হবে। পরে দুটি রোগের জন্য আলাদা কিছু পরীক্ষা করার প্রয়োজন হতে পারে।

ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া নিজে নিজে এর-ওর কথায় বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ওষুধ খাবেন না। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। কারণ রোগ শনাক্ত না করে ওষুধ খাওয়া বিপজ্জনক। ডেঙ্গুতে জ্বর বা ব্যথায় প্যারাসিটামলের বাইরে অন্য কোনো ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়া যাবে না। তাতে রক্তক্ষরণের ঝুঁকি বাড়তে পারে। এমনকি ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া উচিত হবে না। পাশাপাশি পানি ও শরবত–এগুলো বেশি বেশি খেতে হবে। মৃদু কোভিডের ক্ষেত্রেও তেমন কোনো ওষুধ লাগে না। এ রোগেরও কোনো সুনির্দিষ্ট ওষুধ নেই, লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা দিতে হয়। তাই আলসেমি না করে রোগাক্রান্ত হওয়ার পরপরই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। নিজেদের ইচ্ছামতো ওষুধ খাওয়া যাবে না। অক্সিজেনের মাত্রা ৯২/৯৩-এ নেমে এলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে।

করোনা ও ডেঙ্গু দুটিই ভাইরাসজনিত। একই ব্যক্তির ডেঙ্গু ও কোভিড একসঙ্গেও হতে পারে এবং ঝুঁকিটা হয় সবচেয়ে বেশি। তাই জ্বর, সর্দি-কাশি ও গলা ব্যথা হলে ডেঙ্গু এবং করোনা–দুটিরই পরীক্ষা করাতে হবে। ওষুধ-পরীক্ষা–সব কিছুই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নিতে হবে। অবহেলা করা যাবে না। দুটি রোগের চিকিৎসা একসঙ্গেই চলতে পারে। তবে বেশি সতর্কতা

দরকার হয়। কারণ কোভিডে রক্ত জমাট না বাঁধার জন্য রক্ত তরলীকরণের ওষুধ দেওয়া হয়, ওদিকে ডেঙ্গুতে রক্তক্ষরণ একটি বড়ো সমস্যা। এসব চিকিৎসা অবশ্যই হাসপাতালে ভর্তি হয়ে নিতে হবে।

ডেঙ্গু ও কোভিড দুটিই প্রতিরোধযোগ্য। বর্তমান সময়ে এ ধরনের রোগীর আক্রান্ত হওয়ার হার ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে, হাসপাতালগুলো পরিপূর্ণ, তখন সবাইকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ডেঙ্গু প্রতিরোধ করা যায় এডিস মশা নির্মূলের মাধ্যমে। জমে থাকা পরিষ্কার পানিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। আর এই ডিম থেকে লার্ভা এবং পরে ডেঙ্গুবাহিত এডিস মশার বংশবিস্তার হয়। এ ছাড়া বৃষ্টির জমা পানিতে মশা ডিম পারে এবং তা থেকে লার্ভা হয়ে এডিস মশা হয়। এভাবেই ডেঙ্গু মশা বেড়ে যাচ্ছে। এগুলো আবার বাসাবাড়িতে ঢুকছে। কারণ এই মশা বাসাবাড়িতে থাকতে পছন্দ করে। এ জন্য কেউ কেউ এ মশাকে 'গৃহপালিত' এমনকি 'ভদ্র মশা'ও বলে। নিজের বাসাবাড়ি, আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। টবের নিচে, বারান্দায়, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের নিচে, বাথরুমে, ফুলের টবে, বালতিতে, চৌবাচ্চায় এবং ঘরের আনাচকানাচে জমা পানি থাকলে সেখানে মশা ডিম পাড়ে। তাই কোথাও যেন তিন থেকে পাঁচ দিনের বেশি জমা পানি না থাকে। ঘরের আনাচকানাচে পরিষ্কার রাখতে হবে। ফ্রিজের নিচে টবে পানি যেন না থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অনেকে ছাদবাগান করে, সেখানে পানি জমার আশঙ্কা থাকে। সেখানে সতর্কতার সঙ্গে পানি পরিষ্কার করতে হবে। নিজেকে মশার কামড় থেকে বাঁচাতে হবে। মশাগুলো দিনে কামরায়, তাই দিনেরবেলা মশারি টানিয়ে ঘুমাবেন। ফুলহাতা জামাকাপড় এবং বাচ্চাদের ফুলপ্যান্ট পরাবেন। রিপেলেন্ট ক্রিম লাগাতে পারেন। ঘরের বাইরের কাজকর্ম সিটি করপোরেশন বা প্রশাসনের দায়িত্ব। কোনো খোলা পাত্র, ডাবের খোসা, পরিত্যক্ত টায়ারে বা গ্যারেজে যেন পানি না জমে থাকে। নিয়মিত মশার ওষুধ ছিটাতে হবে এসব জায়গায়। এডিস মশার ডিম এক বছর পর্যন্ত পরিবেশে বা মাটিতে টিকে থাকতে পারে। বৃষ্টির পানির সংস্পর্শে এলেই ডিম থেকে লার্ভা এবং পরে তা পূর্ণাঙ্গ মশা তৈরি হয়। তাই পরিচ্ছন্নতা ও মশা নিধন অভিযান শুধু বর্ষায় নয়, সারা বছর ধরে চালাতে হবে। পাড়া-মহল্লার সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে–তাহলেই মশামুক্ত থাকা যাবে।

অন্যদিকে কোভিডের হাত থেকে নিরাপদে থাকতে হলে স্বাস্থ্যবিধি ভালোভাবে মানতে হবে। অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। যেকোনো সাবান দিয়ে ২০ সেকেন্ড হাত ধোয়ার চর্চা চালু রাখতে হবে। অন্যের সঙ্গে ন্যূনতম

তিন ফুট শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখবেন। জনবহুল এলাকা এড়িয়ে চলতে হবে। গণজমায়েত, জনসমাগম থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। এর পাশাপাশি অবশ্যই টিকা নিতে হবে।

কঠোর লকডাউন উঠে গেছে, তার মানে এই নয় যে অকারণে বাইরে ঘুরে বেড়োাবেন, হইচই করবেন, পার্টি করবেন। প্রয়োজন ছাড়া বাইরে এক মুহূর্তও নয়, আর সর্বদা ঘরের বাইরে গেলে মাস্ক পরতে হবে। মনে রাখতে হবে, নিজেকে সুরক্ষিত রাখা মানেই পরিবার-পরিজনকে সুরক্ষিত রাখা। ডেঙ্গু রোগের শত্রুটি দৃশ্যমান, অর্থাৎ এডিস মশা, কিন্তু করোনার শত্রু অদৃশ্য। ডেঙ্গু থেকে বাঁচতে হলে মশা নির্মূল করতে হবে এবং এডিস মশার কামড় থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে। আর করোনার সংক্রমণ থেকে বাঁচার দুটি পথ–স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং টিকা নেওয়া।

লেখক : মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও জাতীয় অধ্যাপক এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক

মানবাধিকার, বঙ্গবন্ধু এবং মানবিক মূল্যবোধ

নাছিমা বেগম, এনডিসি

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকারের মূল সুর হলো, প্রত্যেকটি মানুষের সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার জন্মগত অধিকার। মানুষ হিসেবে এই অধিকার প্রত্যেকের প্রাপ্য; যা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। মানবাধিকার শাশ্বত এবং কোনো দেশের সীমারেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ, শিশু, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী-আদিবাসী, তৃতীয় লিঙ্গ-প্রতিবন্ধী যা-ই হোন না কেন, তিনি গ্রাম বা শহর বা বিশ্বের যে প্রান্তেই বসবাস করেন না কেন, মানুষ হিসেবে সবার সমান অধিকার।

মানবাধিকার আসলে কী? এটি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি মানবাধিকার মূলত একদিকে জীবনের অধিকার, অন্যদিকে স্বাধীনভাবে কথা বলার, চলাফেরা করার; অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা-স্বাস্থ্য–সব কিছুর অধিকার। কার্যত অধিকার ও দায়িত্ব একে অন্যের পরিপূরক। অধিকার পূরণের ক্ষেত্রে অধিকার প্রদানকারীর যেমন দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি অধিকার ভোগকারীরও দায়িত্ব রয়েছে। উভয়পক্ষের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন ছাড়া অধিকার বাস্তব রূপ পায় না।

মানবাধিকার একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি অনেক ব্যক্তির সমষ্টি জনগণের জন্যও সমানভাবে কার্যকর। উদাহরণ হিসেবে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু নিজের কোনো সুবিধা আদায়ের জন্য কখনো সংগ্রাম করেননি। তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন সাধারণ জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য।

কারা সদর দপ্তর থেকে প্রকাশিত 'জাতির পিতার সমগ্র জেলজীবন–৩০৫৩ দিন' পাঠ করলে দেখা যায়, তিনি নিজের কোনো স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কখনো সংগ্রাম করেননি, সংগ্রাম করেছেন জনদাবি আদায়ের জন্য। জনস্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে ব্যক্তিগত জীবনের, বিশেষ করে যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলো তাঁকে কারাযাপন করতে হয়েছে। বাংলা ও বাঙালির অধিকার, বিশেষ করে জনদাবি আদায়ে বঙ্গবন্ধুর এই আত্মত্যাগের বিবরণ বঙ্গবন্ধু রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' এবং 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থ দুটির পরতে পরতে উল্লেখ

রয়েছে। বঙ্গবন্ধু জনদাবি আদায়ে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন এবং সফল হয়েছেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু অনশন শুরু করে যখন প্রায় মৃত্যুপথযাত্রী, তখন পাকিস্তানের শাসকরা তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল। জনদাবি ও মানবাধিকার সুরক্ষায় পাকিস্তান শাসনামলের অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদ এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার দাবিতে তাঁর সংগ্রামের ঘটনাসমূহ বঙ্গবন্ধু সুনিপুণ লেখনীর মাধ্যমে অজানাকে জানার সুযোগ রেখে গেছেন। বঙ্গবন্ধু রচিত এই গ্রন্থ দুটি বঙ্গবন্ধুর অসামান্য দেশপ্রেমের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

আমাদের প্রিয় স্বদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানবাধিকার সংগ্রামের ফসল হিসেবে। আর এই ফসল ফলিয়েছেন আমাদের জাতির পিতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের ধারক-বাহক, উদ্দীপক ও মহানায়ক ছিলেন তিনি। মহান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রে স্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে, বাংলাদেশের জনগণের জন্য সমতা, মানবসত্তার মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। আর এগুলোর সমষ্টিই হলো মানবাধিকার। আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পর মাত্র ১০ মাসের মাথায় বঙ্গবন্ধু যে সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন, সেই সংবিধানে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত ৩০টি অনুচ্ছেদ সংবলিত সর্বজনীন মানবাধিকার দর্শনের পুরোপুরি প্রতিফলন রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন, নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পাদন না করলে অধিকার বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে হলে সবাইকে দায়িত্ব সম্পাদন করতে হবে। তাঁর ভাষায়, 'আমরা যদি একটু কষ্ট করি, একটু বেশি পরিশ্রম করি, সকলেই সৎপথে থেকে সাধ্যমতো নিজের দায়িত্ব পালন করি এবং সবচাইতে বড়ো কথা সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকি, তাহলে আমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারি, ইনশাল্লাহ, কয়েক বছরেই আমাদের স্বপ্নের বাংলা আবার সোনার বাংলায় পরিণত হবে।'

বঙ্গবন্ধু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী একজন অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানুষ। পাকিস্তান শাসনামলের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রাক্কালে ও স্বাধীনতা-উত্তর দেশ গঠনে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে তিনি যেসব বক্তৃতা দিয়েছেন, সেই বক্তব্যের নির্যাস থেকেই তা প্রতীয়মান হয়। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমল থেকেই বঙ্গবন্ধু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার ছিলেন। বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতা স্থান পাবে

না, এ বিষয়ে তাঁর প্রত্যয় ছিল অবিচল। বঙ্গবন্ধু বলতেন, এই রাষ্ট্রের মানুষ হবে বাঙালি। তাদের মূলমন্ত্র হবে–'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ধর্মকে ব্যবহারের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে সব ধর্মই সমান এবং সমঅধিকার দাবিদার। তাঁর চিন্তা-চেতনায় মানবাধিকারের অন্যতম দর্শন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সব সময়ই সমুজ্জ্বল ছিল।

বঙ্গবন্ধু দুর্নীতিকে ঘৃণা করতেন। তিনি জানতেন, দেশের উন্নয়নের অন্যতম বাধা হলো দুর্নীতি। দুর্নীতিবাজ, মুনাফাখোররা অন্য মানুষের অধিকার হরণ করে নিজেরা মুনাফা লোটে। তিনি তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় দুর্নীতিবাজ-মুনাফাখোর-চোরাকারবারিদের দমনে কঠোর মনোভাব পোষণ করেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও পিতার মতোই দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতা নীতি গ্রহণ করছেন। কার্যত বাংলাদেশের মাটি থেকে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, মাদককে রুখে দেওয়ার এখনই সময় এবং সবার সমবেত প্রচেষ্টায় তা প্রশমিত হবে বলে বিশ্বাস করি।

বঙ্গবন্ধু একজন মানবপ্রেমী মানুষ ছিলেন। মানুষের প্রতি তাঁর ছিল অসামান্য দরদ। ছোটো-বড়ো, ধনী-গরিব–নির্বিশেষে সবাইকে তিনি ভালোবেসেছেন। তিনি মানুষকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। মৃত্যুর আগমুহূর্তেও তিনি তাঁর মানবপ্রেমের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার সাক্ষী সেলিম (আব্দুল) ছোটোবেলা থেকেই বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সঙ্গে থাকতেন। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় সাক্ষ্য দেওয়াকালে আব্দুল উল্লেখ করেন, দুজন কালো পোশাকধারী তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে। তাঁর হাতে এবং পেটে গুলি খেয়ে তিনি দরজার সামনেই পড়ে যান। পরে সিঁড়ির পাশে হেলান দিয়ে বসে থাকা অবস্থায় দেখেন, চার-পাঁচ আর্মির লোক বঙ্গবন্ধুকে তাঁর রুম থেকে ধরে সিঁড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যাওয়ার সময় বঙ্গবন্ধু তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে বলেছিলেন, 'ওই ছেলেটা, ছোটোবেলা থেকে আমাদের এখানে থাকে, একে কে গুলি করল?' এ রকম একটা অচিন্তনীয় ভীতিকর পরিস্থিতিতেও বঙ্গবন্ধুর মন কেঁদে উঠেছিল কাজের ছেলে আব্দুলের জন্য। বঙ্গবন্ধু সারা জীবন অন্যের অধিকার সুরক্ষা করতে গিয়ে ব্যক্তিগত জীবনের, নিজের আরাম ও আয়েশের কথা ভাবেননি। অথচ বাঙালি জাতির কী দুর্ভাগ্য যে পাকিস্তানি হানাদাররা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার সাহস না করলেও এ দেশেরই একদল বিপথগামী সেনা সদস্য কল্পনাকেও হার মানিয়ে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে

নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ড ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্যতম ঘটনা এবং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, তা কখনোই পূরণযোগ্য নয়।

মানবাধিকার সুরক্ষায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর শাসনামলেই প্রণীত হয় মানবাধিকার কমিশন আইন-২০০৯। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আইনের বিধান অনুযায়ী এর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম স্বাধীনভাবে পরিচালিত করছে। ২০২১ সালের মানবাধিকার দিবসের প্রতিপদ্য হলো : ইংরেজিতে EQUALITY– Reducing inequalities, advancing human rights. বাংলায় প্রতিপাদ্য হলো, 'বৈষম্য ঘোচাও, সাম্য বাড়াও, মানবাধিকারের সুরক্ষা দাও।' টেকসইই উন্নয়নের মূলমন্ত্রও হলো কাউকে পেছনে ফেলে নয়। কিন্তু নারী-পুরুষ, ধনী-গরিবের বৈষম্য সমাজে এখনো বিদ্যমান। নারীর ক্ষমতায়নে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ সবার সেরা। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেয়েদের জীবনের অধিকার, সম্পত্তির মালিকানা, সম্ভ্রম-সুরক্ষা নিয়ে এখনো অনেক প্রশ্ন রয়েছে। কন্যাসন্তানকে এখনো অনেকেই পুত্রসন্তানের ন্যায় সমভাবে দেখেন না। যদিও আমাদের অনেক কন্যাই এখন শিক্ষাদীক্ষা, ক্রীড়া-সংস্কৃতি এবং কর্মস্থলে সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের চেয়ে যে কম যোগ্য নন; তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। এর পরও কোনো কোনো পরিবারে এখনো কন্যাশিশুর জন্ম দেওয়ার সুবাদে জন্মদাত্রী মাকে কতই না গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। কন্যাসন্তানের সম্পত্তি পাওয়ার অধিকারের বিড়োম্বনা এবং কন্যাসন্তানের সম্ভ্রম-সুরক্ষার অনিশ্চয়তা এর একটি বড়ো কারণ হিসেবে আমি মনে করি।

গণমাধ্যম সূত্রে আমরা প্রায়ই দেখে থাকি নারীদের ধর্ষণের মতো ঘৃণ্যতম ঘটনার শিকার হতে। রাস্তাঘাটে, কর্মস্থলে–এমনকি বাড়িতে পরিবারের নিকটতম স্বজনের দ্বারা। ছয় বছরের শিশু থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধাকেও ধর্ষণের শিকার হতে হয়। ধর্ষণের মতো ঘৃণ্যতম ঘটনার বিরুদ্ধে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বলেছেন ধর্ষকের কোনো দল নেই। আইন অনুযায়ী তার দৃষ্টান্তমূলক বিচার হবে। আইন সংশোধন করে ধর্ষকের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে; কিন্তু ধর্ষণের মতো ঘটনাগুলো ঘটছেই। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অবাধ পর্নোগ্রাফি দেখার সুযোগ থাকায় ধর্ষণের মতো ঘটনাগুলো ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিশোর গ্যাং তৈরি হচ্ছে। এই

ঘৃণ্যতম অপরাধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। নারী-পুরুষ–নির্বিশেষে একত্র হয়ে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ তুলতে হবে; পরিবারে নারীকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পারিবারিক সহিংসতা বন্ধ করা এবং গৃহকর্মে নারীর অবদানের মূল্যায়ন এখন সময়ের দাবি।

এ ছাড়া পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণেও বর্তমানে সমাজে এক ধরনের অস্থিরতা ও অনাচার তৈরি হয়েছে। অনেক সময় গুজবের মাধ্যমেও সমাজে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির অপচেষ্টা হয়, যা কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয়। এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য একাধারে পারিবারিক মূল্যবোধ, সামাজিক মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতার বিকাশ সাধন যেমন প্রয়োজন, তেমনি তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত আজকের যারা কিশোর-কিশোরী তাদের মধ্যেও মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে হবে। তারাই আমাদের আগামী, তাদেরকে মানবাধিকারের অ্যাম্বাসাডর হিসেবে তৈরি করা এখন সময়ের দাবি।

আমি মনে করি, পারিবারিক, সামাজিক মূল্যবোধ তৈরির মাধ্যমে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। নারী-পুরুষ, হিজড়া-প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ে নয়; আমরা সকলেই মানুষ। এই মানুষ পরিচয় নিয়ে যেদিন পরিচিত হতে পারব, সেদিনই সমাজে মানবাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেই লক্ষ্য নিয়েই বর্তমান কমিশন কাজ করে যাচ্ছে। আমি নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি, গণঅংশীদারিত্ব ছাড়া বড়ো কোনো সাফল্য আসতে পারে না। অতএব আসুন, সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাকে একটি মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর বুকে সমুন্নত করার প্রত্যয়ে এগিয়ে যাই। উন্নত বিশ্বে বাংলাদেশ মানবিক রাষ্ট্র মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে–এটাই প্রত্যাশা।

লেখক : সাবেক চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

বঙ্গবন্ধু হত্যা : প্রতিবাদী আন্দোলনের চাপা পড়া ইতিহাস

মুহাম্মদ শামসুল হক

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যা পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে মর্মস্পর্শী ও জঘন্য ঘটনা। দানবচক্র বঙ্গবন্ধু ছাড়াও তাঁর পরিবারের অন্য সদস্য-সদ্যবিবাহিত পুত্রবধূ, এমনকি নয়-দশ বছর বয়সি শিশু রাসেলসহ নিকটাত্মীয়, যাদের হাতের নাগালে পেয়েছে তাদেরও নির্মমভাবে হত্যা করে। সেদিন বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর ছোটো বোন শেখ রেহানা দেশের বাইরে থাকায় ঘাতকের বুলেট তাঁদের ছুঁতে পারেনি।

লক্ষ করা গেছে, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার দাবি এবং শাস্তি প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হলে–এমনকি বর্তমানেও কিছু লোক এই বলে অপপ্রচার চালান যে বঙ্গবন্ধুর মতো অবিসংবাদিত নেতার হত্যাকাণ্ডের পর কোথাও কোনো প্রতিবাদ-প্রতিরোধ হয়নি। তাঁরা বোঝাতে চান যে পঁচাত্তর সাল নাগাদ বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তা অত্যন্ত কমে গিয়েছিল। তাই নিজ দলের নেতাকর্মীরাও তাঁর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর টুঁ শব্দ পর্যন্ত করেননি। আসলে এমন অপপ্রচারের মাধ্যমে তাঁরা নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত এবং বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তাকে খাটো করে দেখাতে চান।

অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তির অবস্থান ও সামরিক ব্যক্তির পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের আকস্মিকতায় সাধারণ মানুষসহ অনেক নেতাকর্মীর মধ্যে প্রথমে বিভ্রান্তি দেখা দিলেও দেশের অনেক জায়গায় সেদিনই প্রতিবাদ মিছিল হয়েছিল। পরবর্তী দুই-তিন মাসের মধ্যে দেশের একটি বড়ো অংশ জুড়ে গড়ে উঠেছিল বৃহত্তর প্রতিবাদ-প্রতিরোধ কর্মসূচি, যা একাত্তরের গেরিলা যুদ্ধের রূপ নিয়েছিল। তবে এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে তাৎক্ষণিক নির্দেশনা না পাওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর পরিসরে প্রতিরোধ গড়ে না ওঠার কারণগুলোও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

যেমন : ১৫ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর আগমনকে ঘিরে কর্মসূচির পরের দিন ছিল নবগঠিত জাতীয় যুবলীগের নেতাকর্মীদের সম্মেলন ও পরিচিতি অনুষ্ঠান। এ উপলক্ষে সারা দেশের জেলা পর্যায়ের শীর্ষ নেতারা অবস্থান করছিলেন ঢাকায়। অর্থাৎ সাংগঠনিকভাবে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ-

প্রতিরোধের ডাক দেওয়ার মতো লোকজন জেলা পর্যায়ে ছিলেন না বললেই চলে। বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ঘেঁটে জানা যায়, বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র যে চলছিল তা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যস্তরের একাধিক কর্মকর্তাসহ দেশি-বিদেশি শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনেকে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। নেতাদেরও কেউ কেউ তাঁকে ৩২ নম্বর বাড়ির নিরাপত্তাহীনতার কথা ভেবে গণভবনে থাকার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তিনি সরল বিশ্বাসের কারণে কারো কথাই শোনেননি এবং কোনোরূপ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে প্রশাসন বা দলীয় নেতাকর্মীদের কোনো নির্দেশনা দেননি।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের খবর পাওয়ার পর পরিস্থিতির কারণে শীর্ষ পর্যায়ের কাউকে পাওয়া না গেলেও স্থানীয় নেতাকর্মীরা পরস্পর যোগাযোগের মাধ্যমে ওই দিনই তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল বের করেছিলেন দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর চট্টগ্রাম, বরগুনা, কিশোরগঞ্জসহ বিভিন্ন এলাকায়। ঘটনার প্রথম দিনেই চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্র দখল করে জনগণকে প্রতিবাদে শামিল হওয়ার আহ্বান জানানোর উদ্যোগও নেওয়া হয়। কিন্তু প্রবীণ নেতাদের কেউ কেউ অসংগঠিত ও নিরস্ত্র অবস্থায় এ ধরনের কর্মকাণ্ড ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় সম্মত না হওয়ায় উদ্যোগটি বাতিল হয়।

তিন-চার দিনের মাথায় মিছিল হয় ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে। ছাত্র-কর্মীদের চেষ্টার ফলে ২০ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন ও কলাভবন এলাকায় চলে সমাবেশ, মিছিল-স্লোগান। পরদিন আবারও মিছিল করতে গিয়ে সামরিক সরকারের সমর্থক ও পুলিশি হামলার শিকার হন ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা। এরই মধ্যে গোপনে সংগঠিত হয়ে ৪ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আশপাশের এলাকা ঘিরে মিছিল সমাবেশ, দেয়াল লিখন ও পোস্টারিংয়ের মাধ্যমে প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নসহ বাকশালভুক্ত ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। এ সময় ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। এতে শিক্ষার্থী ছাড়াও বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ অংশ নেয়। সেখানে উপস্থিত অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। ওই দিন চট্টগ্রামেও কয়েক জায়গায় মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিল হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ ছাড়া শেরপুর, পাবনা, ভৈরব, মুক্তাগাছায় প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয়। তবে সব কটি মিছিল-সমাবেশই পুলিশ ও সেনাবাহিনীর বাধার কারণে সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছিল। কোথাও কোথাও সেনাবাহিনীর হামলার

কারণে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এরই ফাঁকে ঘনিষ্ঠজনদের নিয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধের লক্ষ্যে সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে ময়মনসিংহের সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থান নেন মুক্তিযোদ্ধা আবদুল কাদের সিদ্দিকী বীর-উত্তম। একই রকম চিন্তা নিয়ে সংগঠিত হচ্ছিলেন বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শহিদ শেখ কামালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ও পরে জাতীয় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সদস্য সৈয়দ নুরুল ইসলাম নুরুসহ বিভিন্ন কলেজ ও অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। নভেম্বরে পর্যায়ক্রমে তাঁরাও গিয়ে যোগ দেন কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে। গঠিত হয় জাতীয় মুক্তিবাহিনী। অল্পসংখ্যক বঙ্গবন্ধুপ্রেমিক সদস্য নিয়ে এই বাহিনী কাজ শুরু করলেও গোপন সাংগঠনিক তৎপরতার ফলে এক বছরের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছয়-সাত হাজার, কারো কারো মতে, আরো বেশি প্রতিবাদী যোদ্ধা এতে যুক্ত হন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ছিলেন একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা। ছিলেন নারায়ণগঞ্জের নাসিম ওসমান (পরে সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রী), আবদুল লতিফ সিদ্দিকী (প্রাক্তন মন্ত্রী), তৎকালীন ছাত্রলীগের আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক দীপঙ্কর তালুকদার (বর্তমান এমপি), নগর ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক আবদুর রউফ সিকদার, ঢাকা আইডিয়াল কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সামাদ পিন্টু, সামীম মোহাম্মদ আফজাল (প্রয়াত মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন), জাতীয় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সদস্য সেলিম তালুকদারসহ অনেকে।

প্রতিরোধ যোদ্ধারা নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, সুনামগঞ্জ, শেরপুর, জামালপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলার সীমান্ত এলাকায় অবস্থান নিয়ে কখনো বাংলাদেশ, কখনো ভারতের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনী ও বিডিআরের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তাঁদের একটি গ্রুপ খন্দকার মোশতাক আহমদকে হত্যা করার জন্য ঢাকা এসে ধরা পড়ায় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারেননি।

একইভাবে চট্টগ্রামের তৎকালীন ছাত্র ও যুবনেতা, একাত্তরে চট্টগ্রাম শহর গেরিলা বাহিনীর প্রধান মৌলভী সৈয়দ আহমদ, এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী (চট্টগ্রামের প্রয়াত সিটি মেয়র), যুদ্ধকালীন বিএলএফের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার এস এম ইউসুফ তাঁদের অনুসারীদের সংগঠিত করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধমূলক নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেন। অনেক মুক্তিযোদ্ধাসহ যুব ও ছাত্রলীগের কয়েক শ নেতাকর্মী ক্রমান্বয়ে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হন। এদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় মূলত চট্টগ্রাম মহানগরসহ বিভিন্ন থানা এলাকায়। মৌলভী সৈয়দ একটি কমান্ডো গ্রুপ নিয়ে লিবিয়া গিয়ে খুনিদের হত্যা করার

পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। ৭৭ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত চলমান ওই যুদ্ধে দুই পক্ষেরই উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সদস্য হতাহত হয়। দেশের ভেতরেও স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে কিছু কাজ করেছেন তাঁরা।

প্রতিবাদ মিছিল, সমাবেশ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের শুরুর দিক থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্তদের মধ্যে ছিলেন আ র ম উবায়দুল মুকতাদির (বর্তমানে সংসদ সদস্য), ছাত্র ইউনয়ন নেতা মাহবুব জামান, সাজেদা চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, এস এ মালেক, ওবায়দুল কাদের, ইসমত কাদির গামা, বাহলুল মজনু চুন্নু, খ ম জাহাঙ্গীর, চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সিরাজুল হক মিয়া, আবদুল্লা আল হারুন চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু, এম এ মান্নানসহ অনেকে।

তবে প্রতিবাদী প্রতিরোধ যোদ্ধাদের রণকৌশলে কিছুটা ভিন্নতা ছিল বলে জানা যায়। কারো কারো লক্ষ্য ছিল হত্যাকারী ও তাদের মদদদাতা সামরিক কর্তৃপক্ষকে সশস্ত্র উপায়ে হটিয়ে নিজেদের কর্তৃত্বে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করা। অন্যদিকে অনেকের লক্ষ্য ছিল কিছুটা সশস্ত্র কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সরকারকে ব্যতিব্যস্ত রাখার পাশাপাশি এলাকাভিত্তিক বৈঠক-সমাবেশ, লিফলেট বিতরণ, দেয়াল লিখন ইত্যাদির মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করা–যাতে জনমনে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনার পুনর্জাগরণ ঘটিয়ে দলকে সংগঠিত করে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়। সে সময় পোস্টারে-মিছিলে স্লোগান ছিল 'এক মুজিব লোকান্তরে, লক্ষ মুজিব ঘরে ঘরে', 'মুজিব হত্যার পরিণাম–বাংলা হবে ভিয়েতনাম', 'আমরা সবাই মুজিব হবো, মুজিব হত্যার বদলা নেব' ইত্যাদি।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের দিন থেকেই সামরিক সরকার এ ধরনের প্রতিবাদ-প্রক্রিয়া যে ঘটবে তা আঁচ করতে পেরে দেশব্যাপী নেতাকর্মীদের ব্যাপক ধরপাকড় ও নির্যাতন শুরু করে। প্রতিরোধযুদ্ধে পুলিশ, বিডিআর, সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে কয়েক শ যোদ্ধা নির্মম নির্যাতনের শিকার হন। সব মিলিয়ে মারা যান প্রায় ১০০ জন। তারা গ্রেপ্তার ও আত্মগোপনে থাকা অনেকের বিরুদ্ধে নানা রকম মামলা করে। ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামের সেনা ক্যাম্পগুলোতে কিছু সামরিক কর্মকর্তা গ্রেপ্তারকৃতদের বঙ্গবন্ধুর দালাল এবং সরকার উৎখাতের চেষ্টা করেছেন মর্মে স্বীকারোক্তি আদায়ের নামে অমানবিক নির্যাতন করেন। অন্তত ১০ জন ভুক্তভোগীর বর্ণনা অনুযায়ী টর্চার সেলে তাঁদের এমন নির্যাতন করা হয়, যা মনে পড়লে এখনো আঁতকে ওঠেন তাঁরা। এ রকম নির্যাতনে ঢাকার একটি কেন্দ্রে নির্যাতনে শহিদ হন একাত্তরে চট্টগ্রামের মুক্তিযোদ্ধা মৌলভী সৈয়দ

আহমদ। এ ছাড়া অনেকে গ্রেপ্তার এড়িয়ে ১৯৭৫ থেকে '৮১ সাল পর্যন্ত হুলিয়া মাথায় করে এখানে-সেখানে আত্মগোপনে থেকে দুঃসহ জীবন কাটাতে বাধ্য হন। কিন্তু সামরিক সরকারের রোষানলে পড়ার ভয়ে কোনো সংবাদমাধ্যমে এসব তৎপরতার কোনো খবর প্রকাশ পায়নি। এ ছাড়া এখনকার মতো কোনো বেসরকারি কোনো যোগাযোগমাধ্যম না থাকায় সেই প্রতিবাদ- আন্দোলনের ইতিহাস চাপা পড়ে যায়। থেকে যায় সাধারণ মানুষের অগোচরে।

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে অনেকটা গোপনে এবং বিক্ষিপ্তভাবে হলেও বঙ্গবন্ধু হত্যার এই প্রতিবাদী আন্দোলনের ফলে সারা দেশে দিশেহারা, ঝিমিয়ে পড়া বঙ্গবন্ধুর অনুসারীরা রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার ব্যাপারে নতুন করে সাহস ও প্রাণ ফিরে পান। ফলে ঘরোয়া রাজনীতি শুরু হলে সংশ্লিষ্ট সবাই দলকে পুনর্গঠনে উৎসাহী ও উদ্যোগী হন, যার ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগকে সাংগঠনিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো সহজ হয়।

লেখক : মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষণাকর্মী ও সম্পাদক, ইতিহাসের খসড়া

Juvenile Delinquency
Efforts to Put Derailed Teenagers on Track

Md. Saifullah

Juvenile delinquency means crimes committed by young people. 'Juvenile' means youngsters of age group from 13 to 18 years. Juvenile is a negative expression to mean the turmoil nature of this stage of life with the onset of puberty which is a transition from childhood to adolescence. The positive word used for juvenile is 'youth' while the word 'adolescent' for the same is used from neutral point of view.

'Delinquency' refers to minor crimes perpetuated by juveniles. These crimes include truancy or skipping school, copying or cheating in examinations, leaving home without notice, drinking (alcohol), smoking (cigarette), ragging, eve-teasing, eloping, watching pornography, travelling by bus or train without tickets, pick-pocketing, pilferage, etc. Juveniles under some conditions become so arrogant that they do not care social or religious values, norms, rules and regulations of the state. They are even found forming gangs and getting involved in serious offences like murder, rape, kidnap, robbery, having drugs, trading narcotics, etc.

Why do juveniles indulge in such anti-social activities? Why is juvenility so destructive? The reasons are multifarious. Human beings at this stage go through a series of physical, biological and psychological changes. Various growth hormones secreted from the bodz glands always keep them unstable. They are moved by emotion, not by reason as found in case of the grown up people. There are also some social pressures which sometimes become unbearable. Excessive pressure for studz, poverty, ruthless punishment by parents or

guardians, or even boundless freedom in the affluent society may lead them to such infamous juvenility. They always prefer to fly in the world of dream keeping them away from the harsh reality. Open sky culture, globalization and widespread social media also contribute to build up this dreamy world. The callousness of the parents or guardians towards their wards or even excessive care by them also may be a cause of such derailment. The increasing trend of social unrest, fragmentation of the joint or extended families, family conflicts, broken families due to separation of parents, mad business of parents chasing after riches are also fuelling the problem.

However, there is a basic difference between juvenile delinquency and regular crime. Crimes and criminal activities are deliberately perpetuated by the adult people to fulfill their own interest or ill-motives. On the other hand, juveniles usually get involved in tiny crimes out of their emotion or influenced by surrounding environment specially peer group without thinking consequences of their deeds. And that is why, young offenders enjoy some sort of impunity in the trial process. Trial courts, penal code under which verdicts are pronounced and even execution of sentences are softer for the tender lawbreakers in compare to the normal criminals. And from that angle, under-aged criminals are sent to the amendment centres, not to the regular jails with a hope of their return to the normal life in course of time.

The juvenile delinquents are being dealt as per the Children Act 2013 which considers the young offenders (age 13 to 18 years) as children following the call of the United Nations Children Rights Charter. Imbued with the spirit of the law, each and every police station of the country has installed a separate desk on the children affairs to dispose the related cases. A police official holding the responsibility of the desk in the police station monitors such lawsuits maintaining a constant coordination with the representatives of the Department of

Social Services and the courts concerned. More importantly, the Children Act 2013 envisages the provision of setting up the Children Courts to try the related offences considering their VULNERABILITIES. AS THOSE COURTS ARE YET TO BE ESTABLISHED, THE WOMEN AND CHILDREN Repression Combating Tribunals (Nari o Shishu Nirjatan Domon Tribunal) are dealing the cases. At present, a total of 101 such tribunals spreading all over the country regularly hear the cases filed against juveniles. If such tribunal is not in operation in any district, the court of the District and Session Judge itself performs the responsibility.

The trial process of the young perpetrators as delineated in the Children Act 2013, is very mild. They should not be handcuffed or roped when brought under arrest. The decoration of the courts would be informal with the policemen, lawyers and court officials wearing informal dresses. The informal outlook of the courts may help to keep the environment congenial for the minor accused. Rude language or behaviour should be avoided while recording deposition. Moreover, their parents or guardians would be allowed to accompany them during the hearing of the case in the court. Any news-story or photograph of the children concerned with the trial process would never be ventilated through print, electronic or social media, which may expose their identity before public and cause humiliation.

The trial process of the cases filed against such alleged tender aged convicts is very liberal. The bail granting process for them is also soft. If bail is not allowed in any case considering its severity, the young arrestees would be detained in the Children Development Centres run by the Department of Social Services. If any such inmate is to be sent to jail in view of the harsh nature of any case, he or she must be kept separately, never with the adult convicts. The law permits the highest 10 years of imprisonment for committing the most gruesome offence. There is no provision of awarding capital

punishments like death sentence or life imprisonment under the law. The Alternative Dispute Resolution (ADR) approach is being given priority to dispose the cases at any stage of the trial process in the court.

The government has developed a huge institutional set up for the proper grooming of the young generation. Rules, regulations and policies on the issue have also been updated. The government has to take the responsibilities of the distressed kids in absence of their parents or guardians. A good number of establishments with various identities are being run by the government across the country to accommodate and look after these shelterless children. The Ministry of Women and Children Affairs is patronizing eight thousand clubs working on the issues relating to the children at the union level. All the benevolent activities by the government include the amendment of the derailed juveniles and bringing them back to the right track. Over 1100 delinquents involved with the legal process or received from courts are now under shelter at four dedicated development centres in Gazipur (Tongi, Konabari and Joydevpur) and Jashore (Pulerhat). Among them, the Joydevpur Centre under the Department of Women Affairs and the Konabari Centre under the Department of Social Services with the total capacity of accommodating 250 inmates are purely for female inmates. The Children Welfare Boards at the national, district and upazila level headed by Social Welfare Minister, Deputy Commissioners and Upazila Nirbahi Officers, respectively regularly monitor all the children development programmes.

Juvenile delinquency is a universal problem. This problem exists more or less in every country and in every society. This menace, in everywhere, is managed through undertaking various programmes. Game and sports, cultural activities, regular counseling, upholding social and religious spirit, and reinforcing family bonding can go a long way to keep our

future generation safe and sound even in a hostile environment. Co-curricular and recreational activities run by the educational institutions are also important in this regard. And above all, the most potential factors are the parents and guardians. They should keep a constant vigilance on the movements of their wards at this stage. They should be tough, rational as well as soft giving due attention to feelings of the Juveniles. Their devoted love and care can turn a delinquent to a worthy citizen of tomorrow.

Writer : Vice-Chairman, Bangladesh Film Censor Board

টেকসই উন্নয়নে সরকার ও গণমাধ্যমের পারস্পরিক সহায়তা

পরীক্ষিৎ চৌধুরী

এবারের ডিসেম্বর অন্য রকম এক ডিসেম্বর। এর আগে ইংরেজি বছরের শেষ এই দিনটি এমনভাবে আর আসেনি। এবারের মতো এত আবেগ, এত প্রাণচাঞ্চল্য, এত আলোকচ্ছটা নিয়ে ডিসেম্বর আসেনি।

এবার বিজয়ের ৫০ বছর উদযাপন করছে বাংলাদেশ। সঙ্গে চলছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। মুজিব শতবর্ষ এবং স্বাধীনতার সুর্বণ জয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে দৃশ্যমান হলো পদ্মা সেতু, রাজধানীতে পরীক্ষামূলক চলল মেট্রো রেল, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত থেকে হতদরিদ্ররা পেল সুসজ্জিত বাড়ি। এই মাহেন্দ্রক্ষণেই সুখবর এলো, স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে মধ্যম আয়ের দেশে প্রিয় বাংলাদেশের উন্নীত হওয়ার প্রস্তাব জাতিসংঘে পাস হয়েছে। এখন রূপকল্পের স্বপ্নদ্রষ্টা প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে এগিয়ে চলেছি ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্র গঠনের অভিযাত্রায়।

এই উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সরকারের অন্যতম সহযোগী দেশের গণমাধ্যমগুলো। গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গণতন্ত্রের জন্য গণমাধ্যমের স্বাধীনতাও অপরিহার্য। কোনো রাষ্ট্র যদি নিজেকে গণতান্ত্রিক দাবি করে, তবে সেখানে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা থাকতেই হবে। গণমাধ্যম সরকারের সমালোচনা করতেই পারে। সেই গণমাধ্যমের স্বাধীনতাও সেই সমালোচিত সরকারকেই নিশ্চিত করতে হবে। কারণ সমালোচনার মধ্য দিয়ে সরকারের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর কারাগারের রোজনামচায় লিখেছিলেন, 'সত্য খবর বন্ধ হলে অনেক আজগুবি খবর গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে, এতে সরকারের অপকার ছাড়া উপকার হয় না' (কারাগারের রোজনামচা, পৃষ্ঠা-৭৯)। মত প্রকাশের পূর্ণ অধিকার এবং সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে তিনি তাঁর বইগুলোতে অসংখ্যবার লিখেছেন এবং সব সময়

এ নিয়ে ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। সেই সত্য ভাষণের যথাযথ প্রতিফলনও তিনি দেখিয়েছিলেন ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নকালে।
সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে উল্লেখ করা রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতির মধ্যে একটি হলো গণতন্ত্র। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণই প্রধান। জনসাধারণের প্রতিক্রিয়াই নির্ধারণ করে দেশটি কীভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করাই গণতন্ত্র। এই মৌলিক অধিকারগুলোর মাঝে মত প্রকাশ ও অবাধ তথ্য প্রবাহের স্বাধীনতা অন্যতম। বাংলাদেশের সংবিধানের ধারা ৩৯(১)-এ চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে এবং ৩৯(২)-এ সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যমের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

মনে করা হয়, জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ১৬ নম্বর সূচকটি। এই সূচকের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান... টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ তৈরি করা। সবার জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ তৈরি করা এবং সর্বস্তরে কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। অর্থাৎ সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে লক্ষ্যমাত্রার অন্য সূচকগুলো অর্জন করা সম্ভব। এখানেই শক্তিশালী ও স্বাধীন গণমাধ্যমের কার্যকারিতার প্রসঙ্গ অনিবার্য। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সূচক অনুযায়ী সমাজে জবাবদিহি ও ন্যায়বিচার এবং সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণমাধ্যমকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতেই হবে।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিতকল্পে বর্তমান সরকার পরিচালনাকারী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০১৮ সালের নির্বাচনি ইশতেহারে সুষ্ঠুভাবে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। ইশতেহারের ৩.৩০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দলটি যেসব লক্ষ্য ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, গত তিন বছরে তার বেশির ভাগ বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে এবং বাকিগুলোর কাজও প্রক্রিয়াধীন।

জাতির পিতার অনুধাবন ও পদক্ষেপকে মাথায় রেখে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি এই খাতকে শক্তিশালী করতে বেশ কিছু যুগান্তকারী উদ্যোগ বাস্তবায়ন

করছেন। তার সর্বশেষ সংযোজন ডাউনলিংককৃত বিদেশি টিভি চ্যানেলে পণ্যের বাণিজ্যিক প্রচার বন্ধ করা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ডিজিটাল কনটেন্ট আপলোডের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও অবৈধ ডিটিএইচ (ডিরেক্ট টু হোম) সার্ভিস সংযোগ উচ্ছেদ স্থানীয় গণমাধ্যমকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখছে।

তারও আগে, পেছনে ফিরে তাকালে শেখ হাসিনার সরকারের প্রথম মেয়াদে (১৯৯৬-২০০১) প্রথমবারের মতো বেসরকারি টিভি চ্যানেল (একুশে টিভি) অনুমোদনের মধ্য দিয়ে দেশে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যুগের সূচনা হয়। পাশাপাশি নৈতিকতা, নিরপেক্ষতা ও পেশাদারির প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাশীল হয়ে দায়িত্ব পালনের প্রতি গণমাধ্যমকর্মীদেরও নিষ্ঠাবান থাকতে হবে।

গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণমাধ্যমের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বৃদ্ধিই গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় সর্বোত্তম সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে। সাংবাদিক সমাজ ও সংবাদমাধ্যমের সমস্যা দূর করে সাংবাদিকতাকে সত্যিকার অর্থে কল্যাণমুখী করতে সরকার দেশের গণমাধ্যমকে সব ধরনের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মত প্রকাশ ও অবাধ তথ্য প্রবাহের স্বাধীনতাকে সমুন্নত রেখেছে। ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই শেখ হাসিনার সরকার 'তথ্য অধিকার আইন' প্রণয়ন এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। যুগান্তকারী এই উদ্যোগের মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে গণমাধ্যমকর্মীসহ আপামর জনসাধারণের জন্য চাহিদা অনুযায়ী তথ্য পাওয়ার একটি আইনি সুযোগের দ্বার খুলে যায়। এর ফলে সরকারি-বেসরকারি অফিসসমূহ আইনে বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে সাংবাদিকদের চাহিদা মোতাবেক তথ্য দিতে বাধ্য। ফলে সরকার পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতের ক্ষেত্রে কার্যকরী পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সারা দেশে সরকারি-বেসরকারি অফিসসমূহে তথ্য প্রদানকারী নির্দিষ্ট কর্মকর্তার সংখ্যা ৪২ হাজার ২৫৪ জন। ২০০৯ সালের জুলাই থেকে গত ১২ বছরে এই আইনের আওতায় সাংবাদিকসহ মোট এক লাখ ১৯ হাজার ৮৩১ ব্যক্তিকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিকদের চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় অনেক কর্মকর্তাকে শাস্তির মুখোমুখী হতে হয়েছে।

সাংবাদিক ও মালিক প্রতিনিধিদের নিয়ে ইতোমধ্যে নবম ওয়েজ বোর্ড গঠন করা হয়েছে। সরকার বেসরকারি টিভি চ্যানেলসমূহের সাংবাদিক,

ক্যামেরাপারসন ও অন্য সহযোগী কর্মীদের ওয়েজ বোর্ডে অন্তর্ভুক্তির কথাও ভাবছে। সংশোধিত পেনাল কোডের অধীনে সম্পাকদের বিরুদ্ধে কোনো মানহানি মামলায় বিজ্ঞ আদালতের সমন ছাড়া শুধু পুলিশি ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করা যায় না। এ ধরনের আইনি সুরক্ষা দেশের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখতে ভূমিকা রাখছে। সাংবাদিক, লেখক ও ব্লগারদের ওপর অপশক্তির ও জঙ্গিদের হামলার ঘটনায় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সরকারের রূপকল্প 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের ফলে আপামর জনসাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে গণমাধ্যম। সারা দেশে বিদ্যুৎ, উচ্চ গতির ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, অসংখ্য টিভি চ্যানেলের সহজলভ্যতা তথ্যকে জনগণের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। পাশাপাশি কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও লাইসেন্সিং রেগুলেশন ২০১০, বেসরকারি এফএম বেতারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা নীতিমালা ২০১০, জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪, বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৪ এবং জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা ২০১৭ (২০২০ সালে সংশোধিত) প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিনিষেধ প্রণয়ন করে অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

গণমাধ্যমকে আরো গণমুখী করতে জাতীয় অনলাইন নীতিমালা অনুসরণে এ পর্যন্ত ১০৮টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল, ১৪টি আইপিটিভি, ১৪টি টিভি চ্যানেলের অনলাইন পোর্টাল এবং ১৫৪টি পত্রিকার অনলাইন নিউজ ভার্সনকে অনুমোদন দিয়েছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

সরকারের গণমাধ্যমবান্ধব নীতির সুবাদে সারা দেশে বিপুলসংখ্যক পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী দেশে মিডিয়াভুক্ত পত্রপত্রিকার সংখ্যা ৭০০-র বেশি। এদের মধ্যে দৈনিক পত্রিকা ৫৬০টি, যার মধ্যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ২৫৫টি। সরকার এ পর্যন্ত ৪৫টি বেসরকারি টিভি চ্যানেল, ২৭টি এফএম রেডিও ও ৩১টি কমিউনিটি বেতারকে লাইসেন্স প্রদান করেছে। এর মধ্যে ৩১টি বেসরকারি টিভি চ্যানেল, ২২টি এফএম রেডিও ও ১৭টি কমিউনিটি বেতারকেন্দ্র বর্তমানে সম্প্রচারে রয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ থেকে ভারতের দূরদর্শন ডিশবিহীন সে দেশে সম্প্রচার করছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর উৎক্ষেপণ দেশের গণমাধ্যম অঙ্গনকে শক্তিশালী করেছে। দেশে টিভি চ্যানেলগুলো এখন অনেক কম খরচে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ ব্যবহার করে সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপেণ করা হলে এই সুবিধা আরো বৃদ্ধি পাবে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও মোবাইল ফোনের ব্যাপক ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ জোরদার হয়েছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ১৭ কোটি মোবাইল সিম ও ১১ কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা, সমাজের ওপর নতুন ধারার গণমাধ্যম–'নিও মিডিয়া'র ব্যাপক প্রভাবের বিষয়টি তুলে ধরছে। অভার দ্য টপ (ওটিটি) মিডিয়া সার্ভিস, ডিটিএইচ (ডিরেক্ট টু হোম) সার্ভিস নীতিমালা ও আইপি (ইন্টারনেট প্রটোকল) টিভি/আইপি রেডিও সেবা রেজিস্ট্রেশন নীতিমালা নিয়েও কাজ করছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়।

দেশে ক্রমবর্ধমান গণমাধ্যম অঙ্গনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে আওয়ামী লীগ সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পেশাগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারা দেশে সাংবাদিকদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্য দক্ষ জনবল তৈরি করতে ২০১৪ সালে সরকার বাংলাদেশ সিনেমা এবং টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে। প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের প্রশিক্ষণে নিয়োজিত প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ ও জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের সম্প্রসারণ করা হয়েছে। গণমাধ্যমকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে রাজধানীর সার্কিট হাউস রোডে ১০৪ কোটি ১২ লাখ টাকা ব্যয়ে ১৬ তলাবিশিষ্ট তথ্য ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে অত্যাধুনিক তথ্য কমপ্লেক্স নির্মাণে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সাংবাদিকদের পেশাগত সহায়তা প্রদানকারী শীর্ষ সরকারি সংস্থা তথ্য অধিদফতর সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুরে বিভাগীয় অফিস স্থাপন করেছে। এর মাধ্যমে সকল বিভাগে তথ্য অধিদফতরের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হলো।

প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া উভয় গণমাধ্যমের সাংবাদিকগণ তাঁদের নিজেদের কর্মস্থলে চাকরির অনিশ্চয়তায় ভোগেন, যা স্বাধীন গণমাধ্যমের জন্য হুমকি। তাঁদের চাকরির এই অনিশ্চয়তা দূর করতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় প্রণয়ণ করতে যাচ্ছে (গণমাধ্যমকর্মী চাকুরির শর্তাবলি) আইন, যা বর্তমানে অনুমোদনের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সাংবাদিকদের আবাসনের জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগও নিয়েছে সরকার। বাংলাদেশ সাংবাদিক

কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন গণমাধ্যমবান্ধব বর্তমান সরকারের আরেকটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সরকারি অনুদানে পরিচালিত এই ট্রাস্টের আওতায় ২০১১-১২ সাল থেকে পাঁচ হাজার ২৬৩ জন অসচ্ছল সাংবাদিককে ১৭ কোটি ৮৭ লাখ টাকা প্রদান করা হয়েছে। করোনাভাইরাস মহামারি মোকাবিলায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেক সাংবাদিক পরিবারকে ১০ হাজার টাকা করে মোট তিন কোটি ৬৬ লাখ ১০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। করোনাভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিকদের জন্য বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টকে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুদান হিসেবে ১০ কোটি টাকা প্রদান করেন, যা বর্তমানে বিতরণ করা হচ্ছে।

তবে অনেক সময় গণমাধ্যমকেও পক্ষপাতিত্ব করতে দেখা যায়। নানা মতাদর্শের ভিন্ন আঙ্গিকের সংবাদ জনসাধারণের কাছে তুলে ধরা হয়। এর মাধ্যমে গণমাধ্যম অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উৎসাহিত করে। গণমাধ্যমের এ ভূমিকা ক্ষেত্রবিশেষে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে হলুদ সাংবাদিকতা, অপসাংবাদিকতার মতো সমস্যার কারণে। গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রসারের সুবিধা নিয়ে সুবিধাবাদীচক্র অসত্য, বিকৃত ও উদ্দেশ্যমূলক তথ্য মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে দেখা যায়। আমাদের দেশে নতুন শতকে ইলেকট্রনিক মাধ্যমের বিস্ফোরণে অনেক টেলিভিশন ও রেডিও চ্যানেলের আগমন ঘটে। সম্প্রতি ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক মাধ্যমে জনসাধারণ সরাসরি মত প্রকাশ করতে পারছে। এখন আর মত প্রকাশের স্বাধীনতা শুধু সংবাদপত্রের ওপরই নির্ভর করে না। এতে যুক্ত হয়েছে সামাজিক মাধ্যম (ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার) ও ব্লগ। তবে এসব মাধ্যমের সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক কিংবা ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষায় অনেক সময় ভুল সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা হয়, এর ফলে গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র বাধাগ্রস্ত হয়। পুঁজিপতি মালিক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রভাবও স্বাধীন সাংবাদিকতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। গণতান্ত্রিক জবাবদিহি ও টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে সংবিধানস্বীকৃত গণমাধ্যমের স্বাধীনতার অধিকার সমুন্নত রাখতে সকল প্রকার গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান ও সাংবাদিকদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের দায়িত্ব।

শত প্রতিকূলতা ও ঝুঁকি সত্ত্বেও গণমাধ্যম দেশে গণতান্ত্রিক বিকাশ ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রযাত্রায়

সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে অমূল্য অবদান রাখছে। এই ভূমিকা অব্যাহত রাখতে সাংবিধানিক অঙ্গীকার অনুযায়ী গণমাধ্যমের অবাধ স্বাধীনতা, গণমাধ্যমকর্মীদের নিরাপত্তাসহ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনের উপযোগী পরিবেশের উত্তরোত্তর বিকাশ নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার সদা সচেষ্ট। গণতান্ত্রিক জবাবদিহি ও সুশাসন সুদৃঢ়তর করতে সরকারের পদক্ষেপ তখনই সার্থকতা পাবে, যখন গণমাধ্যমও দায়িত্বশীলতার স্বাক্ষর রাখবে শতভাগ।

লেখক : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধী বনাম আটকে পড়া বাঙালি

জাফর ওয়াজেদ

১৯৭২ সালের ২৮ জুন থেকে ৩ জুলাই ভারতের শৈলশহর সিমলায় অনুষ্ঠিত হয় ইন্দিরা-ভুট্টো বৈঠক। ভুট্টোকন্যা ১৮ বছর বয়সি বেনজিরও এই সময় উপস্থিত ছিলেন। এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ইন্দিরা তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। প্রথমে ইন্দিরা ও ভুট্টোর মধ্যে বৈঠক হয় অন্য কোনো উপদেষ্টা বা পরামর্শক ছাড়াই। এরপর উভয় সরকারের উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতাদের উপস্থিতিতে ইন্দিরা-ভুট্টোর মধ্যে আরো কয়েক দফা বৈঠক হয়। অতঃপর দুই দেশের মধ্যে অতীতের সব সংঘর্ষ ও যুদ্ধংদেহী মনোভাবের অবসান ঘটিয়ে বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংকল্প ব্যক্ত করে ইন্দিরা ও ভুট্টো এক চুক্তি সই করেন। এটাই 'সিমলা চুক্তি' নামে খ্যাত। সামরিক ও রাজনৈতিক নানা দ্বিপক্ষীয় সমস্যা নিয়ে বৈঠকে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলাদেশের স্বীকৃতি বা যুদ্ধবন্দি ফেরত নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। চুক্তিতে কাশ্মীর সীমান্তসহ দ্বিপক্ষীয় কিছু বিষয়, যেমন–পাকিস্তানের যে অঞ্চল ভারত দখল করেছে, তা ছেড়ে দেওয়া নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়। সিমলা চুক্তির পরপরই বঙ্গবন্ধু মন্তব্য করেন, 'বাংলাদেশের মাটিতেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে।' প্রতিবাদ জানায় ভুট্টো, 'পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের বিচার করার কোনো অধিকার বাংলাদেশের নেই। কারণ পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে ভারতীয় বাহিনীর কাছে।' তখন ভারত সরকার বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়ে বলে, 'প্রকৃত সত্য এই যে পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে ভারতীয় বাহিনী এবং বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত মিত্রবাহিনীর কাছে। আর এ কারণেই যুদ্ধবন্দিদের প্রশ্নে যেকোনো সিদ্ধান্ত ভারত ও বাংলাদেশের মতৈক্যের ভিত্তিতেই গৃহীত হবে।'

যুদ্ধবন্দিদের বিচারকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য পাকিস্তান সরকার সে দেশে আটকে পড়া চার লাখ বাঙালিকে তখন 'জিম্মি' করে। বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশকারী সন্দেহে বহুজনকে বন্দিশালায় আটকে রাখে। প্রায় ১৬ হাজার বাঙালি সরকারি কর্মকর্তা, যাদের একাত্তরেই চাকরিচ্যুত করা হয়েছিল,

তাদের পাকিস্তান ত্যাগের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পাকিস্তান সেখানে আটকে পড়া বাঙালিদের পরিবারসহ অমানবিক পরিবেশে বন্দিদশায় রাখে। অনেক বাঙালি আফগানিস্তানের দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে দেশে আসার পথে মারা যান। যাঁরা আফগানিস্তান হয়ে পালিয়ে আসছিলেন, সেসব বাঙালিকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ভুট্টো সরকার মাথাপিছু এক হাজার রুপি পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। বাঙালিবিদ্বেষী অনেক পাকিস্তানি অসত্য অভিযোগ এনে প্রতিবেশী অনেক বাঙালিকে পরিবারসহ ধরিয়ে দেয়, যাঁদের পুলিশি নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি পাকিস্তানে বাঙালিদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে প্রতিবেদন পেশ করেছিল। যাতে বলা হয়েছিল, 'হাজার হাজার বাঙালি বিনা বিচারে জেলে আটক আছে। পাকিস্তান ত্যাগ করতে পারে এই অভিযোগে বাঙালিদের গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রতিদিনই তাদের হয়রানি করা হচ্ছে এবং তারা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার। বিশেষ করে বাঙালিদের মধ্যে যাঁরা উঁচু পদে রয়েছেন এবং বিত্তবান, তাঁরা দুর্বিষহ অবস্থায় রয়েছেন।

আটকে পড়া বাঙালিদের ফেরত আনার জন্য তাদের পরিবার ঢাকাসহ সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে। প্রয়োজনে যুদ্ধাপরাধীদের বিনিময়ে তাদের স্বজনদের ফেরত আনার দাবি জানাতে থাকে। এই দাবিতে তারা সমাবেশ এবং অনশন পালন অব্যাহত রাখে। ১৯৭২ সালের ৪ মে ঢাকাজুড়ে জনতার বিক্ষোভ মিছিল বের হয় বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার দাবিতে। সরকারের ওপর তারা ক্রমাগত চাপ বাড়াতে থাকে। আটকে পড়া বাঙালিদের ব্যাপারে বাংলাদেশ তখন বিশ্ব জনমতের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করে। বাংলাদেশ এ ব্যাপারে জাতিসংঘের মহাসচিবের সাহায্য কামনা করে ভারতের মাধ্যমে আবেদন জানায়। অন্যদিকে হানাদার বাহিনীর নৃশংসতায় নিহত শহিদদের পরিবারগুলো সারা দেশে সভা-সমাবেশ করতে থাকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার দালাল আইন জারি করে। আলবদর, আলশামস, রাজাকারসহ দালালদের গ্রেফতার অব্যাহত রাখে এবং বিচারকাজ শুরু করে। চীনাপন্থি দল, উপদল ও গ্রুপ এবং মওলানা ভাসানী এই আইন বাতিলের দাবি জানাতে থাকেন।

যুদ্ধবন্দি পাকিস্তানি সেনাদের নিয়েও বিপাকে পড়ে ভারত। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী এদের নিরাপত্তা, খাওয়াদাওয়াসহ ভরণপোষণ এবং ভাতা প্রদান করতে হতো ভারতকেই। এ খাতে প্রতি মাসে ব্যয় দাঁড়াচ্ছিল এক লাখ ডলারের বেশি। যুদ্ধ শেষ, যুদ্ধবিরতি চুক্তিও সই হয়েছে, পরাজিতরা

আত্মসমর্পণও করেছে, সুতরাং তাদের আর আটকে রাখার পক্ষে কোনো যুক্তিও ভারতের সামনে তখন ছিল না। বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্য জাতিসংঘের মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডাহেইম ভারত সফরে এসে ইন্দিরা গান্ধীকে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের ফেরত পাঠানোর বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পরামর্শ দেন। ইন্দিরা অবশ্য সরাসরি জানিয়ে দেন, বাংলাদেশের মতামত অগ্রাহ্য করে ভারত একতরফাভাবে কিছু করতে পারে না, করবেও না। ইন্দিরা জানতেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়ে শেখ মুজিব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধাপরাধীদের প্রথম তালিকায় ১৫০০ পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা ও সেনা সদস্যের নাম প্রকাশ করে; কিন্তু আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী যথাযথ তথ্য-প্রমাণ হাজির করার ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকায় তালিকা কমিয়ে আনে। শেষে তা দাঁড়ায় ১৯৫ জনে। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে গঠিত বাংলাদেশের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি এই তালিকা করে। ১৯৭৩ সালের জুলাইয়ে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে যুদ্ধবন্দি বিষয়ে প্রথম আইন পাস করা হয়।

যুদ্ধাপরাধী বিচারের পথ বন্ধ করতে পাকিস্তানের কূটনৈতিক তৎপরতা এগিয়ে যেতে থাকে। ১৯৭৩ সালের ১০ জানুয়ারিতে ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় লেখা হয়, 'যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন বাংলাদেশের সরকার প্রধান শেখ মুজিবকে পরামর্শদান উপলক্ষে জানিয়ে দিয়েছেন যে একটি বিপুলসংখ্যক যুদ্ধবন্দি ও বেসামরিক ব্যক্তিদের বিচার করা হলে পাকিস্তানের হতোদ্যম জনগণের মধ্যে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হবে, প্রেসিডেন্ট ভুট্টো তা সামলাতে পারবেন না এবং এর ফলে উপমহাদেশে শান্তি স্থাপন সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' যুদ্ধাপরাধী বিচার প্রত্যাহারের জন্য এটাই প্রথম বিদেশি চাপ তা নয়, শুধু যুক্তরাষ্ট্র বা ব্রিটেন এ ধরনের পরামর্শ দিয়েছে, তাও নয়। ১৯৭১ সালে যখন পাকিস্তানি হানাদাররা বাংলাদেশে গণহত্যায় লিপ্ত, তখন যেসব মুসলিম দেশ এসবেরও প্রতিবাদ করেনি, তারা ১৯৫ পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর জন্য গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করে। বিশেষত, মধ্যপ্রাচ্যের ধনী দেশগুলো। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের ভাগ্যের সঙ্গে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের ভাগ্য জড়িত হয়ে পড়ে। তখন ১৯৭৩ সালের ১৭ এপ্রিল টানা চার দিনের আলোচনা শেষে বাংলাদেশ ও ভারতে যৌথ ঘোষণায় যুগপৎ প্রত্যাবাসনের প্রস্তাব রেখে বলে, যুদ্ধবন্দি, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে আটক সব নাগরিককে একযোগে নিজ নিজ দেশে পাঠানো হবে। এর আগে তিনটি দেশ নাগরিকদের সাতটি ক্যাটাগরি প্রণয়ন করেছিল।

এই তালিকায় আটকে পড়া বাঙালি ও বিহারি ছাড়াও পাকিস্তানের যুদ্ধবন্দি ও যুদ্ধাপরাধীরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাকিস্তান এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেনি। তাই প্রস্তাব আনা হয়, ভারত সে দেশে আটক প্রায় ১০ হাজার বন্দিকে পাকিস্তানের কাছে হস্তান্তর করবে। বিনিময়ে পাকিস্তান সে দেশে আটকে থাকা বাঙালিদের মধ্যে দুই লাখকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবে। এ ছাড়া বাংলাদেশে আটক প্রায় দুই লাখ ৬৩ হাজার অবাঙালি তথা বিহারিকেও পাকিস্তান ফেরত নেবে। তার পরও বাংলাদেশ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি থেকে সরে আসেনি। এমনকি অভিযুক্ত পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের এই প্রত্যাবাসন প্রস্তাবের বাইরে রাখে। যুগপৎ এই প্রত্যাবাসনে ভুট্টো সায় দিলেও মাত্র ৫০ হাজার বিহারিকে ফেরত নিতে রাজি হন। তবে ভুট্টো বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের বিচারের তীব্র প্রতিবাদ জানান।

বাংলাদেশ ১৯৫ পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধী ও তাদের দেশীয় সহযোগীদের বিচারের জন্য আইন প্রণয়ন করে। রাজাকার, আলবদর, আলশামস, দালালদের বিচারের জন্য 'বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অধ্যাদেশ ১৯৭২' জারি করে। ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই বাংলাদেশের নয়া সংবিধানের প্রথম সংশোধনী আনা হয়। এতে ৪৭(৩) ধারা সংযুক্ত করা হয়। যাতে 'গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে অন্যান্য অপরাধের জন্য কোনো সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দিকে আটক, ফৌজদারিত্বে সোপর্দ কিংবা দণ্ডদান করার বিধান' অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০ জুলাই জারি করা হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন-১৯৭৩। ফলে মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাদের জন্য পাকিস্তানি সেনা এবং দেশীয় যুদ্ধাপরাধী রাজাকার, আলবদরদের বিচারের ব্যবস্থা নেওয়ার পথ সহজ হয়।

১৯৭৩ সালের ২৮ আগস্ট যে দিল্লি চুক্তি সই হয়, তাতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রশ্নে বাংলাদেশকে ছাড় দিতে হয়। চুক্তিতে বলা হয়, পাকিস্তান বাঙালি 'গুপ্তচরদের' বিচার করবে না। আর যে ১৯৫ যুদ্ধাপরাধী বাংলাদেশ চিহ্নিত করেছে, তাদের বিচার হবে এবং বাংলাদেশেই হবে। তবে এ ব্যাপারে যদি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারে, তবেই তা হবে। বাংলাদেশ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রশ্নে তাদের দৃঢ় অবস্থানের কথা এর পরও উল্লেখ করতে থাকে।

১৯৭৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার নামে প্রথম সপ্তাহেই এক হাজার ৪৬৮ বাঙালি এবং এক হাজার ৩০৮ পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দির

প্রত্যাবাসন ঘটে। বাংলাদেশ ১৯৫ যুদ্ধাপরাধী ফেরত না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকায় পাকিস্তান দুই শতাধিক বাঙালিকে পণবন্দি হিসেবে জিম্মি করে রাখে। এসব সিদ্ধান্তের আগে ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে ভুট্টো একটি নতুন প্রস্তাবও রেখেছিলেন। এতে বলা হয়েছিল, 'পাকিস্তান তার যেকোনো যুদ্ধবন্দির বিচার ঢাকায় অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করে, কারণ অভিযুক্ত অপরাধ পাকিস্তানের একটি অংশেই ঘটেছে। সুতরাং পাকিস্তান নিজে বিচার বিভাগীয় ট্রাইব্যুনাল গঠন করে এদের বিচারে আগ্রহী, যা আন্তর্জাতিক আস্থা অর্জনে সক্ষম হবে' (পাকিস্তান অ্যাফেয়ার্স, ১ মে ১৯৭৩)। কিন্তু টিক্কা খান পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর প্রধান থাকাবস্থায় এসব যুদ্ধাপরাধীর বিচারে পাকিস্তানি প্রস্তাবে সন্দেহ পোষণ করে বাংলাদেশ। তবে বাংলাদেশে যে বিচার করা সম্ভব হবে না, তা বঙ্গবন্ধু পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারেন। কারণ তখন আটকে পড়া নির্যাতিতসহ সাধারণ বাঙালিদের দেশে ফেরত আনা জরুরি হয়ে পড়েছে অথচ এই বাঙালিদের ভাগ্য জড়িয়ে গেছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সঙ্গে। এক দোটানায় পড়ে যায় বাংলাদেশ। তথাপি যুদ্ধাপরাধীদের ছেড়ে দেওয়ার আগে পাকিস্তানের কাছে চারটি বিষয়ে নিশ্চিত হতে চায়। প্রথমত, যুদ্ধাপরাধের জন্য বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তানের নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া। দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে পাকিস্তানে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পথ খোলা রাখা এবং তৃতীয়, সৌদি আরব, মধ্যপ্রাচ্য, চীনসহ অন্যান্য দেশে পাকিস্তানের বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণা বন্ধ করা এবং সর্বোপরি বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতিদান। পাকিস্তানের পার্লামেন্টে ১৯৭৩ সালের ১০ জুলাই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের প্রশ্নে শর্ত সাপেক্ষে ভুট্টোকে একক ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়। ভুট্টো সংসদে বলেন, 'পাকিস্তানি সেনাদের বিচারের দাবি পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত কোনো স্বীকৃতি নয়।'

দিল্লিতে ১৯৭৩ সালের ১২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক বসে। বৈঠক শেষে তিন দেশীয় প্রতিনিধিরা এক যুক্ত ঘোষণায় বলেন, 'উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ গড়ে তোলার স্বার্থে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাতিল করে দেওয়া হবে।' অবশ্য এই যুক্ত ঘোষণার পর আন্তর্জাতিক রেডক্রসের তত্ত্বাবধানে পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের প্রথম দলটি ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা পৌঁছে। কিন্তু এরপর প্রত্যাবাসন থেমে যায়। পাকিস্তান এ ব্যাপারে টালবাহানা শুরু করে, অথচ যুক্ত ঘোষণায় ত্রিমুখী লোক বিনিময় যুগপৎ পরিচালিত হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু ২২ অক্টোবর টোকিওতে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন,

'বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে প্রতিটি বাঙালি ফেরত নিচ্ছে; কিন্তু বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানি নাগরিকদের বিপুলসংখ্যককেই পাকিস্তান নিচ্ছে না'। এর কয়েক দিন পরই ভুট্টো ঘোষণা করেন, 'বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানি নাগরিক বিহারিদের পাকিস্তান ফেরত নেবে না।' অথচ প্রায় পাঁচ লাখ বিহারির মধ্যে অধিকাংশই পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে সে দেশে ফেরত যেতে আগ্রহী। বাংলাদেশের পক্ষে এদের ভরণপোষণ ভারবাহী হয়ে দাঁড়ায় গোড়াতেই।

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনকালে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দি ও আটকে পড়া বাঙালিদের সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু ও ভুট্টোর মধ্যে প্রাথমিক আলোচনা হয়। বঙ্গবন্ধু বৈঠক চলাকালে সাংবাদিকদের জানান, 'পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং বাঙালিদের দেশে ফেরাসহ অনেক বিষয়ে কথা বলার প্রয়োজন হবে। এই সম্মেলন শুরুর আগে, অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো বলেন, 'আমরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছি। আল্লাহর নামে এবং দেশের জনগণের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা করছি।...আমি বলছি না যে এটি আমি পছন্দ করছি। আমি বলছি না আমার হৃদয় আনন্দিত। এটি আমার জন্য একটি আনন্দের দিন নয়, কিন্তু বাস্তবতাকে আমরা বদলাতে পারব না।' ভুট্টোর ঘোষণার আগের রাত, অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারি লাহোরে সৌদি আরব, মিসর, ইন্দোনেশিয়াসহ ৩৭টি মুসলিম দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে উভয় দেশের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হয়। শেষ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিশ্রুতি ছাড়াই পাকিস্তানের স্বীকৃতি আদায়ে সমর্থন হয়।

দিল্লি চুক্তিতে বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানি নাগরিকদের ফিরিয়ে নেওয়ার কথা থাকলেও ভুট্টো তা করেনি। অন্যদিকে চুক্তিতে আটকে পড়া বাঙালিদের দেশে ফেরত পাঠানোর উল্লেখও রয়েছে। ভুট্টো চুক্তির কোনোটিই আসলে কার্যকর করেননি। কারণ ভুট্টো বলেছিলেন, চুক্তির আগে পাকিস্তান নিজে তার জাতীয় আইনের ভিত্তিতে তাদের বিচার করবে। ভুট্টো তো '৭২ সাল থেকেই নিজে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছিলেন; কিন্তু কথা রাখেননি। সময়টা ছিল বাংলাদেশের প্রতিকূলে। আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান অনেকটা নাজুক ছিল। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো ছাড়া আর কেউ সাহায্যের হাত বাড়ায়নি। এমনকি মুসলিম দেশগুলোও নয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার মতো বাস্তব অবস্থা এবং উপকরণগত সহায়তাও বাংলাদেশের ছিল না।

পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের ভুট্টো জিম্মি করে রেখেছিলেন। আন্তর্জাতিক বিশ্ব এ বিষয়ে সেভাবে এগিয়ে আসেনি। ভারত এ ব্যাপারে পাকিস্তানের ওপর চাপ বহাল রেখেছিল; কিন্তু এই বাঙালিদের ফেরত আনার জন্যই সেদিন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করেই ছেড়ে দিতে হয়েছিল। দিল্লি চুক্তি অনুযায়ী, তাদের বিচারের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়নি। যদিও তাদের প্রায়োজনই আর জীবিত নেই; কিন্তু মরণোত্তর বিচারকাজটি পাকিস্তানের করা উচিত তাদের নিজেদের স্বার্থে যেমন, তেমনই বিশ্বের শান্তির স্বার্থেও।

যুদ্ধাপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়ার নজির বিশ্বে আর নেই। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানিদের একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে। মুক্তিযুদ্ধের পর জাতিসংঘ ও শরণার্থী কমিশন এবং রেডক্রস তাদের নিয়ে কাজ করে। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী তাদের শরণার্থী মর্যাদা দেওয়া হয়। রেডক্রস তাদের পুনর্বাসনের চেষ্টার অংশ হিসেবে নাগরিকত্ব পরিচয় লিপিবদ্ধ করলে তারা নিজেদের পাকিস্তানি নাগরিক পরিচয় দিয়ে সে দেশে ফেরত যেতে চায়। সে সময় থেকে বাংলাদেশে অবস্থানরত বিহারিদের 'আটকে পড়া পাকিস্তানি' বলে অভিহিত করা হয়।

এদের পাকিস্তানে ফেরত পাঠাতে আন্তর্জাতিক রেডক্রস ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের ৬৬টি ক্যাম্পে আশ্রয় দেয়। এর মধ্যে ঢাকার মিরপুরে ২৫টি, মোহাম্মদপুরে ছয়টি ক্যাম্প। ১৯৭৩ সালে ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব রেডক্রস বিদায় নিলে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি এদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেয়। আটকে পড়া পাকিস্তানিদের ফেরত নিতে জেদ্দাভিত্তিক সংগঠন রাবেতা আল আলম ইসলাম জরিপ চালায়। তারা তালিকাও প্রণয়ন করে। সর্বশেষ ২০০৩ সালে পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, প্রায় দুই লাখ ৭৫ হাজার উর্দুভাষী পাকিস্তানি ৮১টি ক্যাম্পে বসবাস করছে। এদের ফেরত নিতে পাকিস্তানের সামরিক শাসক জিয়াউল হক সত্তর দশকে একটি তহবিল গঠন করেছিলেন; কিন্তু তা ব্যবহার করা হয়নি। অর্থাৎ পুনর্বাসন থমকে থাকায় তা ব্যয় হয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর ক্যাম্পগুলো বাংলাদেশ সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে চলছে।

১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক রেডক্রস ও রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি পরিচালিত সমীক্ষা অনুযায়ী, পাঁচ লাখ ৩৯ হাজার ৬৬৯ জন বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের পাকিস্তানি নাগরিক দাবি করে সে দেশে ফিরে যেতে চায়। ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এই মানবিক

সমস্যা মোকাবিলায় একাধিক চুক্তি করে। ইন্দো-পাক অ্যাগ্রিমেন্ট ১৯৭৩, জেদ ট্রাইপাটাইট অ্যাগ্রিমেন্ট অব বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, ১৯৭৫ এই চুক্তিগুলোর অন্যতম। ১৯৭৪ সালে তিন দেশের মধ্যে সম্পাদিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ মাত্র তিন শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের পাকিস্তানে ফেরত নিতে সম্মত হয়। চুক্তির আওতায় পাকিস্তান এক লাখ ৪৭ হাজার ৬৩৭ জনকে ফেরত নেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করে। তবে মাত্র এক লাখ ২৬ হাজার ৯৪১ জনকে ফেরত নেয়। বাকি চার লাখ ফেরত নেয়নি।

১৯৯২ সালে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা দেয় যে ৩০০ বিহারি পরিবারকে পাকিস্তানে ফেরত নেওয়া হবে। কিন্তু ১৯৯৩ সালে মাত্র ৫০ পরিবারকে ফেরত নেওয়ার পর প্রক্রিয়াটি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রয়েছে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ফোরামে বাংলাদেশ বিষয়টি উত্থাপন করলেও সন্তোষজনক কোনো সুরাহা হয়নি। আটকে পড়া সবাইকে ফেরত নেওয়ার জন্য বাংলাদেশের অনুরোধ পাকিস্তান উপেক্ষা করে আসছে। একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদারের সহযোগী বিহারিদের বাংলাদেশ জিম্মিও করেনি কিংবা যুদ্ধাপরাধের দায়ে তাদের বিচারের আওতায় আনেনি।

লেখক : একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

পঞ্চাশে বাংলাদেশ

পাশা মোস্তফা কামাল

এক নদী রক্ত পেরিয়ে তিরিশ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। দীর্ঘ ২০০ বছর ব্রিটিশ শাসন আর প্রায় ২৪ বছরের পাকিস্তানি শাসন ও শোষণ বর্তমান বাংলাদেশ নামের ভূখণ্ডটির সম্পদ, সংস্কৃতি এবং আভিজাত্যকে ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছিল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্বে ঘুরে দাঁড়ায় বাঙালি জাতি। আপামর মানুষের বুকভরা ভালোবাসা আর অদম্য সাহস বুকে নিয়ে তিনি বাঙালির বুকে স্বাধীনতার স্বপ্ন এঁকে দেন। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১–দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম আর জাতির পিতার সম্মোহনী নেতৃত্বে বীর বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস আমাদের এনে দেয় কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

স্বাধীনতার ৫০ বছরে এসে অনেকে হয়তো 'কী পেয়েছি' আর 'কী পাইনি' সেই হিসাব কষতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন; কিন্তু বস্তুগত হিসাব করার আগে আমাদের ভাবতে হবে আমরা স্বাধীন মানুষ হিসেবে নিজেদের ভাবার অবকাশ পাচ্ছি, সেটাই প্রথম প্রাপ্তি। পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসনকালে তারা আক্ষরিক অর্থেই আমাদের দাস হিসেবে গণ্য করত–এটা আমাদের বাপ-দাদারা চোখে দেখেছেন। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল মধ্যযুগের দাসপ্রথাকে। প্রতিটি অফিস, আদালত ও কল-কারখানায় পাকিস্তানিরা ছিল প্রভুর ভূমিকায়, আর আমরা ছিলাম তাদের গোলাম। তারা নিজেদের মনে করত 'অভিজাত' আর আমাদের মনে করত নিম্ন জাতের প্রাণী। এই অভিশাপ থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সারাটি জীবন সংগ্রাম করেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই তো জাতির পিতা ১৯৭১ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশের মাটিতে পা রেখেই দর্পিত উচ্চারণ করেছেন 'আমার বাঙালি আজ মানুষ'।

দীর্ঘ পরাধীনতার কারণে যে অর্থনৈতিক শোষণের শিকার আমরা হয়েছিলাম সেই কারণেই জন্মের সময় বাংলাদেশ ছিল পৃথিবীর অন্যতম দারিদ্র্যপীড়িত দেশ। স্বাধীনতার ৫০ বছরে আমরা তার অনেকটা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম

হয়েছি। কিছু তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে এটা সহজেই চোখে পড়বে। স্বাধীনতার পর মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ মানুষই ছিল দারিদ্র্যসীমার নিচে। স্বাধীনতার ৫০ বছরে এসে আজ তা ২০ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। এটা নিশ্চয়ই আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে নির্দেশ করে। স্বাধীনতার অব্যবহিত আগে-পরে আমাদের জিডিপি ছিল শুধু ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর ২০২০ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। ১৯৭০ সালে মাথাপিছু গড় আয় ছিল ১৪০ ডলার, ২০২১ সালে আমাদের মাথাপিছু গড় আয় দুই হাজার ৫৪৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে। ১৯৭২-৭৩ সালে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেটের আকার ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা, আর ২০২০-২১ সালে বাজেটের আকার পাঁচ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকা। ১৯৭২-৭৩ সালে উন্নয়ন বাজেটের আকার ছিল ৫০১ কোটি টাকা, ২০২০-২১ সালে হয়েছে দুই লাখ ১৫ হাজার ৪৩ কোটি টাকা।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আজকের এই উত্তরণের পেছনে রয়েছে এক কঠিন পথ পাড়ি দেওয়ার ইতিহাস। বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের এটি একটি বড়ো অর্জন। এটি সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের সাহসী উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের কারণে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে এসেছেন। বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় ৫০ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ দ্রুতগতিসম্পন্ন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মতো সফলতা দেখিয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ ধীরে ধীরে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হতে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, এমডিজি অর্জন, এসডিজি বাস্তবায়নসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা, কৃষি, দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন, ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, পোশাকশিল্প, ঔষধশিল্প, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ নানা অর্থনৈতিক সূচক আজ বলে দিচ্ছে বাংলাদেশ বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি উদীয়মান শক্তি।

৩০ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে জন্ম নেওয়া এই বাংলাদেশকে আজকের অবস্থানে আসতে অতিক্রম করতে হয়েছে হাজারো প্রতিবন্ধকতা। পদে পদে মোকাবিলা করতে হয়েছে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র এবং স্বাধীনতাবিরোধীদের পেছন থেকে ছুরি মারার অপচেষ্টা। স্বাধীনতার ৫০ বছরপূর্তি উদযাপনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে সেই আলোচনায় না গিয়েও এটুকু উচ্চারণ না করলে এই

নিবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকবে। এসব কিছু অতিক্রম করে যুদ্ধবিধ্বস্ত, প্রায় সর্বক্ষেত্রে অবকাঠামোবিহীন সেদিনের সেই সদ্যোজাত জাতির ৫০ বছরের অর্জন আজ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার থেকে হয়তো আরো বেশি হতে পারত। তবু আমাদের অগ্রযাত্রার পরিসংখ্যান নিতান্ত অপ্রতুল নয়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আটটি লক্ষ্যের মধ্যে শিক্ষা, শিশুমৃত্যু হার কমানো এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। নোবেল বিজয়ী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের করা মন্তব্য এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বকে চমকে দেওয়ার মতো সাফল্য আছে বাংলাদেশের। বিশেষত শিক্ষা সুবিধা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হার এবং জন্মহার কমানো, গরিব মানুষের জন্য শৌচাগার ও স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান এবং শিশুদের টিকাদান কার্যক্রম অন্যতম।

স্বাধীনতার ৫০ বছরে আমরা অর্জন করেছি নিজস্ব অর্থায়নে বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সক্ষমতা। পদ্মা সেতুর দৃশ্যমানতা সেই সাহসী পদক্ষেপের গর্বিত সূচনা। পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর, ঢাকা-চট্টগ্রাম চার লেন, বঙ্গবন্ধু টানেল, ঢাকা মেট্রো রেলসহ দেশের মেগাপ্রকল্পসমূহ বলে দিচ্ছে বাঙালির মাথা তুলে দাঁড়াবার কথা। এই প্রকল্পগুলো দেশের অগ্রগতির স্মারক হিসেবে বিশ্বের দরবারে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

মাথাপিছু আয়, বাজেট বৃদ্ধি, জিডিপি প্রবৃদ্ধি–এসব অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিচায়ক হিসেবে কাজ করে। সরকার কাজ করে যাচ্ছে এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে দেশকে বিশ্বদরবারে অনন্য উচ্চ মর্যাদায় নিয়ে যাওয়ার। ক্ষুদ্র আয়তনের একটি উন্নয়নশীল দেশ হয়েও বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সারা বিশ্বের নিকট প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিবিড়ো সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্রঋণের ব্যবহার এবং দারিদ্র্যদূরীকরণের ভূমিকা, বৃক্ষরোপণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকের ইতিবাচক পরিবর্তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতার ৫০ বছরে এসে দেশের শিক্ষার হার বেড়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ঝরে পড়ার হার রোধ করা হয়েছে। বিনা মূল্যে বই বিতরণ করা হচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার হার বেড়েছে।

বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটেছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ননীতি সংক্রান্ত কমিটি

(সিডিপি) গত ১৫ মার্চ এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়। এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক–এই তিনটি সূচকের যেকোনো দুটি অর্জনের শর্ত থাকলেও বাংলাদেশ তিনটি সূচকের মানদণ্ডেই উন্নীত হয়েছে।

স্বাধীনতার ৫০ বছরে আমরা তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছি অনেক দূর। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতিতে বিশ্ব সম্প্রদায় চমৎকৃত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবতায় রূপ দিতে বাংলাদেশ সরকার নিয়েছে যুগান্তকারী সব পদক্ষেপ। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য দেশের চার হাজার ৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন করা হয়েছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার। তৈরি করা হয়েছে বিশ্বের অন্যতম বিশাল ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল। কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত এই পোর্টালের সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার। দেশের সব কটি উপজেলাকে আনা হয়েছে ইন্টারনেটের আওতায়। কৃষি খাতে অভূতপূর্ব কিছু সাফল্যের জন্য বিশ্বদরবারে বাংলাদেশ বারবার আলোচিত হয়েছে। প্রায় ১৬ কোটি জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

আমরা ক্রমে এগিয়ে যাচ্ছি ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নের পথে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে আরো দৃঢ়ভাবে গড়ে তোলার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে আরো বহুদূর। বাংলাদেশের পঞ্চাশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদাত্ত আহ্বান, 'আসুন, দল-মত-নির্বিশেষে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত, সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি।'

লেখক : উপপ্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

কিশোর অপরাধ : বিপথগামীদের ফেরাতে সরকারি উদ্যোগ

মুহ. সাইফুল্লাহ

কিশোর অপরাধ একটি সামাজিক ব্যাধি। সব দেশে, সব সমাজেই এ সমস্যা কমবেশি দেখা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব অপরাধকে শিশু-কিশোরদের বৃদ্ধি পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর এ সমস্যা সেই প্রাচীন সমাজ থেকে চলে আসছে। বর্তমান সমাজে মা-বাবা উভয়ের ব্যস্ততা, স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ, সাংসারিক অশান্তি, যৌথ পরিবার ব্যবস্থার বিলোপ, মুক্ত আকাশ সংস্কৃতি প্রভৃতি কিশোর অপরাধ সমস্যাকে তীব্রতর করে তুলেছে। আর গণমাধ্যমের ব্যাপক বিস্তৃতির সুবাদে প্রতিনিয়ত চোখের সামনে ভেসে ওঠা অপরিণামদর্শী অপরিণত অপরাধীদের বীভৎস কাণ্ড রীতিমতো সবাইকে ভাবিয়ে তুলছে।

কিশোর অপরাধ আমলে নেওয়ার ক্ষেত্রে অপরাধী প্রকৃত অর্থেই কিশোর কি না, তা নিশ্চিত হতে হয়। শৈশব বয়ঃসন্ধিকাল অতিক্রম করে কৈশোরে পৌঁছায়। কিশোর-কিশোরীদের বয়সসীমা ১৩ থেকে ১৮ বছর। এ বয়সি সবাই জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী শিশু। আর তাই অপরাধে জড়িয়ে পড়া কিশোরদের শিশু হিসেবে বিবেচনা করেই ব্যবস্থা নিতে হয়।

কিশোর অপরাধ বহুবিধ। সহনীয় থেকে অসহনীয় মাত্রা পর্যন্ত। এসব অপরাধের মধ্যে রয়েছে স্কুল পালানো, পরীক্ষায় নকল করা, নিরুদ্দেশ হওয়া, মদ্যপান, ধূমপান, সমবয়সিদের সাথে অযথা ঝগড়া কিংবা মারামারি করা, ইভটিজিং, পর্নো ছবি দেখা, বিনা টিকিটে গণপরিবহনে ভ্রমণ, পকেটমার, ছিঁচকে চুরি প্রভৃতি। কিশোর-কিশোরীরা ক্ষেত্র বিশেষে এতই উদ্ধত হয়ে পড়ে যে তারা সামাজিক বা ধর্মীয় মূল্যবোধ, রীতিনীতিকে তোয়াক্কাই করে না। এমনকি তারা দেশের আইনকানুনকেও বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে। কিশোর গ্যাংদের ভয়ংকর অপরাধীদের মতো হত্যা, ধর্ষণ, গুম, চুরি-ডাকাতি, মাদকপাচার প্রভৃতি গুরুতর অপরাধে জড়িয়ে পড়তেও দেখা যায়।

কেন কচি মনের কিশোর-কিশোরীরা এ ধরনের অসামাজিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়? কেন কিশোর-কিশোরীরা এতটা বিধ্বংসী হয়? এ বয়সে তারা বেশ কিছু শারীরিক, জৈবিক ও মানসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। বয়ঃসন্ধিকালীন বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন হরমোন তাদের অস্থির করে তোলে। এ বয়সে তারা যুক্তি

গ্রাহ্য না করে আবেগতাড়িত হয়। তারা বাস্তবতাকে এড়িয়ে সব সময় স্বপ্নে বিভোর থাকতে চায়। অসহনীয় সামাজিক চাপও কিশোরদের বিভিন্ন অপরাধে ঠেলে দেয়। লেখাপড়ার অতিরিক্ত দখল সামলাতে না পারা, দারিদ্র্য, মা-বাবা বা অভিভাবকের নিষ্ঠুর শাস্তি, এমনকি পরিবারের মাত্রাতিরিক্ত প্রাচুর্যও তাদের বিপথগামিতার কারণ হতে পারে। মা-বাবার উদাসীনতা–এমনকি তাদের অতিরিক্ত আদর-যত্নও সন্তানদের বিচ্যুতি ঘটাতে পারে।

কিশোর অপরাধী ও পূর্ণবয়স্ক অপরাধীর মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। পূর্ণবয়স্ক অপরাধীরা নিজেদের স্বার্থ বা হীন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সুপরিকল্পিতভাবে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। আর কিশোর-কিশোরী অপরাধীরা সাধারণত আগপিছ না ভেবে আবেগতাড়িত হয়ে বা তাদের চারপাশের পরিবেশ, বিশেষ করে সঙ্গীসাথিদের প্ররোচনায় অপরাধে জড়ায়। আর তাই কিশোর-কিশোরী অপরাধীরা বিচারপ্রক্রিয়ায় বেশ কিছু সুবিধা ভোগ করে থাকে। বিচারিক আদালত, অনুসৃত দণ্ডবিধি, দণ্ডভোগ প্রক্রিয়া–সব ক্ষেত্রেই প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের তুলনায় অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের জন্য বেশ কিছু নমনীয়তা রয়েছে। একইভাবে কিশোর অপরাধীদের জামিনপ্রক্রিয়াও সহজ। গুরুতর কোনো অপরাধে জামিন দেওয়া না গেলে কিশোর অপরাধীকে জেলে না রেখে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে রাখতে হবে। দুর্ধষ কোনো কিশোর অপরাধীকে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে তাকে জেলে পাঠাতে হবে, তবে বয়স্ক দণ্ডিত অপরাধীদের সাথে না রেখে তাকে আলাদা ব্যবস্থায় রাখতে হবে। কিশোর অপরাধীদের বিচারে অনুসৃত আইন–শিশু আইন-২০১৩ অনুসারে শিশু অপরাধীদের শাস্তির সর্বোচ্চ সীমা ১০ বছরের কারাদণ্ড। রায়ে ঘোষিত কারাবাসের মধ্যে দণ্ডিত অপরাধীর বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে এবং ১৮ বছর পার হয়ে গেলে বাকি দণ্ড বয়স্ক দণ্ডিত অপরাধীর ন্যায় জেলে কাটাতে হবে। আইন অনুযায়ী, কিশোর অপরাধীদের আজীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিধান নেই। এমনকি আদালতে বিচারপ্রক্রিয়ার যেকোনো পর্যায়ে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে মামলার মিটমাট করা যাবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশু-কিশোরীদের বিকাশে শিশু আইন-১৯৭৪ প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের অনুসরণে শিশু আইন-১৯৭৪-কে আরো যুগোপযোগী করে শিশু আইন-২০১৩ প্রণয়ন করেন। জাতিসংঘ বেঁধে দেওয়া বয়সসীমার প্রেক্ষিতে শিশুদের (১৩ বছর পর্যন্ত) পাশাপাশি কিশোররাও (১৩

থেকে ১৮ বছর) এ আইনের আওতায় পড়ে। আর তাই কিশোর কর্তৃক সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধের তদন্ত ও বিচার, রায়ে ঘোষিত দণ্ড কার্যকর করা, অপরিণত অপরাধীদের সংশোধনের মাধ্যমে মূলধারায় ফিরিয়ে আনাসহ সমাজে এ ধরনের অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের যাবতীয় কার্যক্রম শিশু আইন-২০১৩-তে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আইনের আলোকে দেশের সকল থানায় শিশুদের বিষয় নিয়ে একটি করে আলাদা ডেস্ক (শিশুবিষয়ক ডেস্ক হিসেবে অভিহিত) খোলা হয়েছে। কিশোর অপরাধসংক্রান্ত সকল মামলা নিষ্পত্তিতে এই ডেস্ক কাজ করে। একজন পুলিশ কর্মকর্তা (শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে অভিহিত) এই ডেস্কের দায়িত্বে থাকেন। তিনি কিশোর অপরাধীদের মামলা তদারকির ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট আদালতের সাথে সার্বক্ষণিক সমন্বয় সাধন করেন। কিশোর অপারাধ মামলাগুলোর বিশেষ দিক বিবেচনা করে এই ধরনের মামলা নিষ্পত্তিতে শিশু আদালত প্রতিষ্ঠার বিধান রাখা হয়েছে এই শিশু আইনে। আইনে প্রস্তাবিত এ ধরনের আদালত এখনো দেশে প্রতিষ্ঠা হয়নি। সে প্রেক্ষাপটে প্রস্তাবিত আদালত প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত কিশোর অপরাধ মামলা নিষ্পত্তির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালকে। বর্তমানে সারা দেশে এ ধরনের ১০১টি ট্রাইব্যুনাল নিয়মিতভাবে কিশোর অপরাধ মামলার শুনানি করছে। কোনো জেলায় এই ট্রাইব্যুনাল না থাকলে সে জেলার জেলা ও দায়রা জজ নিজেই কিশোর অপরাধ মামলার শুনানি করেন।

শিশু আইন-২০১৩-তে বলা হয়েছে, শিশু আদালত অপরাধ জামিনযোগ্য না হলেও জামানতসহ বা জামানত ছাড়াই কিশোর অপরাধীকে জামিনে মুক্তি দিতে পারবে। এ আইনে কোনো মামলায় কিশোর অপরাধী গ্রেফতারের ক্ষেত্রে তাকে হাতকড়া পরানো যাবে না বা কোমরে রশি দিয়ে বাঁধা যাবে না। ভয়ভীতি দূর করতে শিশু-আদালতে কাঠগড়া, লালসালু ঘেরা আদালতকক্ষ প্রভৃতি পরিহার করতে হবে, আদালতে উপস্থিত পুলিশ সদস্য, আইনজীবী ও অফিশিয়ালদের নির্ধারিত ইউনিফর্মের পরিবর্তে ইনফরমাল পোশাক পরতে হবে। মামলার শুনানিতে রূঢ়ভাষা বা শিশুসুলভ নয়–এমন ব্যবহার পরিহার করতে হবে। শিশু আদালত আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কিশোর সম্পর্কে 'অপরাধী' 'দণ্ডিত' বা 'দণ্ডাদেশ' প্রভৃতি কঠোর শব্দ ব্যবহার করতে পারবে না। আদালতকে শিশু আইনে ব্যবহৃত পরিভাষা ব্যবহার করতে হবে। মামলার শুনানিকালে মা-বাবা, অভিভাবক, আত্মীয়স্বজন অভিযুক্ত শিশু-কিশোরদের

সাথে আদালতে উপস্থিত থাকতে পারবেন। মামলায় জড়িত শিশু-কিশোরদের ছবি বা মানহানিকর সংবাদ গণমাধ্যমে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা যাবে না।

শিশু-কিশোরদের সঠিকভাবে গড়ে তোলাসহ অপরাধপ্রবণতা থেকে দূরে রাখতে দেশব্যাপী ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো গড়ে তুলেছে সরকার। এসংক্রান্ত আইনকানুন ও নীতি যুগোপযোগী করা হয়েছে। মাতা-পিতা ও অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে অনাথ শিশুদের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হয়। এসব শিশুর খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ বিভিন্ন মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করে সরকারি শিশু পরিবার, সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র, দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র, ছোটোমণি নিবাস প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা হচ্ছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সারা দেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে আট হাজার ক্লাব শিশু-কিশোরদের নিয়ে কাজ করছে। অপরাধপ্রবণ শিশু-কিশোরদের সংশোধনের বিষয়টি এসব ক্লাব গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বর্তমানে আইনি প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত বা আদালতের আদেশে দণ্ড ভোগরত এক হাজার ১০০-র বেশি কিশোর-কিশোরীকে চারটি উন্নয়নকেন্দ্রে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত গাজীপুরের টঙ্গী ও যশোরের পুলেরহাট–এজাতীয় কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে ৯০০-র বেশি কিশোরকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের ২০০-র মতো কিশোরীকে সমাজসেবা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে এবং মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে জয়দেবপুরের জাতীয় কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। সমাজকল্যাণমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় পর্যায়ে শিশু কল্যাণ বোর্ড শিশু-কিশোরদের বিপথগামিতা রোধসহ তাদের সার্বিক কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি তদারক করে থাকে। জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে শিশু কল্যাণ বোর্ড একই ধরনের দায়িত্ব পালন করে।

কিশোর অপরাধ সমস্যা প্রতিকারে পরিবার, সমাজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, নিয়মিত কাউন্সিলিং, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ লালন এবং সুদৃঢ় পারিবারিক বন্ধন শিশু-কিশোরদের সব ধরনের অপরাধ থেকে দূরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মা-বাবা, অভিভাবক ও

পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা। শিশু-কিশোররা কোথায় যাচ্ছে, কার সাথে মিশছে প্রভৃতি সব সময় পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। শাসনের পাশাপাশি শিশু-কিশোরদের আবেগ-অনুভূতিকে গুরুত্ব দিতে হবে। তাদের কথা শুনতে হবে। পরিবারের অপরিসীম ভালোবাসা ও যত্নে আজকে একজন কিশোর অপরাধী হয়ে উঠতে পারে আগামীকালের সুযোগ্য নাগরিক।

লেখক : ভাইস-চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড

‘ওজোনস্তর রক্ষা করি, নিরাপদ বিশ্ব গড়ি’

মো. আশরাফ উদ্দিন

আজ ১৬ সেপ্টেম্বর, বিশ্ব ওজোন দিবস। বায়ুমণ্ডলে ওজোনস্তরের গুরুত্ব ও ওজোনস্তর সুরক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৯৫ সাল হতে বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর এ দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। এ বছর জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UN Environment) দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে ‘Montreal Protocol-keeping us, our food and vaccines cool’ বা ‘মন্ট্রিল প্রটোকল মেনে ওজোনস্তর রক্ষা করি, নিরাপদ খাদ্য ও প্রতিষেধকের শীতল বিশ্ব গড়ি’।

মানুষ ও জীবজগতের অস্তিত্ব রক্ষায় ওজোনস্তরের অবদান অপরিসীম; কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কারণে ওজোনস্তর দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। ক্ষয়িষ্ণু ওজোনস্তরের মধ্যে দিয়ে সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি অতি সহজেই পৃথিবীতে প্রবেশ করে মানবস্বাস্থ্য, জীবজগৎ, উদ্ভিদজগৎ ও অণুজীবের মারাত্মক ক্ষতি করে। মাত্রাতিরিক্ত অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে মানুষের ত্বকে ক্যান্সার, চোখে ছানি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাসসহ স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। এ ছাড়া ওজোনস্তর ক্ষয়ের পরোক্ষ প্রভাবে জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা, খরা ও মরুময়তাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৯৭৪ সালে শেরউড রোল্যান্ড ও মারিও মলিনা ন্যাচার জার্নালে তাঁদের সুবিখ্যাত গবেষণা ফলাফল প্রকাশ করে জানান যে ক্লোরোফ্লোরোকার্বন বা সিএফসি বায়ুমণ্ডলের ওজোনস্তরের ক্ষতিসাধন করছে। এরপর ১৯৮৫ সালে ব্রিটিশ অ্যান্টার্কটিক সার্ভের বিজ্ঞানীরা অ্যান্টার্কটিকায় ওজোন হোলের সন্ধান পান। ফলশ্রুতিতে ওজোনস্তর রক্ষায় জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির (ইউএনইপি) উদ্যোগে ১৯৮৫ সালের ২২ মার্চ ভিয়েনায় একটি আন্তর্জাতিক সভায় ওজোনস্তর রক্ষায় একটি কনভেনশন গৃহীত হয়, যা ‘ভিয়েনা কনভেনশন’ নামে পরিচিত। এই কনভেনশনের উদ্দেশ্য ছিল ওজোনস্তর বিষয়ক গবেষণা, ওজোনস্তর মনিটরিং এবং তথ্য আদান-প্রদান। কিন্তু ভিয়েনা কনভেনশনের আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকায় ও ওজোনস্তর রক্ষার জরুরি

প্রয়োজনে ১৯৮৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর কানাডার মন্ট্রিলে 'মন্ট্রিল প্রটোকল' গৃহীত হয়। জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র এই প্রটোকল স্বাক্ষর করেছে। মন্ট্রিল প্রটোকল গৃহীত হওয়ার ফলে সিএফসি ও হ্যালনসমূহের ব্যবহার বন্ধের লক্ষ্যে এগুলোর ব্যবহার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সংশোধনী ও সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রটোকলটি সময়োপযোগী করে তোলা হয়। এই প্রটোকলের আওতায় বর্তমানে প্রায় ১০০টির মতো ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার ও উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

ওজোনস্তর রক্ষায় গৃহীত মন্ট্রিল প্রটোকলের সর্বশেষ সংশোধনী কিগালি সংশোধনী (Kigali Amendment) নামে পরিচিত। ২০১৬ সালের ১৫ অক্টোবর রুয়ান্ডার রাজধানী কিগালিতে অনুষ্ঠিত মন্ট্রিল প্রটোকলের ২৮তম পার্টি সভায় এই সংশোধনী গৃহীত হয়। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় এই সংশোধনীকে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই সংশোধনীতে অধিক বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ক্ষমতাসম্পন্ন ১৮ ধরনের হাইড্রোফ্লোরোকার্বনের (এইচএফসি) ব্যবহার পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রায় সকল ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যই অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রিন হাউস গ্যাস হিসেবে চিহ্নিত। মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্লোরোফ্লোরোকার্বনসহ (সিএফসি) অন্যান্য প্রধান ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা হয়। এইচএফসি হলো মানবসৃষ্ট পদার্থ, যা ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের বিকল্প হিসেবে আনা হয়েছে। এই এইচএফসিগুলো সাধারণত রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং সিস্টেমে এবং অ্যাজমা চিকিৎসায় ইনহেলারে ব্যবহৃত হয়। তবে আশার কথা হলো, গ্রিন হাউস গ্যাস হিসেবে চিহ্নিত এইচএফসির বিকল্প প্রযুক্তি দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে।

মন্ট্রিল প্রটোকল ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। কিগালি সংশোধনী বাস্তবায়িত হলে এ শতাব্দীর শেষে ০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এড়ানো সম্ভব হবে, যা প্যারিস চুক্তিতে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের অধিক তাপমাত্রা না বাড়ানোর যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা বাস্তবায়নে অনেকাংশে সহায়ক হবে মর্মে ধারণা করা হয়। কিগালি সংশোধনী সফলতার সাথে কার্যকর হলে ২০৫০ সালের মধ্যে ৭০ বিলিয়ন টন কার্বন

ডাই-অক্সাইডের সমপরিমাণ এইচএফসি নিঃসরণ হ্রাস সম্ভব হবে। বর্তমান সময়ে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী রাসায়নিক দ্রব্যসমূহের পরিবর্তে এমন সব বিকল্প বিবেচনা করা হচ্ছে, যা ওজোনস্তর ক্ষয় করবে না, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হ্রাস করবে এবং বিদ্যুৎসাশ্রয়ী হবে।

বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট মন্ট্রিল প্রটোকল অনুস্বাক্ষর করে এবং পরবর্তীকালে লন্ডন, কোপেনহেগেন, মন্ট্রিল ও বেইজিং সংশোধনীসমূহ অনুস্বাক্ষর করে। সরকার ২০২০ সালের ৮ জুন কিগালি সংশোধনী অনুস্বাক্ষর করেছে। ১৯৯৩ সালে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ওপর পরিচালিত জরিপের ভিত্তিতে ১৯৯৪ সালে কান্ট্রি প্রগ্রাম প্রণয়ন করা হয় এবং ২০০৫ সালে উক্ত কান্ট্রি প্রগ্রাম হালনাগাদ করা হয়। মন্ট্রিল সংশোধনী অনুযায়ী, ২০০৯ ও ২০১০ সালে এইচসিএফসির গড় ব্যবহার ভিত্তি নির্ধারণ করা হয়। প্রটোকল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০০৪ সালে 'ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪' জারি করা হয় এবং সেপ্টেম্বর ২০১৪ সময়ে বিধিমালাটি সংশোধিত হয়। ফলে বিধিমালায় এইচসিএফসির আমদানি, রপ্তানি ও ব্যবহারের বিষয়টি পুনর্নির্ধারিত হয় এবং ঔষধশিল্পে সিএফসির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। ১ জানুয়ারি ২০১০ হতে সিএফসি, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ও মিথাইল ক্লোরোফরম ব্যবহার পর্যায়ক্রমে রোধ (Phase-out) করা হয়। এ ছাড়া ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর ঔষধশিল্প হতে সিএফসি এবং রেফ্রিজারেটর উৎপাদনে ফোম তৈরিতে বোয়িং এজেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত এইচসিএফসি-১৪১বি-এর ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করা হয়। তা ছাড়া ২০২১ সালে সরকার কিগালি সংশোধনীতে নিয়ন্ত্রণযোগ্য এইচএফসি আমদানি ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে একটি এসআরো জারি করেছে।

সরকার বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে সর্বপ্রথম এসিআই লি, উৎপাদিত অ্যারোসল (কীটনাশক) হতে সিএফসির ব্যবহার রোধ করার লক্ষ্যে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। এতে বাংলাদেশে সিএফসির ব্যবহার প্রায় ৫০ শতাংশ হ্রাস পায়। পরবর্তী সময়ে ২০০৭ সালে বাংলাদেশের তিনটি ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান যথা–বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস ও একমি ল্যাবরেটরিজকে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত মিটার্ড ডোজ ইনহেলারে সিএফসির পরিবর্তে এইচএফসি ব্যবহার প্রক্রিয়ায় আর্থিক ও

প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান করে। বেক্সিমকো ও স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের উৎপাদিত ইনহেলার US FDA কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। উৎপাদিত ইনহেলার ইউএসএ, অস্ট্রেলিয়াসহ অন্যান্য দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

২০১১ সালে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক এইচসিএফসি ফেজ আউট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (স্টেজ-১) গ্রহণ করে, যা ২০১৯ সালে সমাপ্ত হয়েছে। ২০১৮ সালে মন্ট্রিল প্রটোকল মাল্টিলেটারেল ফান্ডের ৮১তম নির্বাহী কমিটির সভায় এইচপিএমপি স্টেজ-২ অনুমোদিত হয়। এর আওতায় বাংলাদেশে সুপরিচিত পাঁচটি এয়ারকন্ডিশনার উৎপাদন কোম্পানি ও একটি চিলার উৎপাদন কোম্পানিকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশে পরিবেশবান্ধব ও শক্তি সাশ্রয়ী এসি উৎপাদন করা যাবে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। এ ছাড়া সরকারের বিভিন্ন নীতি গ্রহণ ও টেকনিশিয়ানদের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ নানা বিষয়ক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করেছে। ফলে ২০২৫ সালে এইচসিএফসির ব্যবহার ৬৭.৫ শতাংশ কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। এইচপিএমপি স্টেজ-২ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রায় ১.৭ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই-অক্সাইড সমতুল্য গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ এড়ানো সম্ভব হবে।

সরকার মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে শুধু রেফ্রিজারেশন এবং এয়ারকন্ডিশনিং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকেই সহায়তা প্রদান করেনি বরং ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের প্রান্তিক ব্যবহারকারী তথা রেফ্রিজারেশন সেক্টরে নিয়োজিত টেকনিশিয়ানদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও যন্ত্রপাতি বিতরণ করে আসছে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক এ পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে প্রায় ১০ হাজার টেকনিশিয়ানকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ওডিএস চোরাচালান রোধে কাস্টমস কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা ও ODS Identifier প্রদান করা হয়েছে।

সরকার এইচএফসি ব্যবহার রোধকল্পে মন্ট্রিল প্রটোকলের কিগালি সংশোধনী বাস্তবায়ন শুরু করেছে। ইতোমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সহায়তায় ইউএনডিপির মাধ্যমে একটি ডেমনেস্ট্রেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরবর্তী সময়ে মন্ট্রিল প্রটোকল মাল্টিলেটারেল ফান্ডের সহায়তায় ওয়ালটনের রেফ্রিজারেটর উৎপাদনে এইচএফসির ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে রোধ করে। এতে পরিবেশসম্মত রেফ্রিজারেন্ট ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনপ্রক্রিয়া রূপান্তর করা হয়। একই সাথে এইচএফসিভিত্তিক কম্প্রেসর

উৎপাদনপ্রক্রিয়াও পরিবেশবান্ধব ও বিদ্যুৎসাশ্রয়ী করা হয়েছে। বিদ্যুৎসাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে ওয়ালটন কর্তৃক উৎপাদিত কম্প্রেসর বর্তমানে ইউরোপের বাজারে রপ্তানি করা হচ্ছে, যা আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিংয়ে সহায়তা করছে। ২০১৯ সালে প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ায় রেফ্রিজারেটর উৎপাদনে বছরে প্রায় ০.৩ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই-অক্সাইড সমতুল্য গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এই প্রটোকল বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিবেশ অধিদপ্তর ১৯৯৬ সাল থেকে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার হ্রাসে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এযাবৎ প্রায় ৯৩ শতাংশ ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার হ্রাস করেছে। স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি দ্বারা ২০১২ ও ২০১৭ সালে বিশেষভাবে প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়েছে। তা ছাড়া ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের চোরাচালান রোধে কার্যকর ভূমিকার জন্য ২০১৯ সালে পরিবেশ অধিদপ্তর জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি দ্বারা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের আরাম-আয়েশ, খাদ্য নিরাপত্তা ও বর্তমান করোনা মহামারি মোকাবিলায় টিকা সংরক্ষণ ও সরবরাহের পরিবেশবান্ধব সমাধান দেওয়া সম্ভবপর হচ্ছে। মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের ফলে ধীরে ধীরে সূর্যালোক পৃথিবীর প্রাণিকুলের জন্য নিরাপদ হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের অভিমত, এই ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে ওজোনস্তর তার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে।

লেখক : পরিবেশ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক ও বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম

আগামীর বাংলাদেশে প্রবীণরা থাকবেন নিরাপদে

মাসুমুর রহমান

জাতিসংঘের উদ্যোগে সকল মানুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে একটি সুন্দর বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে ২০১৫ সালে ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা গৃহীত হয়েছে। বিশ্বের প্রতিটি দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এসডিজির সফল বাস্তবায়নের ওপর। এসডিজির ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ৩ নম্বর ক্রমিকে আছে 'সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ'। এই অভীষ্টের মোট ০৯টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। 'সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ' অভীষ্টের ০৯টি লক্ষ্যমাত্রা (৮ নম্বর লক্ষ্যমাত্রা ব্যতীত, ৯ লক্ষ্যমাত্রায় দুটি) বাস্তবায়নে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সহযোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এসডিজি বাস্তবায়নে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মূল দায়িত্ব একটি (১৬.১০), সহযোগী হিসেবে ৩০টি। এ ছাড়া তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন তথ্য অধিদফতরের সহযোগী হিসেবে ০৭টি দায়িত্ব রয়েছে। 'সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ' লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন তথ্য অধিদফতর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরসহ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার বছরভিত্তিক সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে।

বিবিএসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১ জানুয়ারি ২০২১ সালে দেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ১৬ কোটি ৮২ লাখ। এর মধ্যে পুরুষ ৮ কোটি ৪১ লাখ ৯০ হাজার, মহিলা ৮ কোটি ৪০ লাখ ৩০ হাজার। বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ৭২ বছর ৮ মাস। পুরুষের গড় আয়ু ৭১ বছর ২ মাস, মহিলাদের গড় আয়ু পুরুষদের থেকে বেশি, ৭৪ বছর ৫ মাস। জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ১.৩ জন। শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ২১ জন। বাংলাদেশে ১৯৯২ সালে পাঁচ বছরের কম বয়সি প্রতি হাজার শিশুর মধ্যে মৃত্যু হতো ১২১ জনের। সরকারের নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ২০১৯ সালে এ সংখ্যা ৪০-এ নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ ২৭ বছরে শিশুমৃত্যুর হার প্রায় ৬৭ শতাংশ কমেছে। মাতৃমৃত্যুর হার ১.৬৩ জন।

জনসংখ্যা আমাদের জন্য সম্পদ। এর কারণ হলো, এই মুহূর্তে এ জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ কর্মক্ষম মানুষ। এরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। আমাদের গড় আয়ু দিন দিন বাড়ছে। এটা একটা বড়ো অর্জন;

কিন্তু শিগগিরই এ সংখ্যা পরিবর্তন হবে। নির্ভরশীল মানুষের অনুপাত এখন কমছে; কিন্তু খুব দ্রুতই তা বাড়বে। জনমিতিক সুবিধা বারবার আসে না। তাই এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের দেশে ৬৫ বছরের বেশি বয়সের মানুষকে প্রবীণ নাগরিক বা সিনিয়র সিটিজেন হিসেবে ধরা হয়। দেশে এ বয়সের মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৭ শতাংশ বা তার বেশি হলে তাকে বয়োবৃদ্ধ সমাজ বলে। এ সংখ্যা ১৪ বা তার বেশি হলে তাকে প্রবীণ সমাজ বলে। বাংলাদেশ ২০২৯ সালে বয়োবৃদ্ধ সমাজ এবং ২০৪৭-এ প্রবীণ সমাজ হবে। এ পরিবর্তনে বাংলাদেশ সময় নেবে মাত্র ১৮ বছর।

জাপানের ক্ষেত্রে সময় লেগেছে ২৪ বছর। আমাদের পরিবর্তন জাপানের থেকেও দ্রুত হবে। নগরায়ণের ফলে গ্রামীণ মানুষের সংখ্যা দিন দিন কমছে। বাড়ছে নগরের পরিধি, ও মানুষ। নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধিসহ চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি ও সহজলভ্য হওয়ায় গড় আয়ু বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশে প্রবীণ মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে। আবার আমাদের জন্ম ও মৃত্যুর হার কমছে। ফলে আগামী বছরগুলোতে বয়স্কদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা দিন দিন কমবে। প্রবীণদের দেখাশোনা ও তাদের চাহিদা পূরণের সমস্যা দেখা দেবে। গবেষণায় দেখা গেছে, ২০২০ সালে একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে দেখাশোনার জন্য ১৩ জন কর্মক্ষম মানুষ ছিল। ২০৪০ সালে ছয়জন কর্মক্ষম ব্যক্তি একজন প্রবীণকে দেখাশোনা বা সেবা-যত্ন করবে। ২০৬০ সালে এ সংখ্যা কমে দাঁড়াবে তিনজনে, অর্থাৎ একজন প্রবীণ ব্যক্তিকে সেবা-যত্ন করার জন্য তিনজন ব্যক্তির বেশি পাওয়া যাবে না। চিকিৎসাসেবার প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন হবে। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষায়িত চিকিৎসার প্রয়োজন হবে। শুধু চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করলেই হবে না, তাদের খাদ্য, বস্ত্রসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় চাহিদা ও ভিন্ন হবে। সেগুলো পূরণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের এবং দক্ষ জনবলের প্রয়োজন হবে। অতিরিক্ত সময় ও অর্থের দরকার হবে। তাদের সুরক্ষা ও কল্যাণের বিষয় গুরুত্ব দিতে হবে।

বাংলাদেশে তরুণের সংখ্যা চার কোটি ৭৬ লাখ, যা মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ। বর্তমান শিশু ও তরুণদের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। এ জন্য তাদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন শিশুদের জন্য বর্ধিত বিনিয়োগ, বিশেষত স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, স্যানিটেশন, সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া। টেকসই উন্নয়নের জন্য শিশু ও কিশোরদের জন্য

বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব খুব বেশি দূরে নয়। এ বিপ্লবের প্রভাবে আগামীর কর্মক্ষেত্র হবে অটোমেশন ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তিনির্ভর। সনাতনী প্রতিষ্ঠান দিন দিন হ্রাস পাবে, তার জায়গায় প্রযুক্তিনির্ভর নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। শ্রমবাজারের চাহিদার পরিবর্তন হবে। সোশ্যাল ইমোশনাল স্কিলস ও অভিযোজন দক্ষতার চাহিদা বাড়বে। সে জন্য সফট স্কিলস প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো দ্রুততা। এর প্রভাব পূর্বের শিল্পবিপ্লবের চেয়ে গতিশীল হবে। তাই বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের শিশু-কিশোরদের পাঠ্যসূচি, শিক্ষা ও শিক্ষণ পরিকল্পনায় পরিবর্তন করতে হবে। করোনা অতিমারির কালে আমাদের শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তিনির্ভর অনলাইন ক্লাসে ইতোমধ্যে অভ্যস্ত হয়েছে। আগামী দিনে বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতার চাহিদা বাড়বে। যার মাথায় যত সমস্যার সমাধান, তার তত চাহিদা বাড়বে।

বাংলাদেশের শ্রমবাজারে পুরুষের অংশগ্রহণ প্রায় ৮৫ শতাংশ, আর মহিলাদের অংশগ্রহণ প্রায় ৩৬ শতাংশ। সব মিলিয়ে বাংলাদেশে কর্মক্ষম জনবলের ৬০ শতাংশ শ্রমবাজারে কাজ করছে। এখনো ৪০ শতাংশকে শ্রমবাজারে আনা সম্ভব হয়নি। তাদেরও শ্রমবাজারে আনতে হবে। ভবিষ্যতে আমাদের সামাজিক খাতে অনেক ব্যয় করতে হবে। প্রবীণদের দেখাশোনার জন্য বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু করতে হবে। এ জন্য অনেক কিছু করণীয় আছে। সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী এক বছরের নিচে ও ৬৫ বছরের ওপর সকলকে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। সকলের জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টিসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামীর বাংলাদেশ হবে একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র, যেখানে প্রবীণরা থাকবেন সম্মানের সাথে নিরাপদ ও আনন্দে।

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা

বাংলাদেশ ও একজন শেখ হাসিনা

মোতাহার হোসেন

বাংলাদেশের মানুষ এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বৈশ্বিক উন্নয়নের মহাসড়কে অবস্থান করছে। এটা একজন নাগরিক হিসেবে যেমনি আমাদের জন্য গর্বের, তেমনি অহংকারেরও। শেখ হাসিনার নিরন্তর প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানবিক সকল সূচকে ঈর্ষণীয় সফলতা অর্জিত হয়েছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত ১২ বছর দেশ পরিচালনায় এই অর্জন সম্ভব হয়েছে বলে বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগীসহ বিশ্বের প্রভাবশালী দেশসমূহের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের বক্তব্য, বিবৃতি, রিপোর্টে এ তথ্য উঠে এসেছে। তথ্যে আরো উঠে এসেছে, দেশের উন্নয়ন, অর্জন, জিডিপির প্রবৃদ্ধি, মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস, নারী শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, বাল্যবিয়ে কমিয়ে আনা, স্কুলে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার হ্রাস, বৈশ্বিক মহামারি করোনা নিয়ন্ত্রণ এবং করোনার মধ্যেও জীবন ও জীবিকার চাকা সচল রেখে অর্থনীতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও পাকিস্তানকেও পেছনে ফেলেছে বাংলাদেশ।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, বিশ্বব্যাংক, জাতিসংঘ, ইউনিসেফসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের প্রদত্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকে অনেক এগিয়েছে বাংলাদেশ। এ ক্ষেত্রে যে দেশটির কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল সেই পাকিস্তান এবং প্রতিবেশী দেশ ভারতকে পেছনে ফেলে এগোচ্ছে বাংলাদেশ। মাথাপিছু আয়, জিডিপি প্রবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সূচক, বিশ্বশান্তি সূচক, গড় আয়ু, শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসসহ এ রকম অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকে দেশ দুটির চেয়ে বাংলাদেশ এখন সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। একই সঙ্গে চলমান মহামারি করোনা সহনশীলতা সূচকেও ভারত পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ। অর্থনীতিবিদদের ভাষ্য হচ্ছে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনেক সূচকে ভারত এবং পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে যাওয়া স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড়ো অর্জন।

আইএমএফ পূর্বাভাস দিয়েছে, মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) ভারতকে পেছনে ফেলেছে বাংলাদেশ। তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি হবে দুই হাজার ২২৭ ডলার। একই সময়ে ভারতের মাথাপিছু

জিডিপি দুই হাজার ১১৬.৪৪ ডলার। এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানও পিছিয়ে আছে। চলতি বছর পাকিস্তানের মাথাপিছু জিডিপি হবে এক হাজার ৫৪৩ ডলার। এর আগেও বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কখনো অর্থনৈতক সূচক, কখনো সামাজিক বিভিন্ন সূচক প্রকাশ করে। তাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, অর্থনীতির অনেক সূচকে ভারত ও পাকিস্তানের চেয়েও এগিয়ে বাংলাদেশ। দেশের রফতানির পরিমাণ পাকিস্তানের দ্বিগুণ এবং বাংলাদেশি টাকার ক্ষেত্রে এর মূল্য পাকিস্তানের রুপির চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার পাকিস্তানের ৩.৫ শতাংশ, যেখানে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৫.৪৭ শতাংশ। পাকিস্তানকে পেছনে ফেলে জিডিপির আকারের ভিত্তিতে বৃহৎ অর্থনীতির দেশের তালিকায় ৪১তম অবস্থানে উঠেছে বাংলাদেশ। পাকিস্তানের অবস্থান ৪৪তম। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পাকিস্তানের ২০ বিলিয়ন ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশের প্রায় ৪৮.০৪ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশের রফতানি আয় ৪৩ বিলিয়ন ডলারের, পাকিস্তানের সেখানে ২৩ বিলিয়ন ডলার। পাসপোর্ট সূচক, সাক্ষরতার হার, ক্ষুদ্রঋণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ। তবে পাকিস্তানের ২২ কোটির তুলনায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৪০ লাখ। অথচ ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল সাত কোটি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ছয় কোটি।

বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ৭২.৮ বছর আর পাকিস্তানে ৬৭ বছর। পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুমৃত্যুর হার বাংলাদেশে হাজারে ২১ জন, অন্যদিকে পাকিস্তানে হাজারে ৫৯ জন। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাপর্ব শেষ করছে ৯৮ শতাংশ শিশু, পাকিস্তানে ৭২ শতাংশ। জেন্ডার প্যারিটি ইনডেক্সে ১৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ যেখানে ৫০তম, সেখানে পাকিস্তান রয়েছে ১৫১তম অবস্থানে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের হার ৩৮ শতাংশ, যা পাকিস্তানে ২৩ শতাংশ। একইভাবে ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচক বিশ্লেষণে দেখা যায়, মহামারি করোনার কারণে বিশ্বের সব দেশেরই জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার কমেছে। করোনার পূর্বে স্বাভাবিক সময়ের প্রবৃদ্ধি বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ সময় ভারতের জিডিপি প্রবৃদ্ধি যেখানে শতকরা ৫ শতাংশ, বাংলাদেশের সেখানে ৮ শতাংশ। বাংলাদেশের পুরুষ ও নারীদের গড় আয়ু যথাক্রমে ৭১ ও ৭৪ বছর, ভারতে যথাক্রমে ৬৭ ও ৭০ বছর। ভারতে নবজাতকের মৃত্যুর হার

হাজারে ২২.৭৩, বাংলাদেশে সে হার ১৭.১২। ভারতে শিশুমৃত্যুর হার ২৯.৯৪, বাংলাদেশে ২৫.১৪। পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুমৃত্যুর হার বাংলাদেশে ৩০.১৬ শতাংশ, যা ভারতে ৩৮.৬৯ শতাংশ। বাংলাদেশে ১৫ বছরের বেশি বয়সি ৭১ শতাংশ নারী সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, ভারতে এই হার ৬৬ শতাংশ। বাংলাদেশে ৩০ শতাংশের বেশি নারী শ্রমে নিয়োজিত; ভারতে এই হার মাত্র ২৩ শতাংশ। ছেলেমেয়েদেরে উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ভারতে ০.১৯ শতাংশ, সেখানে বাংলাদেশ ১.১৪ শতাংশ হারে এগিয়ে আছে।

বায়ুদূষণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা ভারতে। শীতের মৌসুমে দেশটির রাজধানীসহ বেশ কয়েকটি শহর ধোঁয়াশায় ঢেকে যায়। দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ। এই ক্ষেত্রে পাকিস্তানের অবস্থা বাকি দুই দেশের চেয়ে ভালো। বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ বেশিসংখ্যক মানুষকে বিদ্যুতের আওতায় আনার ক্ষেত্রেও এগিয়ে। অন্যদিকে ওয়াশিংটনভিত্তিক কনজারভেটিভ থিংক ট্যাংক দ্য হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালে ৫৬.৫ স্কোর করে বাংলাদেশের অবস্থান ১২০তম। অন্যদিকে ভারত ও পাকিস্তানের অবস্থান যথাক্রমে ১২১ ও ১৫২তম। এখানেও বাংলাদেশ এগিয়ে।

করোনা মহামারি মোকাবিলায়ও দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গের কোভিড রেজিলিয়েন্স বা কোভিড সহনশীলতা সূচকে চলতি মাসে পাঁচ ধাপ এগিয়ে বিশ্বের ৫৩টি দেশের মধ্যে ৩৯তম অবস্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি প্রকাশিত ব্লুমবার্গের সূচক অনুযায়ী, করোনাভাইরাস মহামারি মোকাবিলায় মোট ১০০ স্কোরের মধ্যে বাংলাদেশ পেয়েছে ৫৯.৬। যেখানে প্রতিবেশী ভারতের এই স্কোর ৫৬.২ এবং পাকিস্তানের ৫৬.১।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমেদ সম্প্রতি গণমাধ্যমকে বলেছেন, বাংলাদেশের অভূতপূর্ব ও ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে স্বাধীনতা অর্জন করায়। তাঁর মতে, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সাহসী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। একই সঙ্গে সামাজিক, মানবিক, অর্থনৈতিক সকল সূচকে ভারত, পাকিস্তানসহ এশিয়ার অনেক দেশকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। তিনি বলেন, উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতে হলে বর্তমানের মতো ভবিষ্যতেও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অপরিহার্য।

লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরাম

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল

নাসরীন মুস্তাফা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের বড়ো ছেলে শেখ কামাল। ১৯৪৯ সালের ৫ আগস্ট তারিখে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কামাল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে স্বাধীনতাবিরোধী শত্রুর কাপুরুষোচিত হামলায় ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে প্রথম শহিদ হন তিনি। আজ তাঁর ৭৩তম জন্মদিনে গভীর বেদনার সাথে স্মরণ করছি মাত্র ছাব্বিশ বছরে থমকে যাওয়া এক চিরতরুণের অনন্য অসাধারণ জীবনকে। আজকের তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহিত করার জন্য এই তরুণের জীবনের নানা দিক সামনে নিয়ে আসা খুব জরুরি। কেননা বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশ বলেই এই সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য চাই সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ, যার নাম দেশপ্রেমিক-মানবিক-মেধাসম্পন্ন-আত্মমর্যাদাশীল জনগোষ্ঠী।

১৯৭২ সালের ৪ জুলাই কুমিল্লায় এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে জাতির পিতা বলেছিলেন, 'সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ পয়দা করতে হবে।' যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তোলার পাশাপাশি সোনার মানুষ তৈরির কাজ তিনি শুরু করেছিলেন। তাঁর সন্তান হিসেবে কেবল নয়, মানসিক উত্তরাধিকারী হিসেবে শেখ কামাল এগিয়ে এসেছিলেন সোনার মানুষ গড়ে তোলার নতুন সেই লড়াইয়ে। মাত্র ২৬ বছরে তাঁকে থামিয়ে না দিলে এই কাজ কতটুকু এগিয়ে যেতে পারত, তা ভাবলেই হাহাকার জমা হয় মনে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে সরিয়ে এনে বাংলাদেশকে দুর্নীতি, মুনাফালোভী সমাজ উপহার দিয়েছিল সুবিধাভোগী সরকারগুলো। এর ফলে বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে দেশ ও দেশের মানুষের স্বার্থকে এক নিমেষে জলাঞ্জলি দিতে পারা ভয়ংকর দুর্নীতিবাজ, টাকা পাচারকারী অংশ। এরা হতাশা ছড়ায়, ছড়িয়েছে এতকাল। দেশের টাকা বিদেশে পাচার করেছে, নিজেদের ঠিকানা বিদেশেই ঠিক করেছে। দেশকে ব্যবহার করেছে মাত্র। এ রকম প্রেক্ষাপটে সোনার মানুষ হয়ে ওঠার চেষ্টায় একালের তারুণ্য যখন করোনা মহামারির মতো যেকোনো বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ছে মানুষের জন্য, শেখ কামাল নামের আলোকিত শুভ্রতা এই প্রজন্মকে সাহস জোগায়। তিনি তো এদের মতোই জাগ্রত ছিলেন। ছিলেন আপাদমস্তক খাঁটি দেশপ্রেমিক।

২৫ মার্চের কালরাতে গণহত্যা শুরু করার পাশাপাশি তীব্র প্রতিহিংসাপরায়ণ পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর থেকে গ্রেফতার করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গ্রেফতার হওয়ার আগেই ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু। বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সর্বাত্মক যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সবাইকে বন্দি করে রাখা হয় ধানমণ্ডির ১৮ নম্বরের বাড়িতে। কঠোর নজরদারি এড়িয়ে কৌশলে পালিয়ে যাওয়া শেখ কামালকে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী থানার চাপতা বাজার থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ভারতে গিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে শেখ কামাল 'বাংলাদেশ ফার্স্ট ওয়্যার কোর্স'-এর কমিশন পান। ছিলেন প্রধান সেনাপতি মুহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানীর এইড ডি ক্যাম্প (এডিসি)।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পদক, ভারতের পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা বীরপ্রতীক লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহিরের সাথে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় সহজ শেখ কামালের অনন্য পরিচয়ের খোঁজ পেয়েছিলাম। ১৯৭১ সালে মুজিবনগরে শেখ কামালের সাথে দেখা হলে নিজের পোশাক থেকে ফতুয়া আর লুঙ্গি এনে বলেছিলেন, জহির ভাই! পরে নিন। নিজের খাবার থেকে আরেক থালায় ভাত-ডাল-সবজি দিয়ে খেতে দিয়েছিলেন। ঘুমানোর জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন নিজের বিছানা। এতে বিব্রত হয়েছিলেন শেখ কামালের জহির ভাই। বঙ্গবন্ধুপুত্র কেন বিছানায় শোবেন না! শেখ কামাল মৃদু হেসে বলেছিলেন, আমি আপনার মাথার ওপরে থাকব। বিছানার পাশে থাকা টেবিলের ওপর ঘুমিয়েছিলেন তিনি।

শেখ কামালের স্পষ্ট বক্তব্য ছিল, বীর মুক্তিযোদ্ধার পাশে থাকতে চান তিনি। কেননা বীর মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে জীবন বাজি রেখে ছুটে এসেছেন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য। অসম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করছেন। প্রাণ দিচ্ছেন। শেখ কামাল এর পরও আন্তরিকতার সাথে মনে করিয়ে দেন, জহির ভাই! সাবধানে লড়বেন। বেঁচে থাকতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয় হলো বীর মুক্তিযোদ্ধাদের। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফিরে এসেছেন প্রিয় মাতৃভূমিতে। ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে কাজী সাজ্জাদ আলী জহির গিয়েছিলেন ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে। শেখ কামাল বাইরে ছিলেন। ফিরে এসে দেখলেন জহির ভাইকে। বঙ্গবন্ধুকে মজা করে বলেছিলেন, আমি কিন্তু জহির ভাইয়ের মাথার ওপরে ছিলাম!

বন্ধুবৎসল শেখ কামাল এভাবেই আপন করে নিতেন সবাইকে, আপন হয়ে

উঠতেন সবার। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের একজন সদস্য হিসেবে ছাত্ররাজনীতিতে ভূমিকা রাখছিলেন শেখ কামাল। তরুণদের রাজনীতি সচেতনতার পাশাপাশি খেলার মাঠে, নাটক-সংগীতসহ সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে ক্ষান্ত থাকেননি তিনি, সুযোগ্য নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি নিজেও সম্পৃক্ত ছিলেন এসবে। '৬৬-তে বঙ্গবন্ধু ছয় দফা ঘোষণার পর বাংলার রাজনৈতিক পরিবেশে দানা বাঁধে বাঙালির ঐক্য। '৬৮-তে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দিয়ে তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহী বানিয়ে ফাঁসি দিতে চেয়েছিল পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের পথ বেয়ে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করে এনে '৭০-এর নির্বাচনে একচেটিয়া জয় লাভ করলেও পাকিস্তানের কূটকৌশলে ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে টালবাহানায় গণমানুষের মতোই শেখ কামালও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ থেকে নির্দেশনা নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার 'যার যা কিছু আছে, তা নিয়ে প্রস্তুত' থাকার নির্দেশ মেনে শেখ কামাল আবাহনী ক্রীড়াচক্রের খেলার মাঠে এলাকার প্রায় ৫০ জন তরুণকে অস্ত্র পরিচালনার ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন শওকত আলী দিয়েছিলেন ট্রেনিং। বাঙালি তরুণরা মুখে কাপড় বেঁধে অবাঙালি বাড়িগুলোতে গিয়ে হুমকিধমকি দিয়ে ৮০টির মতো অস্ত্র জোগাড় করেছিলেন। জাতির পিতা স্বাধীনতা ঘোষণার পর এই অস্ত্রগুলো নিয়ে যুদ্ধে যায় তরুণের দল। শেখ কামালও গেলেন। মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর তিনি তাঁর কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। বাংলাদেশের মঞ্চ নাটকের অন্যতম প্রধান দল ঢাকা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন শেখ কামাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার সলিমুল্লাহ্ হলের বার্ষিক নাটকে নিয়মিত অভিনয় করতেন তিনি। '৭২ সালে ডাকসুর নাটকের দলের অংশ হয়ে অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে শহিদ বুদ্ধিজীবী মুনীর চৌধুরীর অনুবাদে জর্জ বার্নার্ড শর লেখা নাটক 'কেউ কিছু বলতে পারে না' মঞ্চস্থ হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শেখ কামাল। তাঁর বিপরীতে ছিলেন ফেরদৌসী মজুমদার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট দলের সহ-অধিনায়ক ছিলেন শেখ কামাল। ১৯৭৪-'৭৫ মৌসুমে খেলেছেন জাতীয় ক্রিকেট লীগ। ভলিবল-হকি-ব্যাডমিন্টনেও তাঁর কৃতিত্ব ছিল ঈর্ষণীয়। অ্যাথলেট হিসেবেও কম যাননি, ১৯৭৫ সালে স্যার সলিমুল্লাহ্ হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার স্প্রিন্টে সেরা হয়েছিলেন। ক্রীড়াপাগল মানুষটি খেলাকে ব্যবহার করতে

চেয়েছিলেন পারস্পরিক যোগাযোগ-সম্প্রীতি গড়ে তোলার কাজে। আবাহনী ক্রীড়াচক্রের ব্যয় নির্বাহের পাশাপাশি মানুষকে নির্মল বিনোদন দিতে তিনি সার্কাস দল গড়ে তুলেছিলেন।

কামালের প্রচলিত লোকগীতি-রবীন্দ্র-নজরুল-আধুনিক গানের সাথে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন তরুণ প্রজন্মের জন্য একদম তাজা স্বাদের পপ ঘরানার সংগীত। ছিলেন সে সময়ের জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক সংগঠন স্পন্দন শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা।

রাষ্ট্রের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তির পুত্র, কী দরকার ছিল তাঁর ছায়ানটে সেতার শেখার? নাটকের অভিনয় করার? গান গাওয়ার? ব্যাডমিন্টন খেলতেন, ওটুকু হলেই হয়তো হতো। তিনি কিন্তু ক্রীড়া সংগঠক হলেন। হকি, বাস্কেটবল, ফুটবলের মতোই ক্রিকেট খেলাকে জনপ্রিয় করতে চাইলেন। ফুটবলার সালাউদ্দিন খেলতেন মোহামেডানে, তাঁকে নিয়ে এলেন নিজের প্রতিষ্ঠিত ক্লাব আবাহনী ক্রীড়াচক্রে। বড়ো বোন শেখ হাসিনা ১৯৭৫-এর ৩১ জুলাই গেলেন জার্মানিতে। বিদেশ থেকে কী আনবেন, ছোটো ভাইকে এই প্রশ্ন করলে বড়ো বোনের কাছে ছোটো ভাই কামালের আবদার ছিল, খেলোয়াড়দের জন্য অ্যাডিডাসের বুট জুতা নিয়ে আসতে। নিজেও যখন বিদেশে গেছেন, খেলোয়াড়দের জন্য ক্রীড়াসামগ্রী খুঁজেছেন। ক্লাবে এনেছেন বিদেশি কোচ, যা সেই সময়কার বাংলাদেশে প্রথম। কলকাতায় খেলতে গেছে আবাহনী ফুটবল দল, সবার গায়ে জার্সি, যা যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের খেলোয়াড়দের অসহায়ত্ব ছাপিয়ে উন্নত রুচির পরিচয় দেয়। মুক্তিযুদ্ধে অনন্য অবদান রেখেছেন, অথচ মুক্তিযোদ্ধা সনদ নেননি। চাইলেই উপভোগ করতে পারতেন সেনাবাহিনীর নিশ্চিত জীবন। তিনি বরং দেশ গড়ে তোলার সংকল্পে সেনাবাহিনী ছেড়ে নেমে এলেন সাধারণ মানুষের কাতারে, ফিরে গেলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র হিসেবে। ভালো ছাত্র ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর ছেলে, উপরন্তু ভালো ছাত্র হিসেবে চমৎকার পেশাগত জীবনও বেছে নিতে পারতেন তিনি। অনেকের মতো উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে চলে যেতে পারতেন। তিনি এসব কিছুই করেননি। দেশ গড়ার দায়বদ্ধতা থেকে যেখানেই ঘাটতি দেখেছেন, ছুটে গেছেন পূরণ করতে, যেমন–১৯৭৪ সালের বন্যার সময় রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীদের নিয়ে বন্যার্তদের সাহায্যে ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচিতে তিনি ছিলেন অগ্রগামী কর্মী।

পিতা বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক নানা ক্ষত সারিয়ে সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছেন। সোনার বাংলা গড়তে যে সোনার মানুষ দরকার, পুত্র শেখ কামাল শুরু করেছিলেন সেই সোনার মানুষ গড়ার কাজ। স্বাধীনতাবিরোধী বেঈমান শক্তি বঙ্গবন্ধুকে ক্রমাগত আঘাত করেছে, ১৫ আগস্টের কালরাতের পটভূমি তৈরির জঘন্য চেষ্টা চালিয়েছে। শেখ কামালের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র ছিল এই নীলনকশার অংশ। কাপুরুষোচিত হামলার সেই রাতে জাতির পিতাকে রক্ষার জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল। প্রথম শহিদ তো তিনিই। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের যোগ্য সন্তান, দেশমাতৃকার সাহসী সন্তানকে আমরা চিরতরে হারিয়ে ফেলেছি, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, ততই উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছেন তিনি দেশপ্রেমের শক্তিতে। আমরা বুঝতে পারছি, বাংলাদেশকে স্বর্ণালি ভবিষ্যতের শিখরে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতেন এই স্বপ্নবাজ তরুণ। বড়ো বোন শেখ হাসিনাও যখন বাংলাদেশকে নিয়ে তাঁর সোনালি স্বপ্নের কথা বলেন, পিতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সাথে সাথে ভাই শেখ কামালের অসমাপ্ত স্বপ্ন প্রেরণা জোগায় নিশ্চয়ই। ক্রীড়াপ্রেমী, সংস্কৃতিবান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্য দিয়ে ডানা মেলছে শেখ কামালের স্বপ্ন। এই স্বপ্নের সাফল্য যত অর্জিত হচ্ছে, ততই মহিমান্বিত হচ্ছেন শেখ কামাল।

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মদিনে জানাই অন্তরের অন্তস্তল থেকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন।

লেখক : উপপ্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ

মীর মোহাম্মদ আসলাম উদ্দিন

অর্থনীতি এবং আধুনিক সভ্যতার মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে জ্বালানি। তাই দেশের অর্থনীতির ভিতকে মজবুত করে সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট তৎকালীন ব্রিটিশ তেল কোম্পানি শেল অয়েলের নিকট থেকে তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ–এই পাঁচটি গ্যাসক্ষেত্র নামমাত্র ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং মূল্যে ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় হস্তান্তরের কার্যক্রম সম্পন্ন করে। ৯ আগস্ট তাই বাংলাদেশের জ্বালানি খাতের জন্য একটি অবিস্মরণীয় দিন। জ্বালানি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, নতুন নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা, গবেষণা, গ্যাসসহ অন্যান্য প্রাথমিক জ্বালানির অনুসন্ধান, উত্তোলন বৃদ্ধিসহ জ্বালানি খাতে গতি আনার জন্য ২০১০ সাল থেকে ৯ আগস্ট 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, অকৃত্রিম দেশপ্রেম, চিন্তা-চেতনার দূরদর্শিতা ও জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে বিচক্ষণতার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে নামমাত্র মূল্যে গ্যাসক্ষেত্রগুলো ক্রয় করতে পেরেছিলেন। উল্লিখিত পাঁচটি গ্যাসক্ষেত্রের (Gas Initially in Place (GIIP) মজুদ ২০.৭৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুযায়ী সে সময় পাঁচটি গ্যাসক্ষেত্রের উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ছিল ১৫.৪৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট, যার বর্তমান সমন্বিত গড় বিক্রয়মূল্য প্রায় ৪৯.৮৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ৪৬ বছর পরও এই পাঁচটি গ্যাসক্ষেত্র মোট গ্যাস উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ জোগান দিচ্ছে। অর্থাৎ জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অতুলনীয় অবদান রেখে চলছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর জাতীয় অগ্রগতির লক্ষ্যে যে সকল অবিস্মরণীয় ও দূরদর্শী কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন তন্মধ্যে জাতীয় জ্বালানির নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিতকরণ ছিল অন্যতম। সদ্য স্বাধীন দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য একটি শক্তিশালী জ্বালানি অবকাঠামো গড়ে তোলার প্রত্যয়ে ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গৃহীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের

সংবিধানের ১৪৩ (১) ধারায় বাংলাদেশের যেকোনো ভূমির অন্তঃস্থ সকল খনিজ ও অন্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী; বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমার অন্তর্বর্তী মহাসাগরের অন্তঃস্থ কিংবা বাংলাদেশের মহিসোপানের উপরিস্থ মহাসাগরের অন্তঃস্থ সকল ভূমি, খনিজ ও অন্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী; এবং আইনসংগতভাবে প্রজাতন্ত্রের ওপর ন্যস্ত যেকোনো ভূমি বা সম্পত্তি প্রজাতন্ত্রের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ২৬ মার্চ, ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭-এর মাধ্যমে দেশের তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মিনারেল, অয়েল অ্যান্ড গ্যাস করপোরেশন (বিএমওজিসি) গঠন করা হয়। পরবর্তীতে সময়ে বাংলাদেশ মিনারেল, অয়েল অ্যান্ড গ্যাস করপোরেশনকে (বিএমওজিসি) বাংলাদেশ অয়েল অ্যান্ড গ্যাস করপোরেশন (বিওজিসি) নামে পুনর্গঠন করা হয় এবং ১৯৭৪ সালের ২২ আগস্ট রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫-এর মাধ্যমে বিওজিসিকে 'পেট্রোবাংলা' নামে সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয়।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জ্বালানি তেল একটি অপরিহার্য পণ্য। দেশের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার বিরাট একটি অংশ ব্যয় হয় জ্বালানি তেল আমদানি খাতে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে যে সকল দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তন্মধ্যে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ অ্যাবানড্যান্ড প্রপার্টি আদেশের (পিও নং ১৬, ১৯৭২) মাধ্যমে পাকিস্তান ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানি লি., দাউদ পেট্রোলিয়াম লিমিটেড, ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড, বার্মা ইস্টার্ন লি. ইত্যাদি অধিগ্রহণের মাধ্যমে জ্বালানি তেল খাতকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনা ছিল অন্যতম। ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ The ESSO Undertakings Acquisition Ordinance, ১৯৭৫-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc.-কে সরকারিভাবে গ্রহণ করে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে এবং সক্ষমতা অর্জনে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বাস করতেন, বঙ্গোপসাগর আমাদের জন্য একটি আশীর্বাদ। এ বিশ্বাস থেকেই ১৯৭৪ সালে পাস করিছিলেন 'The Territorial Waters and Maritime Zones Act, ১৯৭৪', যা এই অঞ্চলে সমুদ্রসংক্রান্ত প্রথম আইন। এর ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সমুদ্রে আমরা অর্জন করেছি এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকা। এখানকার সম্পদ সম্ভাবনার

অপার দ্বার উন্মোচন করবে। এ জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন 'ব্লু ইকোনমি সেল' গঠন করা হয়েছে। এই সেল সমুদ্রে গবেষণার পাশাপাশি অন্যান্য দপ্তর ও সংস্থার সাথে সমন্বয় করবে।

বঙ্গবন্ধুর জ্বালানি নীতি অনুসরণ করে বর্তমান সরকার দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নতুন নতুন জ্বালানির উৎস উদ্ভাবন, জ্বালানিসমৃদ্ধ দেশসহ আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সরকারের বিভিন্ন বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও কর্মকাণ্ডের ফলে দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সাথে জ্বালানির চাহিদাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকার দেশজ জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা আহরণ ও উৎপাদন এবং তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

বাপেক্স গ্যাস/তেল অনুসন্ধানও খনন কার্যক্রমের পাশাপাশি সালদা নদী, শাহবাজপুর, ফেঞ্চুগঞ্জ, সেমুতাং ও বেগমগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র থেকে দৈনিক প্রায় ১১৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করছে। বাপেক্স কর্তৃক আবিষ্কৃত এ সকল গ্যাসক্ষেত্রে ১.৬ টিসিএফ গ্যাস মজুদ রয়েছে। সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং, ইআরএলইউনিট-২, এলএনজি টার্মিনাল, এলপিজি টার্মিনাল, তেল সঞ্চালন পাইপলাইন প্রভৃতি চলমান প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে জ্বালানি খাতে দৃশ্যমান পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবে। তা ছাড়া অটোমেশন কার্যক্রম জ্বালানি খাতকে আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক ব্যবস্থাপনার সাথে সংযুক্ত করবে।

একনজরে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের (২০০৯-২০২০) অর্জনগুলো মধ্যে হলো, ২০০৯ সালে দৈনিক প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করা হতো ১৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট থেকে ২০২০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট; ২০০৯ সালে এলএনজি আমদানি ক্ষমতা শূন্য থেকে ২০২০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১০০০ এমএমসিএফডি; ২০০৯ সালে গ্যাসক্ষেত্র ২৩টি থেকে ২০২০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৭টি; ২০০৯ সালে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ ২০২৫ কি.মি. থেকে ২০২০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৮৮৭ কি.মি.; ২০০৯ সালে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান দ্বিমাত্রিক জরিপ থেকে ২০২০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২,৬৮০ লাইন কি.মি.; ২০০৯ সালে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ত্রিমাত্রিক জরিপ থেকে ২০২০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭৬৬ বর্গকিলোমিটার; ২০০৯ সালে ভূতাত্ত্বিক জরিপ থেকে ২০২০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৫৭

লাইন কি.মি.; ২০০৯ সালে জ্বালানি তেল সরবরাহ থেকে ২০২০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪০.৪৩ লাখ মেট্রিক টন; ২০০৯ সালে জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা থেকে ২০২০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩০ দিন (৯ লাখ মে. টন); ২০০৯ সালে এলপিজি সরবরাহ থেকে ২০২০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৫ হাজার মে. টন; ২০০৯ সালে এলপিজি সরবরাহকারী কোম্পানি থেকে ২০২০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় পাঁচটি; ২০০৯ সালে এলপিজির মূল্য (১২ কেজি) থেকে ২০২০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৪০০ টাকা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি, পেট্রোল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধি, তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের বহুমুখী ব্যবহার, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি, দ্বিপক্ষীয় বা বহুপক্ষীয় সম্পর্কের আওতায় ও আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জ্বালানি চাহিদা ও জোগানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। বৈশ্বিক মহামারি কারোনার প্রভাব জ্বালানি খাতে পড়েনি বললেই চলে। ফলে চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাচ্ছে। শিল্পে নিরবচ্ছিন্ন তেল-গ্যাস বা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাচ্ছে। বর্তমান সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ (মধ্যম আয়ের দেশ), রূপকল্প-২০৪১ (সমৃদ্ধ বাংলাদেশ), নির্বাচনি অঙ্গীকার, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি), পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও বদ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নকল্পে সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯-এর সংক্রামণের প্রেক্ষিতেও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১০৪.২৭% বাস্তবায়ন করেছে। কোভিড মহামারির মধ্যেও রূপকল্প-২০৪১ নির্দেশিতভাবেই বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে। যার যার ওপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করলে বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়ে রূপকল্প-২০৪১ নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই বাস্তবায়িত হয়ে বাংলাদেশ হবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

লেখক : উপপ্রধান তথ্য অফিসার, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খণিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে চামড়াশিল্প

এ এইচ এম মাসুম বিল্লাহ

জাতীয় অর্থনীতিতে চামড়াশিল্প উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। বর্তমানে এই খাত রপ্তানি আয়ের দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। এই খাতের দ্রুত প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও পণ্যে উচ্চমূল্য সংযোজনের সম্ভাবনাকে বিবেচনায় নিয়ে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্প খাতকে জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৬-এ উচ্চ অগ্রাধিকার খাতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক সমীক্ষায় জানা যায়, বিশ্বব্যাপী চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের চাহিদার মাত্র ৩ শতাংশ বাংলাদেশে পূরণ করে। বিগত কয়েক দশকে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনে কাঠামোগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০০৮ সালে এ খাতের ৬২ শতাংশ রপ্তানি আয় ফিনিশড লেদার হতে এলেও ২০১৪ সালে এটি কমে দাঁড়িয়েছে ৩৯ শতাংশে। অন্যদিকে ২০০৩ সালে এই খাতের মোট রপ্তানি আয় পাদুকাশিল্প হতে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ২০১৫ সালে সেটি ৪৩ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। দেশীয় পাদুকাশিল্পের টেকসই প্রবৃদ্ধি ও গুণগতমানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশি উদ্যোক্তারা এই খাতে বিনিয়োগের প্রস্তাব নিয়ে আসছে।

বর্তমানে বিশ্বে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের ২২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থের বাজার রয়েছে। এই বিশাল বাজারের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ ধরার জন্য পর্যাপ্ত কাঁচামালের জোগান আমাদের দেশে রয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, দেশে প্রতিবছরে প্রায় দুই কোটি ৩০ লাখ গোরু, ছাগল, মহিষ ও ভেড়া জবাই করা হয়। এই বিশাল পরিমাণ কাঁচামালকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হলে দেশের অর্থনীতিতে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন খাত জাতীয় অর্থনীতিতে আরো শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারবে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। বাংলাদেশে কাঁচা চামড়ার গুণগতমান ভালো হওয়ায় আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি চামড়াজাত পণ্যের ব্যাপক সুনাম ও চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যানুসারে, ২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই মাসে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হতে আয় হয়েছে ১০ কোটি ৬১ লাখ

ডলার, যা পূর্ববর্তী ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় ১৬.৩৯ শতাংশ বেশি। ২০২১ সালের মধ্যে পাঁচ হাজার কোটি টাকার চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে করোনার ফলে সারা বিশ্বের অর্থনৈতিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের ফলে অর্থনীতির অন্যান্য খাতের ন্যায় উৎপাদনমুখী চামড়াশিল্প খাতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের জুলাই মাসে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি আয় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৬.২২ শতাংশ বেশি হয়েছে। এ সময়ে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা সাত কোটি ৭৩ লাখ ডলার নির্ধারণ করা হলেও প্রায় ৯ কোটি ডলার আয় হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে উচ্চমানসম্পন্ন ক্রেতা পেতে লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের মানদণ্ড অর্জন অপরিহার্য। দেশে উৎপাদিত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে সাভারে অবস্থিত চামড়াশিল্প নগরীতে সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে অত্যাধুনিক কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার স্থাপন করা হয়েছে। কঠিন বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তবে লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের সার্টিফিকেট অর্জনে চামড়া প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সাথে জড়িত ট্যানারিসমূহের অন্য শর্তাবলি অবশ্যই পূরণ করতে হবে।

বর্তমানে মানবসভ্যতায় প্রযুক্তির উৎকর্ষতা ও এটির ব্যবহারের প্রবণতা দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রভূত উন্নয়নের ফলে সারা বিশ্ব এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মুখোমুখি। অর্থনৈতিক কার্যক্রমে এই শিল্পবিপ্লবের প্রভাব ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় উৎপাদন খাতেও এ সকল উদ্ভাবনের প্রভাব পড়ছে। এর ফলে ইতোমধ্যে সরবরাহ পদ্ধতিসহ সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় গুণগত পরিবর্তন আসছে। উৎপাদন কার্যক্রমে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যয় হ্রাস করে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে।

ফলে সমগ্র উৎপাদন খাতের কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষের কাজ করার সুযোগ ক্রমে কমে আসছে। একইভাবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দক্ষ জনসম্পদের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি কিছু কিছু কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার পুনর্বিন্যাসও পরিলক্ষিত হচ্ছে। আসন্ন এ শিল্পবিপ্লবের ফলে উৎপাদন কার্যক্রমে প্রথাগতভাবে যে সকল কাজ মানুষের দ্বারা সম্পন্ন হয়, সেগুলোর অনেকই যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হবে। এর ফলে স্বল্প দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা কমে যাবে।

তবে নতুন দক্ষতাসম্পন্ন জনশক্তির চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। এ শিল্পবিপ্লবের ফলে বাংলাদেশের যে সকল উৎপাদন খাত সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হবে, চামড়া ও পাদুকাশিল্প তার অন্যতম। এ ছাড়া রেডিমেড গার্মেন্ট ও টেক্সটাইল, ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি, আসবাবপত্র ও অ্যাগ্রো ফুড খাতও প্রভাবিত হচ্ছে এবং আগামীতেও এ ধারা চলমান থাকবে। তাই আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের উৎপাদন শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির যেমন অপার সম্ভাবনা রয়েছে, একই সঙ্গে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পপণ্য উৎপাদন খাতের সকল পর্যায়ের বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থান ঝুঁকির সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যেমন–ট্যানারিতে চামড়া প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে চামড়া ছাঁটাই, শুকানো ও ট্যানিংয়ের জন্য প্রয়োজন মোতাবেক রাসায়নিক প্রস্তুত; চামড়াজাত পাদুকা উৎপাদন শিল্পে কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে চামড়া কাটা, লাসটিং করা, অ্যামবোসিং ও স্ট্যাম্পিং, ফিনিশিং ও পাদুকার উপরিভাগ সেলাই করা এবং অন্যান্য চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে চামড়া কাটা, সেলাই করা, চামড়ার প্রান্ত সরু করা (skiving), সিপ্লটিং করা, অ্যামবোসিং, স্ট্যাম্পিং করা ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত জনশক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস পেতে পারে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহ নানাভাবে উপকৃত হবে। বিশেষ করে, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন খরচ যেমন হ্রাস পাবে, তেমনি উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পাবে। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে এ সকল প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবার মান বৃদ্ধি পাবে এবং ক্রেতাদের চাহিদা অনুসারে পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদনমুখী শিল্পসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম এক নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে। তবে এর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই শিল্পবিপ্লবের সকল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সরকার তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। চতুর্থশিল্প বিপ্লবের পথ ধরে টেকসই উন্নয়নের দিকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে–এটাই সকলের প্রত্যাশা।

লেখক : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

Bangabandhu's Historic 7 March Speech: A Masterpiece by a Poet of Politics

Taslima Akter

A good number of addresses delivered by the veteran world leaders are now included in the academic courses at various levels. However, the address by Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman before over 1 million people at the Racecourse Maidan (now Suhrawardz Udzan) on 7 March, 1971 is a unique one in many considerations. The Speech of the thunderous voice of Bangabandhu inspiring millions of Bangalees to lay down their lives for liberating the motherland has a special position to the learners specially to those with literature background. Another important dimension of this historic speech is the effective application of all the skills of communication of public address making it a textbook example for the communicators specially for the teachers. Universally all the leaders are good teachers or communicators. This uniqueness has been more pronounced in case of Bangabandhu. When any teacher listens to Bangabandhu's 7 March Speech, he or she would surely get some ingredients to absorb at least in terms of communication proficiency.

No legend speech like that of Bangabandhu has been able to stir the world to that extent. If anyone click online, a huge stockpile of literature on the speech would be visible within second. Journals, compilations, articles, features, research findings, press reports, seminars, symposiums etc. on threadbare analysis of the historic speech are coming out every day. The American news magazine the 'Newsweek'

in its 5 April, 1971 issue published a special article on Bangabandhu's 7 March Speech in which the Great Leader was described as a 'Poet of Politics'.

As a student of literature, I think, a political leader is a some sort of poet, who leads the followers to a world of dream. Bangabandhu had also been such a poet who was able to hypnotize his people with a dream of having an independent country breaking shackles of subjugation of thousands of years. However, a poet may or may not think of realizing his or her dream. From a poetic position, the speciality of Bangabandhu is, he had been able to materialize what he dreamt and what he made his people dream. So many leaders in this land dreamt of independence and carried out long struggle accordingly but failed in the long run. But Bangabandhu was unique in achiving thousands years old long cherished goal. And that is why, Bangabandhu is the greatest Bangalee of the all times, the founder of the Bangalee nation based state, the architect of the Independent Bangladesh and the father of the Nation of Bangladesh. Bangladesh and Bangabandhu are inseparable. As long as Bangladesh remains, the name of Bangabandhu will also remain. The conspiracy to undermine Bangabandhu in the chonicles of Bangladesh has never been successful, rather the conspirators themselves were thrown in the garbage of the history.

The 7 March Speech, the ground breaking event towards achieving the most coveted freedom, has tagged Bangabandhu as the Poet of Politics. Bangabandhu delivered a huge number of speeches throughout his political life. He was an extra-ordinary orator. Each and every speech delivered by him was a poem. The best masterpiece was the 7 March Speech. His political acumen, charismatic leadership, undisputed command, sagacious thinking, profound wisdom, tower personality, invincible courage, indomitable spirit, sky high confidence– everything was in climax while he was delivering the speech. The freedom fighters during the War of Liberation used to

listen to this speech to boost up their moral strength. Even after half a century, whenever we listen to this iconic speech, we feel a stirring in our blood. The wording of this speech is tied in a miracle way that, not a single unit can be changed. No one would be able to put pen on it changing even a word. Whenever we read it, we find it as an extra-ordinarily inspiring poem, not prose.

Along with an exceptional skill of making a prompt public address, Bangabandhu was also blessed with an enormous potentiality of writing. We see his journalistic zeal in the then Daily Ittehad and other newspapers and periodicals. We also witness Bangabandh's distinctive creative writing spirit in his autobiography 'Oshomapto Attojiboni' (Unfinished Memoirs), 'Karagarer Rojnamcha' (Prison Daily Life Diary) (daily life diary written Bangabandh during his about 13 years imprisoned life) and 'Amar Dekha Naya Chin' (The New China as I Saw), 'Pakistani intelligence report on Father of the Nation' and 'Smritikatha' (memoirs) (compilation yet to complete).

As a part of the under-graduate and graduate course syllabuses under the Department of English, the students have to go through detailed analysis of the 7 March Speech of Bangabandhu. The students are also to studz some other world renowned speeches. These include 'The Gettysburg Address' by U. S. President Abraham Lincoln, 'I have a Dream' by American Civil Rights Activist Martin Luther King Jr. and 'A Long Walk To Freedom' (autobiography and addresses) by South African Anti-apartheid Leader Nelson Mandela. Some other epoch-making addresses come as references. Addresses by British Prime Minister Winston Churchill, Soviet Leader Vladimir Lenin, Founding Father of the People's Republic of China Mao Tse-tung, Vietnamese Leader Ho Chi Minh, India's Non-violent Resistance Movement Leader Mahatma Gandi and the First Indian Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru are notable.

Among all the world renowned addresses, the 7 March Speech of Bangabandhu is the most acclaimed one. This is the best speech of all the times. The speciality of this speech is; Bangabandhu delivered it fully extempore without having any script or talking points or even hints. The script of the speech now available was prepared from its audio-tape. More‡ovver, Bangabandhu delivered the speech in a life and death critical moment and none of the world leaders mentioned above delivered speech in such a nerve-breaking pressure. Abraham Lincoln's highest rated the Gettysburg Address was a three minute long with less than 275 words. The well scripted speech was delivered at a ceremony recalling the soldiers killed in the 'Battle of Gettysburg'. And British Prime Minister Winston Churchill delivered his outstanding speech 'Never was so much owed by so many to so few' commemorating the pilots of the Royal Air Force killed in the 'Battle of Britain'.

Bangabandhu was under extreme pressure from the then ongoing movement activists to declare independence without any delay. There was also a reasonable ground for such declaration after dilemma of the Pakistani Junta to hand over power to the people's representative following the election results. On the other hand, the Pakistani Junta was out to quell such one sided declaration branding it as a separatist movement. Bangabandhu as a leader of the majority people of Pakistan had never been readz to take the blame. International support and sympathy needed for the Independence Struggle was also in his consideration. So, he had to be very thoughtful and strategic in selecting his words in the speech. How strategic he was! In the address, calling upon the countrymen to get readz to face the enemy in the imminent war with whatever the weapon they had, Bangabandhu finally proclaimed, 'The struggle this time is a struggle for freedom–the struggle this time is a struggle for emancipation.' He, in the speech, detailed various necessary preparation and gave all out directives for the war. However, about in the middle of the address, Bangabandhu

gave four conditions like withdrawal of Martial Law, sending back army personnel to barracks, investigation into the killing of the Bangalees and transferring power to the representatives of the people–for thinking of to join the Assembly Session called on 25 March. Declaring strongest combat against the Pakistani Army, Bangabandhu commanded, 'We will strive them (Pakistani soldiers) into submission. We will submerge them in water' Just immediately Bangabandhu pointing to the Pakistani soldiers in a soft voice said, 'You are my brothers, stay in your barracks and no harm will come to you.' In the address, Bangabandhu declared the continuation of the ongoing general strike in the government and semi-government offices and courts, but exempted rickshaws, launches, etc considering the suffering of the poor people. Thus we get both the soft hearted humanitarian and hardliner uncompromising Bangabandhu in his legendary address. The conversation style

although the address made it more attractive. The total history of exploitation and repression on the Bangalees by the Pakistani rulers came in his brief but profound and deep speech. Bangabandhu, through his thunderous voice kept the huge audience surging like waves of the most rough ocean. His unwavering call touched the heart of every Bangalee and mobilized the whole nation to get prepared for the ultimate sacrifice.

Bangabandhu's 7 March Speech is also a matter of interest from the language communication point of view. From our language learning knowledge, we know, a person can deliver highest 3 words in a second for an understandable communication. This should be one third for a huge crowd using hundreds of loud speakers of microphone as had been on the Racecourse Ground on that day. The total number of words in the about 19 minute long age winning speech was 1107. The seasoned orator Bangabandhu maintaining that standard communication rule pronounced on an average 58 to 60 words in every minute. There was no repetition of word or redundancy in the speech. However, repetition of some words

in one or two spots were just to give emphasis or reinforce the inner meaning. The inborn and inbuilt leader Bangabandhu, through his robust voice, articulation, bodz language, gesture and posture was so communicative that every individual of the huge gathering had been able to follow what he meant. While delivering speech, the way he was moving towards every direction to draw attention of audience of all sections of the gathering was also unique. The use of local dialect in the speech made it more effective. Bangabandhu developed this unparallel oratory skill over the years. He delivered most of his speeches instantly, without any prior preparation. He was gifted with an extra-ordinary intellect of drafting speech just seeing the audience from dais. His memory was so sharp that he could recall any one he had talked to anywhere, any time even long before. He had always been with an extra-ordinary talent to read the mind of the people. And that is why, he was the leader of the mass people of the whole country.

The 7 March Speech of Bangabandhu was inscribed as a documentary heritage in the Memory of the World International Register of UNESCO on 30 October, 2017. Earlier, the members of the International Advisory Committee of the UNESCO during its meeting from 24 to 27 October, 2017 in Paris thoroughly reviewed the 7 March Speech that had created a nation state. They had greatly been amazed seeing how a very tall statured leader through his fiery words kept a human sea of a mammoth rally up roaring with slogans all the time. UNESCO in its declaration said, the message imbued in the speech is still relevant and inspiring today as it calls for more inclusive and democratic societies in which the political, economic and cultural aspirations of all groups are fulfilled.

Writer : Associate Professor, Department of English, Siddheswari Girls' College, Dhaka

শিশুদের সাঁতার শেখানোর আবশ্যকতা

মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান

'সেন্ট মার্টিনসে সাগরে ডুবে দুই ছাত্রের মৃত্যু', 'কক্সবাজার সৈকতে ডুবে যুবকের মৃত্যু', 'রংপুরে পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু', 'পানিতে ডুবে দুই বোনের মৃত্যু', 'পানিতে ডুবে ভাই-বোনের মৃত্যু'–পত্রিকায় এমন হৃদয়বিদারক শিরোনাম আমরা প্রায়ই দেখতে পাই। খবর শুনে পরিবারের আহাজারি, ময়নাতদন্ত, তারপর শেষ। কিন্তু যে পরিবারের সন্তানটি গেল সে পরিবারের অবস্থা কি আমরা কখনো উপলব্ধি করছি? পরিসংখ্যানটা এখন খুবই দরকার যে শহরের শতকরা কতটি শিশু সাঁতার কাটতে শিখেছে? সাঁতার শেখানোর কতটা ব্যবস্থা শহরগুলোতে আছে? অথবা শিশুদের সাঁতার শেখানোর দায়িত্বই বা কোন বিভাগের?

পানিতে ডুবে মৃত্যুর কিছু পরিসংখ্যান দেখা যাক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) পানিতে ডুবে মৃত্যুসংক্রান্ত বৈশ্বিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উন্নয়নশীল ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে পানিতে ডুবে মৃত্যুর সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া দুষ্কর। এর পরও ডুবে মৃত্যুর ৯১ শতাংশ ঘটে বিশ্বের নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোয়। এই সংস্থার সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বে প্রতিবছর দুই লাখ ৩৬ হাজার মানুষ পানিতে ডুবে মারা যায়। পানিতে ডুবে মৃত্যুতে বাংলাদেশ বিশ্বে ২২তম। প্রথম আফ্রিকার গায়ানা। বাংলাদেশ ছাড়া প্রথম ২২টির ১৯টিই আফ্রিকার দেশ। পানিতে ডুবে মৃত্যু নিয়ে জাতীয়ভাবে সর্বশেষ জরিপ হয়েছে ২০১৬ সালে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং ইউনিসেফের সহযোগিতায় সেন্টার ফর ইনজুরিপ্রিভেনশন অ্যান্ড রিসার্চ, বাংলাদেশ পরিচালিত ওই জরিপের তথ্য-উপাত্ত অনুযায়ী প্রতিবছর সব বয়সি প্রায় ১৯ হাজার মানুষ পানিতে ডুবে মারা যায়। এদের তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি, অর্থাৎ আনুমানিক ১৪ হাজার ৫০০ জনই ১৮ বছরের কম বয়সি। অন্যভাবে বলা যায়, বাংলাদেশে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৪০ জন অনূর্ধ্ব ১৮ বছরের শিশুরা পানিতে ডুবে প্রাণ হারায়। পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা প্রতিদিন প্রায় ৩০ জন, অর্থাৎ বছরে প্রায় ১০ হাজার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৪ সালের বৈশ্বিক প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুমৃত্যুর ৪৩ শতাংশের কারণ পানিতে ডুবে মারা যাওয়া।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) 'বাংলাদেশ স্যাম্পলভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস ২০২০'-তে দেশে বিভিন্ন রোগে মৃত্যুর চিত্র তুলে ধরা হয়। তাতে দেখা যায়, পাঁচ বছরের কম বয়সি ৪৪ শতাংশ শিশুর মৃত্যুর কারণ নিউমোনিয়া। এর পরই পানিতে ডুবে মৃত্যুর স্থান। এটি প্রায় ৯ শতাংশ। পানিতে ডুবে শিশুমৃত্যুর এই পরিসংখ্যান আর কত প্রলম্বিত হবে? আশঙ্কার বিষয় হলো, এসডিজির লক্ষ্যমাত্রায় পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধে কোনো প্রতিকারের কথা বলা হয়নি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্যসেবা অর্থায়ন কৌশল ২০১২-৩১-এ পানিতে ডুবে মৃত্যুর বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই। আবার 'অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বহু খাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২৫'-এ ১০ দফা লক্ষ্যমাত্রা তুলে ধরা হয়েছে। তাতেও পানিতে ডুবে মৃত্যু রোধে কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়নি। এ প্রশ্নটি খুব স্বাভাবিকভাবেই আসতে পারে যে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর-ডোবার বাংলাদেশে বিপুলসংখ্যক লোক নদীপথে যাতায়াত করে। প্রতিবছর এখানে বন্যায় দেশের বিশাল অংশ তলিয়ে যায়। তখন পানির সাথে যুদ্ধ করে আমাদের বেঁচে থাকতে হয়। এখানে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে এক বা একাধিক পুকুর-ডোবা রয়েছে। এমন একটি দেশের সন্তানরা সাঁতার কাটতে জানে না বা জানবে না–এটা কী করে সম্ভব? সাঁতার শেখানোর কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। আর এটা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে নড়াইল, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ ও রাজবাড়ী জেলায়। তা ছাড়া জানা গেছে যে অন্য জেলাসমূহের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ও একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যা প্রক্রিয়াধীন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পানিতে ডুবে মৃত্যু রোধে ১০টি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার কথা বলেছে তাদের নির্দেশিকায়। এগুলোর মধ্যে পুকুর-ডোবায় বেড়ো দেওয়া এবং স্কুলগামী শিশুদের সাঁতার শেখানোর কথা বলা আছে। মূলত এ দুটি ক্ষেত্রে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার। পাশাপাশি গণসচেতনতা তৈরি করা দরকার। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী গণসচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। গ্রামের শিশুরা নিজ নিজ বাড়িতে থাকা পুকুরে অভিভাবকদের সহায়তায় সাঁতার শিখতে পারে। এ ক্ষেত্রে গ্রামের অভিভাবকদের সচেতন করে তুলতে হবে। গ্রামের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পুকুর রয়েছে। সেগুলোকে ব্যবহার উপযোগী করে সাঁতার শেখানোর ব্যবস্থা করা যায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। একটা গাইডলাইন তৈরি করে দিতে পারে।

বিভিন্ন শহরে কী পরিমাণ পুকুর-লেক আছে তার একটি সমীক্ষা প্রয়োজন। তার আলোকে প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়। সেই পুকুর-লেকগুলোকে ব্যবহার উপযোগী করে সাঁতার ফেডারেশন ও কমিউনিটি পিপলের সমন্বয়ে কমিটি করে সাঁতার শেখানোর ব্যবস্থা করা যায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় আগামী দিনগুলোতে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করবে, সেখানে পুকুর রাখার বাধ্যবাধকতা করা অত্যাবশ্যক। বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে। প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরের তুলনায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্তরে সাঁতার শেখানোর উপযুক্ত বয়স বলে মনে করা হয়। এখন বর্ষাকাল চলছে। এ সময়ে নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-ডোবা পানিতে পরিপূর্ণ থাকে। বন্যা হবে দেশের বিভিন্ন জেলায়। এ সময়ে শিশুদের সতর্ক নজরে রাখতে হবে। পাশাপাশি শিশুদের সাঁতার শেখানোরও উপযুক্ত সময় এটি। তাই অভিভাবকরা সন্তানদের এ সময়ে সাঁতার শেখানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। আপনাদের ব্যস্ততার মাঝেও শিশুদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কাজটি করতে হবে।

শিশুদের রক্ষায় সাঁতার শেখানোর আবশ্যকতা উপলব্ধি করে জাতিসংঘ ২৫ জুলাইকে 'বিশ্ব পানিতে ডুবে যাওয়া প্রতিরোধ দিবস' ঘোষণা করেছে ২০২১ সালের ২৮ এপ্রিল। পানিতে ডুবে যাওয়া প্রতিরোধ কল্পে এ বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে–'যে কেউ পানিতে ডুবে যেতে পারি, সবাই মিলে প্রতিরোধ করি'। প্রতিরোধ সবাই মিলেই করতে হবে; কিন্তু নেতৃত্ব থাকতে হবে। শিক্ষা, স্থানীয় সরকার, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, মহিলা ও শিশু, যুব ও ক্রীড়া এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সমন্বিতভাবে কাজ করলে আশা করা যায় পানিতে ডুবে মরার মত হৃদয়বিদারক ঘটনা থেকে আমরা নতুন প্রজন্মকে রক্ষা করতে পারব। সমুদ্র বা নদীর পাড়ে ঘুরতে গিয়ে কোনো শিক্ষার্থীর মৃত্যু হবে না, কোনো মায়ের বুক খালি হবে না, কোনো পরিবারের স্বপ্ন পানিতে তলিয়ে যাবে না–এমন বাংলাদেশ আমাদের প্রত্যাশা।

লেখক : প্রকল্প পরিচালক, বেটার সার্ভিস অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন উইথ মিডিয়া প্রজেক্ট, তথ্য অধিদফতর

একজনই শেখ হাসিনা : কেন তাঁকে নিয়ে লিখব

আফরোজা নাইচ

আমি একাত্তরের অগ্নিঝরা দিনগুলো দেখিনি, জানি একুশ শতকের বিশ্বময় রুদ্ধশ্বাসের গল্পগুলো, যে গল্পরা বলে দূরে দূরে কাছে থাকার কথা। আমি মুজিবকে দেখিনি, দেখেছি তাঁরই করে রাখা গুছিয়ে; সোনার বাংলার দূরদর্শন। আমি এক তর্জনীর মহান শক্তি দেখিনি, মিলেছে এক মহান মানবের আড়ষ্টহীন দুর্দমনীয় মানবতার। আমি শেখ হাসিনাকে নিয়ে লিখব; কারণ বাংলাদেশ মানে বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু মানে শেখ হাসিনা আর বাংলাদেশের বিকল্প শেখ হাসিনা।

বাংলাদেশ হলো আমাদের মা। মাকে জানতে হলে জানতে হবে এর ইতিহাসকে। আর ইতিহাসই হলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। বাবা যাঁকে আদর করে হাসু বলে ডাকতেন। শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় ১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবের পাঁচ সন্তানের মধ্যে সবার বড়ো।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পিতা বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের সদস্যদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর ছোটো বোন শেখ রেহানাকে নিয়ে দীর্ঘ সাড়ে ছয় বছর নির্বাসিত জীবনযাপনের পর অবশেষে ১৯৮১ সালের ১৭ মে দেশে ফিরে আসেন তিনি। আওয়ামী লীগের ঐক্যের প্রতীক হিসেবে শেখ হাসিনাকে সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করা হয় বাবার হাতে গড়া সংগঠনের, তৃণমূল চষে বেড়িয়ে দলকে করেন সুসংঠিত। হাল ধরেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের।

শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৩ সালে বাংলায় স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই সব গণ-আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। শেখ হাসিনা নব্বইয়ের ঐতিহাসিক গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দানকারীদের মধ্যে অন্যতম। তিনি রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থা পরিবর্তন করে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে সংগঠিত করেন। আর এভাবেই সংসদ হয়ে ওঠে জনবান্ধব, প্রতিফলিত হয় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হয়ে ওঠেন একজন শেখ হাসিনা।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত, দুর্নীতি ও শোষণহীন সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ। 'বাংলার মানুষের মুক্তি' এই দর্শনের ওপর ভিত্তি করে বঙ্গবন্ধু আধুনিক রাষ্ট্রের রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন, যা দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) প্রতিফলিত হয়েছিল। তাঁরই দেখানো পথ ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ ২০১৫ সালে এমডিজির অধিকাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশ ২০১৮ সালে প্রথমবারের মতো স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তীর্ণ হওয়ার সকল শর্ত পূরণ করেছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উদযাপনের মুহূর্তে ২৬ ফেব্রুয়ারি (২০২১) বাংলাদেশের ইতিহাসে জাতিসংঘ কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসির (সিডিপি) চূড়ান্ত সুপারিশ পেয়েছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ আজ এশিয়ার সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ। দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ২,২২৭ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও এখন ৪১ বিলিয়ন ডলারের ওপরে। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় আমাদের গড় আয়ু ছিল ৪৭, এখন ৭২ বছরের ওপরে। প্রাথমিক স্কুলে যাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় শতভাগ। সাক্ষরতার হার ৭৪.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার বর্তমানে অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়েই সারা দেশে ৫৬০টি মডেল মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।

স্বপ্নের পদ্মা সেতু যোগ করেছে বাংলাদেশের স্থান বিশ্বের দরবারে নতুন মাত্রা। মেট্রো রেলের চলমান নির্মাণকাজ, পায়রা সমুদ্রবন্দরের কাজ এগিয়ে চলছে। চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে বহু লেন টানেল নির্মাণের প্রথম টানেল সমাপ্ত হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশে রেল যোগাযোগব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। মাতারবাড়ীতে নির্মাণ করা হচ্ছে গভীর সমুদ্রবন্দর, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পর আবার ঢাকার যাত্রাবাড়ী থেকে মাওয়া হয়ে ফরিদপুরের ভাঙ্গা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মানের এক্সপ্রেস হাইওয়ের যুগে পা রাখল বাংলাদেশ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে 'মুজিববর্ষ'-এ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ২৯৮টি কর্মসূচিসংবলিত একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা বছরব্যাপী নিয়েছে নানা ধরনের

কল্যাণধর্মী কার্যক্রম, এর মধ্যে সারা দেশে এক কোটি বৃক্ষরোপণ ও সকলের জন্য আবাসন নিশ্চিতকরণে গৃহহীন ও আশ্রয়হীনদের জন্য আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওয়তায় ১,৫৩,৭৭৭টি গৃহহীন পরিবারকে তাদের নিজ জায়গায় ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। সারা দেশে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে আধাপাকা ঘর দিচ্ছে সরকার। এ ছাড়া ৩৬টি উপজেলায় ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণের মাধ্যমে আরো তিন হাজার ৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। সব মিলিয়ে মুজিববর্ষে ৬৯ হাজার ৯০৪টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

বৈশ্বিক করোনা মহামারির বিধ্বংসী উপেক্ষা করে সরকার দ্রুততম সময়ে পিসিআর ল্যাব স্থাপন থেকে শুরু করে সমস্ত সেক্টরে সামাজিক সুরক্ষাসহ বিভিন্ন খাতে এক লাখ ২০ হাজার ১৫৩ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে, যা মোট জিডিপির ৪.৩০ শতাংশ। সরকার ২৭ জানুয়ারি থেকে প্রথম করোনার টিকা দিতে শুভসূচনা করেছে, যা গোটা মানবজাতিকে এক চরম অনিশ্চয়তা, হতাশা, উৎকণ্ঠা, গুজব থেকে মুক্তি দিয়েছে। মার্কিন গণমাধ্যম ব্লুমবার্গ প্রকাশিত 'কোভিড রেজিলিয়েন্স র‍্যাংকিং'-এ দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের স্থান প্রথম এবং বিশ্বে ২০তম।

শুধু রাজনীতির সাথেই জড়িত নন তিনি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ' শেখ মুজিব আমার পিতা', 'ওরা টোকাই কেন?', 'বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম', 'দারিদ্র্যমোচন, কিছু ভাবনা', 'আমার স্বপ্ন, আমার সংগ্রাম', 'আমরা জনগণের কথা বলতে এসেছি', 'সামরিকতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র', 'সাদা-কালো, সবুজ মাঠ পেরিয়ে', 'Miles to Go, The Quest for Vision-২০২১' ইত্যাদি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে বলেছিলেন, 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না'। সেই আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান বাঙালি জাতি করোনা মহামারির ভয়াবহতা উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' গড়তে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ নির্মূল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন তথ্য-প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন ও বিকাশ, জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাসহ একটি উন্নত জাতি ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনে শেখ হাসিনার মত একজন দৃঢ়প্রতয়ী নারী অটল। আর এখানেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একটি নাম নয়, শতবর্ষে তিনি একটি ইতিহাস, একটি পতাকা, একটি দেশ এবং শেখ হাসিনা হলেন তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি, একজই শেখ হাসিনা।

জীবদ্দশাতেই একজন মমতাময়ী মা, একজন দূরদর্শী ও প্রতিশ্রুতিশীল রাজনীতিবিদ, বিচক্ষণ কূটনীতিক, একজন দায়িত্বশীল স্ত্রী এবং সর্বোপরি একজন যোগ্য ও সাহসী উত্তরসূরি শেখ হাসিনা নিয়ে আমাদের দরকার প্রচুর গবেষণা। আর তখনই আমরা জানতে পারব দেশপ্রেম কী, মানবতা কী, শত সহজ বাধা ডিঙিয়ে জীবনের জন্য, দেশের জন্য তথা জনগণের জন্য কী করে চ্যালেঞ্জ নেওয়া যায়।

শেখ হাসিনা সম্বন্ধে লিখতে গেলে জানতে হবে শেখ হাসিনাকে, পড়তে হবে শেখ হাসিনাকে, আবিষ্কার করতে হবে শেখ হাসিনাকে। তখনই একজন ব্যক্তি তাঁর কি দায়িত্ব ও কর্তব্য জানতে পারবেন, বুঝতে পারবেন। এভাবেই শেখ হাসিনা হয়ে ওঠেন একজন, হয়ে উঠবেন একজনই শেখ হাসিনা, যুগ থেকে যুগান্তরে সকল সময়ের ঊর্ধ্বে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে।

লেখক : উপ-প্রকল্প পরিচালক, বেটার সার্ভিস অ্যান্ড কোঅর্ডিনেশন উইথ মিডিয়া প্রজেক্ট, তথ্য অধিদফতর

আমার গ্রাম, আমার শহর

ইমদাদ ইসলাম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন দেশে নগর ও গ্রামের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লব, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎতায়ন, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল পরিবর্তন সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে শুধু অঙ্গীকারই করেননি, বাংলাদেশের সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে তা অন্তর্ভুক্তর মাধ্যমে তিনি স্থায়ী ও দৃঢ় প্রত্যয়ে অঙ্গীকার করেছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপলব্ধি করেছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, অর্থাৎ আমাদের এই দেশ অপার সম্ভাবনাময় একটি দেশ। তিনি তাঁর মেধা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছিলেন। তিনি দেখলেন, সকল সুযোগ-সুবিধা শহরকেন্দ্রিক। তিনি বাংলাদেশের গ্রামগুলোকে আধুনিক ও পরিকল্পিত গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখলেন। কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না–এই নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

জাতির দুর্ভাগ্য, তিনি তাঁর কাজ শেষ করতে পারেননি। বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালের নির্বাচনের ইশতেহারে ৩.১০ অনুচ্ছেদে 'আমার গ্রাম, আমার শহর' বাস্তবায়নের ঘোষণা দেন।

প্রতিটি গ্রামে উন্নত রাস্তাঘাট, যোগাযোগ সুবিধা, সুপেয় পানির ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা ও উন্নত চিকিৎসা সুবিধা, মানসম্পন্ন শিক্ষা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা, উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কম্পিউটার ও দ্রুতগতির ইন্টারনেট সুবিধা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসহ মানসম্মত ভোগ্যপণ্যের বাজার, ব্যাংকিং সুবিধা, গ্রামীণ কর্মসংস্থান, কমিউনিটি স্পেস ও বিনোদনের ব্যবস্থা সম্প্রসারণের মাধ্যমে শহরের সুবিধা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া গ্রামে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বাড়ানো ও নির্ভরযোগ্য করার লক্ষ্যে গ্রুপ ভিত্তিতে বায়োগ্যাস প্লান্ট ও সৌরশক্তি প্যানেল বসানোতে উৎসাহ ও সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর

২০২১-২২ সালের বাজেট বক্তৃতায় গ্রাম পর্যায়ে কৃষিযন্ত্র সেবা সম্প্রসারণ এবং এর মাধ্যমে গ্রামীণ যুবক ও কৃষি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান করার কথা উল্লেখ করেছেন।

বিবিএসের ২০১৭ সালের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশের ৬৪.৯৬ শতাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করে। এর মধ্যে থেকে প্রতিবছর ৭.৬ শতাংশ মানুষ গ্রাম থেকে শহরে চলে আসে। এতে করে প্রতিবছরই শহরের ওপর বাড়তি জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নাগরিক সুবিধা দিন দিন সংকুচিত হচ্ছে। নগরবাসী তাদের প্রাপ্য ন্যূনতম নাগরিক সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ২০৪১ সালে দেশের জনসংখ্যা হবে কমবেশি ২২ কোটি। দেশে বর্তমানে ০.৫-১ শতাংশ হারে কৃষিজমি কমছে। এর বড়ো একটি অংশ বসতভিটায় রূপান্তরিত হচ্ছে। কৃষিজমি কমার কারণে ভবিষ্যতে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। এ ছাড়া গ্রামের জীববৈচিত্র্য নষ্ট হবে। তাই জনবহুল গ্রামগুলোতে শহরের সেবা নিশ্চিত করা গেলে মানুষের শহরে আসা কমে যাবে। গ্রামীণ কৃষির উদ্বৃত্ত শ্রমিক পরবর্তী বছরগুলোতে আরো আধুনিক সেবা খাতে নিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমে তাদের পেশা পরিবর্তন করছে। এ সকল উদ্বৃত্ত শ্রমিকরা প্রাথমিকভাবে গ্রামীণ ও নগরের বাণিজ্য, পরিবহন ও ব্যক্তিগত সেবামূলক কার্যক্রমে জড়িত হয়। এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে গ্রামীণ কৃষি খাতের অনেক শ্রমিক চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছে। ফলে গ্রামীণ কৃষি শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে গ্রামীণ মানুষের জীবনমান আগের থেকে অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসে মজুরি বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি গ্রামীণ জনপদের মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বর্তমান সরকার গ্রামে, শহরের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন কমানোর ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। ২০১৮ সালের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্য মতে, দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪০.৬ শতাংশ জোগান দেয় কৃষি। জিডিপিতে কৃষির অবদান ১৩.৬ শতাংশ। বিশ্বের ১৭৪টি দেশে এক কোটি ২০ লাখেরও বেশি বাংলাদেশি অভিবাসনকর্মী কর্মরত আছে। যার অধিকাংশই গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর। এ ছাড়া প্রায় ৫০ লাখ গার্মেন্টকর্মী শহরে কাজ করছে। এদের অধিকাংশই নারী। তাদের প্রায় সবাই গ্রাম থেকে এসেছে। এরা প্রতি মাসেই মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে গ্রামে পরিবারের কাছে টাকা পাঠাচ্ছে।

অভিবাসী ও তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত কর্মীদের প্রেরিত অর্থ গ্রামীণ অর্থনীতিকে দিন দিন শক্তিশালী করছে। আমার গ্রাম, আমার শহর, গ্রামাঞ্চলে

শহরের আধুনিক নাগরিক সেবাসমূহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ১৫টি গ্রামকে পাইলট মডেল গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১৫টি মডেল গ্রামের আটটি হবে দেশের আটটি বিভাগে এবং বাকি সাতটি হবে হাওর, উপকূলীয় এলাকা, পাহাড়ি এলাকা, চর এলাকা, বরেন্দ্র অঞ্চল, বিল এলাকা এবং অর্থনৈতিক এলাকার পাশে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ মডেল গ্রাম বাস্তবায়নে কাজ করছে, তবে মডেল গ্রাম স্থাপনে নেতৃত্বে আছে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্থ স্থানীয় প্রকৌশল অধিদপ্তর। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবমুক্ত সড়কব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, উপজেলা মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারণ, প্রতিটি গ্রামে পর্যায়ক্রমে পাইপের মাধ্যমে সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃজনের লক্ষ্যে বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরি করা হবে।

আমাদের দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি কৃষি। কৃষিই আমাদের আবহমান গ্রামবাংলার কৃষ্টি, মনন ও সংস্কৃতির অন্যতম অনুষঙ্গ। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়তে মৌলিক নাগরিক সুবিধাসমূহ গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার বাংলাদেশের উন্নয়নের ভিত্তিকে স্থায়ী রূপ দিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লালিত স্বপ্নের বহিঃপ্রকাশ 'আমার গ্রাম, আমার শহর'। আর এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

লেখক : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

কোরবানির চামড়ার ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতে গৃহীত পদক্ষেপ

মো. আব্দুল লতিফ বকসী

'জাতীয় সম্পদ চামড়া, রক্ষা করব আমরা'–এই স্লোগানকে সামনে রেখে আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহায় কোরবানির প্রাণীর চামড়া সংগ্রহ, নিরাপদ সংরক্ষণ এবং ক্রয়-বিক্রয়ে ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে ব্যাপক পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। চামড়া আমাদের অন্যতম জাতীয় সম্পদ। একসময় চামড়া ছিল আমাদের অন্যতম রপ্তানি পণ্য। সেই হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে বর্তমান সরকার ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। চামড়াশিল্পকে একটি টেকসই ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কাজ করছে। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য ও ফুটওয়্যার, প্লাস্টিকসামগ্রী এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'এক্সপোর্ট কমপেটেটিবনেস ফর জবস (ইসিফোরজে)' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ করছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে ২০১৭ সালে। ছয় বছর মেয়াদি এই প্রকল্পে ব্যয় হবে ৯৪১ কোটি টাকা। চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৭ সালকে 'প্রডাক্ট অব দ্য ইয়ার' ঘোষণা করেছেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের চামড়াশিল্পকে একটি শক্তিশালী অবস্থানে নেওয়ার জন্য কাজ চলছে।

কোরবানির প্রাণীর চামড়া আহরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন এবং ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত সাপ্লাই চেইনে যাতে কোনো ধরনের সমস্যা না হয়, সে জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ সারা দেশের প্রশাসন কাজ করেছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছে বিশেষ মনিটরিং সেল। লবণযুক্ত চামড়া সংরক্ষণ, পরিবহন এবং ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রে সকল বিষয় তদারকির জন্য প্রতিটি জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করবে। সেলের প্রধান বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মালেকা খায়রুন্নেছা (অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন মোবাইল-০১৭১১০০৫৬৪৬) সদস্যরা হলেন মো. আমিনুল ইসলাম (উপসচিব, রপ্তানি-৭ মোবাইল-০১৭১৬৪৬২৪৮৪,), মো. সেলিম (উপসচিব, এফটিএ মোবাইল-০১৭১৩৪২৫৫৯৩), মো. জিয়াউর রহমান (বাণিজ্য পরামর্শক মোবাইল-০১৭১২১৬৮৯১৭) যেকোনো সদস্যায় ফোন করলেই সহযোগিতা পাওয়া যাবে।

চামড়ার উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করতে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি সংশ্লিষ্টজনদের নিয়ে ভার্চুয়াল মিটিং করে নির্ধারণ করে দেন কোরবানির চামড়ার মূল্য। চামড়ার স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারদর, চাহিদা, সরবরাহ, রপ্তানির সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের মতামত বিবেচনায় নিয়ে লবণযুক্ত গোরুর চামড়ার মূল্য ঢাকায় প্রতি বর্গফুট ৪০-৪৫ টাকা, ঢাকার বাইরে ৩৩-৩৭ টাকা, সারা দেশে খাসির চামড়া ১৫-১৭ টাকা এবং বকরির চামড়া ১২-১৪ টাকা ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীগণকে নির্ধারিত মূল্যে চামড়া ক্রয় নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। বাণিজ্যমন্ত্রী ব্যবসায়ীদের প্রতি নির্ধারিত মূল্যে কোরবানির চামড়া ক্রয় করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এই চামড়ার মূল্য গরিবের হক। এতিমখানা, মাদ্রাসা, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের মতো সংস্থাগুলোই এ চামড়া সংগ্রহ করে থাকে। গরিবের ন্যায্য পাওনা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। চামড়া ক্রয় নিশ্চিত করতে ব্যবসায়ীদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রায় ৬০০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে এবং খেলাপি ঋণের ৩ শতাংশ পরিশোধ করে তিন বছরের জন্য ঋণ নিয়মিত করার সুযোগ প্রদান করেছে। দেশে লবণের সরবরাহ ও মূল্য স্বাভাবিক রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানের জন্য প্রশাসনকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, এবার কোরবানির চামড়া সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং নির্ধারিত মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ে কোনো ধরনের সমস্যা হবে না।

প্রাণী জবাইয়ের সময় ও পূর্বে করণীয় হলো প্রাণীকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম দিতে হবে; জবাইয়ের স্থান সমতল ও পরিষ্কার হতে হবে এবং সেই স্থানে রক্ত জমার জন্য প্রয়োজনীয় সাইজের গর্ত করে নিতে হবে; জবাইয়ের ছুরি বড়ো এবং যথেষ্ট ধারালো হতে হবে; জবাইয়ের পর প্রাণীর রক্ত সম্পূর্ণ ঝরাতে সময় দিতে হবে; প্রাণী টানাহেঁচড়া করা যাবে না, এতে ঘর্ষণে চামড়া নষ্ট হতে পারে; কোরবানির পর বর্জ্য দ্রুত ও সঠিকভাবে অপসারণ করে জীবাণুনাশক ছিটিয়ে দিতে হবে এবং মাস্ক ও হ্যান্ডগ্লাভস ব্যবহারসহ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে হবে। সঠিকভাবে চামড়া ছাড়ানোর পদ্ধতি হলো প্রাণী কোরবানির পর সুচালো মাথার ছুরি দিয়ে সঠিকভাবে লম্বালম্বিভাবে চামড়া কাটতে হবে; বাঁকানো মাথার ছুরি দিয়ে চামড়া ছাড়াতে হবে; রক্তমাখা ছুরি কোনোভাবেই চামড়ায় মোছা যাবে না; কাঁচা চামড়া সংরক্ষণ পদ্ধতি হলো লবণ দিয়ে চামড়া সংরক্ষণের পূর্বে চামড়ায় লেগে থাকা মাংস, চর্বি, রক্ত, পানি, মাটি ও গোবর ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে; চামড়া ছাড়ানোর ৪-৫ ঘণ্টার মধ্যে গোরুর চামড়ায় ৭-৮

কেজি, ছাগলের চামড়ায় ৩-৪ কেজি লবণ ভালোভাবে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে কোনো স্থান ফাঁকা না থাকে। চামড়া সংরক্ষণের স্থান একটু উঁচু হতে হবে, যাতে চামড়া থেকে পানি ও রক্ত সহজেই গড়িয়ে যেতে পারে। এমনভাবে চামড়া সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে বৃষ্টির পানি বা রোদ না লাগে এবং স্বাভাবিক বাতাস চলাচল করতে পারে।

দেশে উৎপাদিত চামড়ার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে শুরু করেছে। দেশে চামড়াজাত শিল্পের ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। দেশের অভ্যন্তরীণ বিশাল চাহিদা মিটিয়ে অনেক চামড়াজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। সরকার এ চামড়া খাতকে রপ্তানিমুখী করতে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। বাংলাদেশে চামড়াশিল্পের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকার হাজারীবাগে ইতালি সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ লেদার সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সেন্টারটি চামড়াশিল্পের মানোন্নয়ন এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

প্রথমবারের মতো ওয়েট ব্লু চামড়া রপ্তানির অনুমতি দিয়ে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। সম্প্রতি ওয়েট ব্লু চামড়া চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন দেশে রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে। এক কোটি বর্গফুটের বেশি ওয়েট ব্লু চামড়া ইতোমধ্যে রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ রপ্তানির পরিমাণ দুই কোটি বর্গফুট হতে পারে। এতে করে দেশের চামড়ার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে। বাংলাদেশে এখন বিশ্বমানের চামড়াজাত পণ্য তৈরি হচ্ছে। এসব পণ্য রপ্তানিতে সরকার ১৫ শতাংশ হারে নগদ আর্থিক সহায়তা (ক্যাশ ইনসেনটিভ) প্রদান করছে। এই সেক্টরে বিনিয়োগ করতে বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও বেশ উৎসাহী। কারণ এই শিল্পের কাঁচামাল স্থানীয় এবং তুলনামূলক কম মূল্যের দক্ষ কর্মী পাওয়া যায়। এখন আর বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সমস্যা নেই। সরকারের বোর্ড অব ইনভেস্টমেন্ট বিনিয়োগের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করেছে। বিনিয়োগকারীদের সকল আনুষ্ঠানিকতা সহজ ও দ্রুত করা হয়েছে এবং বিশেষ প্যাকেজে সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে গড়ে তোলা হচ্ছে ৩০০টি স্পেশাল ইকোনমিক জোন। এগুলোতে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের চামড়ার তৈরি জুতা, বেল্ট, ব্যাগ, মানিব্যাগ, জ্যাকেট, ট্রাভেলের জন্য স্যুটকেস ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, সিঙ্গাপুর এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় বেশি রপ্তানি হচ্ছে।

পাট, চা, চামড়া রপ্তানি করে বাংলাদেশ রপ্তানি বাজারে প্রবেশ করেছিল। চামড়া বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় রপ্তানি খাত। এ খাতকে রপ্তানিমুখী করতে সরকারের প্রচেষ্টার শেষ নেই। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে বাজারে এসেছে প্রাকৃতিক চামড়া। ইংরেজিতে বলা হয় আর্টিফিশিয়াল লেদার। পণ্য প্রস্তুত করা হয় মনের মাধুরী মিশিয়ে নানা রং ও ডিজাইনের। দৃষ্টিনন্দন পণ্য তৈরি করে বাজার দখলের চেষ্টা হয়েছে বিভিন্নভাবে। একসময় পণ্য ব্যবহারকারীরা আবার ফিরে গেছেন অরিজিনাল চামড়ার তৈরি পণ্যের দিকে। তাই বিশ্ববাজারে চামড়ার চাহিদা কমেনি। উন্নত দেশে খামার পদ্ধতিতে পশু উৎপাদনের কারণে প্রাকৃতিকভাবে পশু উৎপাদনকারীরা প্রতিযোগিতায় কুলাতে পারেনি। তবে সে ক্ষেত্রেও চামড়ার মান নিয়ে প্রতিযোগিতা আছে। দেখা গেছে, প্রাকৃতিকভাবেই বাংলাদেশের চামড়ার মান বেশ উন্নত।

সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বরাবরই দেশের চামড়াশিল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বিপুল চাহিদা রয়েছে বিশ্বের অনেক দেশে। বাংলাদেশের রপ্তানিতে তৈরি পোশাক শিল্পের অবদান প্রায় ৮৪ শতাংশ। দেশের রপ্তানি পণ্যের বাস্কেটে পণ্যের সংখ্যা বাড়ানো খুবই জরুরি। একটি পণ্যের ওপর নির্ভরশীল হওয়া রপ্তানি খাতের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তাই সরকার বিগত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকেই রপ্তানি পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

যেকোনো শিল্পের টেকসই উন্নয়ন প্রয়োজন। পরিবেশবান্ধব এবং আধুনিক পদ্ধতিতে চামড়াশিল্পের বিকাশের জন্য সরকার সাভারে বড়ো পরিসরে দেশের সর্ববৃহৎ শিল্পনগরী গড়ে তুলেছে। হাজারীবাগের চামড়া ব্যবসায়ীগণ সেখানে তাঁদের ব্যাবসা-বাণিজ্য সরিয়ে নিয়েছেন। এখন সেখানে আধুনিক পদ্ধতিতে, কর্মবান্ধব পরিবেশে শ্রমিকরা কাজ করছে। দেশে উৎপাদিত চামড়া এখন আর নষ্ট হওয়ার কারণ নেই। পরিবেশ সুরক্ষায় পর্যাপ্ত শোধনাগারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শ্রমিকরা এখন সেখানে কর্মবান্ধব পরিবেশে আধুনিক পদ্ধতিতে কাজ করছে। ওয়েট ব্লু চামড়ার রপ্তানির দুয়ার খুলে গেছে। আশা করা যায়, এবার কোরবানির চামড়ার ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

লেখক : সিনিয়র তথ্য অফিসার, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

লেখক বঙ্গবন্ধু : 'যেন অগ্নি-উগারী বান'

পরীক্ষিৎ চৌধুরী

'মানুষকে ব্যবহার, ভালোবাসা ও প্রীতি দিয়েই জয় করা যায়। অত্যাচার, জুলুম ও ঘৃণা দিয়ে জয় করা যায় না।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা-২০০) ১৯৪৭-এ উপমহাদেশ ভাগের পরই বাংলাদেশ নিয়ে তাঁর সুস্পষ্ট অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সেই সময় বেকার হোস্টেলে বসে তিনি তাঁর সঙ্গীদের বলেছিলেন, 'মাউড়াদের সাথে থাকা যাবে না।' তিনি শেখ মুজিব! ১৯৬৬ সালে ছয় দফা পেশ করার পর শেখ মুজিব লন্ডন সফরে গেলে সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক তখন বিবিসিতে কর্মরত, বঙ্গবন্ধুর কাছে জানতে চাইলেন, 'ছয় দফা' বিষয়টি কী? শেখ মুজিব তখনো 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি পাননি। সৈয়দ হকের দিকে তিনটি আঙুল দেখিয়ে স্পষ্ট করে বললেন, 'কত নিছো? কবে দিবা? কবে যাবা?' আমাদের জাতীয় ইতিহাসের মোড় ঘোরানো এই 'ছয় দফা' আন্দোলনে বাঙালির ওপর নেমে আসা নির্যাতনে ভিন্ন এক মুজিবকে আবার কিছুক্ষণের জন্য দেখা যায়। তিনি বিচলিত হয়ে লিখলেন 'কারাগারের রোজনামচা'য় ১৯৬৬-এর ৬ জুন, 'এ ত্যাগ বৃথা যাবে না, যায় নাই কোনোদিন। নিজে ভোগ করতে নাও পারি, দেখে যেতে নাও পারি। তবে ভবিষ্যৎ বংশধররা আজাদি ভোগ করবে।' প্রাণাধিক প্রিয় বাঙালিদের জন্য আবেগমথিত হৃদয়ে আবার জেগে উঠল অগ্নি-উজারী বান। ৮ জুন লিখলেন, 'যে রক্ত আজ আমার দেশের ভাইদের বুক থেকে বেরিয়ে ঢাকার পিচঢালা কাল রাস্তা লাল করেছে, সে রক্ত বৃথা যেতে পারে না।' (কারাগারের রোজনামচা)। এই হচ্ছেন শেখ মুজিব। আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এখানে মহাত্মা গান্ধীর উক্তি মনে পড়ে যায়। The Story of my experiments with truth-এ গান্ধীও এমন ভাবনার কথাই জানিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'যখন হতাশা কাজ করত, আমি স্মরণ করতাম যে ইতিহাসে সব সময় সত্য ও ভালোবাসার জয় হয়েছে। অত্যাচারী ও খুনিরা সাময়িকভাবে অপরাজেয় মনে হলেও শেষ পর্যন্ত তাদের পতন অনিবার্য।'

বঙ্গবন্ধুর আয়ু ছিল মাত্র ৫৫ বছর ৪ মাস ২৯ দিন। কারাগারেই ছিলেন চার হাজার ৬৮২ দিন। জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন কারাগারে।

বন্দিজীবনের সময়টা তিনি অপচয় করেননি। লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর মানস নির্মিতির ইতিহাস, অভিজ্ঞতা, ভাবনা, আদর্শ, বাঙালির অধিকার আদায়ে সর্বোচ্চ ত্যাগের জন্য মানসিক প্রস্তুতির কথা। সেসব পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে ৩৪৫ পৃষ্ঠার 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' (২০১২) ও ৩০২ পৃষ্ঠার 'কারাগারের রোজনামচা' (২০১৮) এবং চীন সফরের অভিজ্ঞতা নিয়ে ২০০ পৃষ্ঠার 'আমার দেখা নয়াচীন' (২০২০)। তাঁর বিস্তৃত লেখার কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরে মানবিক মুজিব ও তাঁর ভেতরের অগ্নিগিরির জ্বালামুখের সন্ধান করার ক্ষুদ্র চেষ্টা থেকেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। জাতির পিতার তিনটি বই থেকে দুটি বই (অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও কারাগারের রোজনামচা) নিয়ে প্রবন্ধের স্বপ্ন পরিসরে টুকরো টুকরো কিছু আলোচনা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থে কত রঙের, কত রূপের, কত প্রকরণের এক মানুষকে যে পাওয়া যায়! বইটি যিনিই পড়েছেন তিনিই সম্যক জানতে পেরেছেন মুজিব মানসের নানা ধরনের অভিব্যক্তি, ভাবনা এবং নিজ মাটির প্রতি অন্তর্গত দৃঢ় অঙ্গীকার সম্পর্কে। সেই বয়ানে পাওয়া যায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, দৃঢ়চেতা এবং মানবিক শেখ মুজিবকেও। যুগে যুগে কিছু মানুষ আসেন, যাঁদের নেতৃত্ব দর্শন পাল্টে দেয় পৃথিবীকে, দেশকে–এমনকি দেশের মানুষকেও। তাঁদের আলোতে আলোকিত হয় মানুষ ও দেশ। শ্লাঘার সাথে বাংলার জনগণ বলতে পারে, আমাদের একজন আছেন এমন, যাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯২১ সালে 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়' নির্মাণের প্রাক্কালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্কটল্যান্ডের নগর পরিকল্পনাবিদ ও নকশাবিদ স্যার প্যাট্রিক গিডেসকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে একটি জায়গায় তিনি লিখেছিলেন, আমি সেই মানুষ খুঁজছি, যাঁর মধ্যে থাকবে যথার্থ চিন্তা, যাঁর অনুভব হবে মহান এবং যাঁর আছে সঠিক সময়ে সঠিক কর্ম করার কৌশল জ্ঞান। রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত এই তিন বৈশিষ্ট্যই যোগ্য নেতৃত্বের গুণাবলি। তিনি হয়তো এখানে নেতৃত্ব সম্পর্কে সরাসরি কিছু লিখতে চাননি, কিন্তু তিনি না চাইলেও পরবর্তীকালে তাত্ত্বিকরা নেতৃত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে এই তিন বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। এই তিন গুণে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রনায়কগণ ইতিহাসের সৃষ্টি করেছেন কালে কালে। তাঁদের রাজনৈতিক দর্শন, রাষ্ট্রচিন্তা, আত্মত্যাগ আর আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ততা তাঁদের নিয়ে গেছে চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে। এই নেতারাই আবার কলম ধরেছেন তাঁদের মননের সাথে আমাদের পরিচয় করে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে। স্যার উইনস্টন চার্চিল

তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ The Second World War প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'It is not history, It is a contribution to the history'. বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ সৃষ্টি করে ইতিহাস গড়েছেন, তেমনি তাঁর জীবনী লিখে ইতিহাসকে বাড়তি কিছু দিয়ে গেছেন, এ কথা অনস্বীকার্য। আমাদের উপমহাদেশের অনেক রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়কও আত্মজীবনী লিখেছেন। মহাত্মা গান্ধী লিখেছেন, 'The Story of my experiments with truth'; জওয়াহেরলাল নেহেরু লিখেছেন, 'An Autobiography'; সম্রাট বাবরও লিখেছিলেন 'বাবরনামা'। নেলসন ম্যান্ডেলা লিখেছেন, 'Long Walk to Freedom'। এ রকম নজির যে ভূরি ভূরি, তা কিন্তু নয়। এই বিরল দৃষ্টান্তের মধ্যেও বিরল আমাদের জাতির পিতার তিনটি বই।

বঙ্গবন্ধুর বইগুলো মূলত সেই সময়ের শেখ মুজিবের রাজনৈতিক দর্শন ও নেতৃত্বের ধরন সম্পর্কে ধারণা দেয়। তাঁর দর্শন ও কৌশল সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্পষ্ট করেই স্বীকার করেছেন, 'যদি কোনো ভুল হয় বা অন্যায় করে ফেলি, তা স্বীকার করতে আমার কোনোদিন কষ্ট হয় নাই। ভুল হলে সংশোধন করে নেব, ভুল তো মানুষেরই হয়ে থাকে। আমি অনেকের মধ্যে দেখেছি, কোনো কাজ করতে গেলে শুধু চিন্তাই করে। চিন্তা করতে করতে সময় পার হয়ে যায়, কাজ আর হয়ে ওঠে না।... আমি চিন্তা-ভাবনা করে যে কাজটা করব ঠিক করি, তা করেই ফেলি। যদি ভুল হয় সংশোধন করে নেই।' আবারও গান্ধীর শরণাপন্ন হয়ে উল্লেখ করতে চাই, এখানেও তাঁর 'আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ' গ্রন্থে এমনটিই যেন লিখেছেন, 'যদি আমার লেখার মধ্যে পাঠকের কাছে আমার অহংকারের সপ্তম সুরের আভাস পায়, তবে তাঁরা অবশ্য জানবেন যে আমার সাধনার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে।' সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিরা তো এমনই। বঙ্গবন্ধু তৃণমূল পর্যায় থেকে রাজনীতির শীর্ষে উঠে আসেন। এটি কিছুতেই সহজসাধ্য ছিল না। এ জন্য তাঁকে অনেক পথ পাড়ি দিতে হয়। এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ১৯৭২ সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'চোঙ্গা মুখে দিয়ে রাজনীতি করেছি, রাস্তায় হেঁটেছি, ফুটপাতে ঘুমিয়েছি। বাংলাদেশে এমন কোনো মহকুমা নেই, এমন কোনো থানা নেই, যেখানে আমি যাইনি।' বাঙালির মুক্তি আন্দোলনের অবিসংবাদিত এই নেতার মূল দর্শন ছিল গণতন্ত্র, সাম্য, অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত তাঁর রাজনীতির গুরু গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আধুনিক পাশ্চাত্য রাজনীতির পরিশীলিত নিয়মতান্ত্রিক ধারা; আবুল হাশিম, শরৎ বসু, কিরণশঙ্কর রায়ের অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদভিত্তিক

রাজনীতি; নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের রাজনীতির প্রতি তীব্র আকর্ষণ; নজরুল ও হুমায়ুন কবিরের সান্নিধ্যের প্রভাবে রাজনীতি ও সংস্কৃতির চমৎকার সমন্বয় ঘটিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বাধীন রাজনীতির গতিপথ বিনির্মাণে এগিয়ে গিয়েছিলেন। আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু সেই সময়ের ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি তুলে ধরার পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের চাপিয়ে দেওয়া বৈষম্য, নির্যাতন এবং অধিকার ও সম্পদ লুট করার জ্বলজ্বলে চিত্র তুলে ধরেছেন।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকারের অপশাসন, ভাষা আন্দোলন, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা, যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন, আদমজীর দাঙ্গা, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক শাসন ও ষড়যন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ এবং এসব বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনায় সমৃদ্ধ হয়েছে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'। সঙ্গে রয়েছে তাঁর বংশপরিচয়, শৈশবকাল এবং শিক্ষাজীবনের নির্মোহ বর্ণনা। 'মানুষ স্বার্থের জন্য অন্ধ হয়ে যায়'–এ উপলব্ধিই বুঝিয়ে দেয় বঙ্গবন্ধুর আত্মত্যাগের মূল দর্শনের মতো কোথায় বাধা। বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর সচেতনতা এবং এই অঞ্চলের মানুষের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা ছিল খুবই তীক্ষ্ণ ও সুগভীর। বিভিন্ন সময়ে তাঁর ভাষণেও এর প্রকাশ দেখা যায়। ১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষ ও অগণিত মানুষের মৃত্যু বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লেখেন, 'যুদ্ধ করে ইংরেজ, আর না খেয়ে মরে বাঙালি; যে বাঙালির কোনো কিছুরই অভাব ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলাদেশ দখল করে মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায়, তখন বাংলার এত সম্পদ ছিল যে একজন মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ী গোটা বিলাত শহর কিনতে পারত।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ১৮) বাঙালিদের প্রতি বৈষম্য, বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁর ভেতরে কীভাবে এক আগ্নেয়গিরির জন্ম নিচ্ছে ধীরে ধীরে, তা এসব লেখনীর মধ্য দিয়ে মূর্ছিয়ে ওঠে।

অসাম্প্রদায়িক চরিত্র ও নেতৃত্বের কারণে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ভক্ত হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবোধ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি ব্রিটিশবিরোধী ত্যাগী ও কারা নির্যাতন ভোগকারী সংগ্রামীদের প্রসঙ্গ টেনে লেখেন : জীবনভর কারাজীবন ভোগ করেছে ইংরেজকে তাড়াবার জন্য। এই সময় যদি এই সকল নিঃস্বার্থ স্বাধীনতাসংগ্রামী ও ত্যাগী পুরুষরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাথে সাথে হিন্দু ও মুসলমানদের মিলনের চেষ্টা করতেন এবং মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার ও জুলুম হিন্দু জমিদার ও

বেনিয়ারা করেছিল, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন, তাহলে তিক্ততা এত বাড়ত না।' (বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী, প. ১৮) আওয়ামী মুসলিম লীগের নামকরণের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এভাবে ব্যক্ত করেন, 'আমি মনে করেছিলাম, পাকিস্তান হয়ে গেছে, সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দরকার নাই। একটা অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হবে, যার একটা সুষ্ঠু মেনিফেস্টো থাকবে।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ১২১)। সকল ধর্মের সহাবস্থান ও মর্যাদা নিশ্চিত করাই ছিল তাঁর মূলমন্ত্র। দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তিনি যেমন তাঁর জীবনী ও রোজনামচা লিখতে গিয়ে বারবার দুস্থ ও গরিবের প্রসঙ্গ এনেছেন, তেমনি তাঁর বিভিন্ন ভাষণেও দ্ব্যর্থহীনভাবে তাঁর অবস্থান জানিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি টাঙ্গাইলে, তিনি তখন আমাদের জাতির পিতা, এক জনসভায় বলেছিলেন, "বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা হবে। শোষকদের আর বাংলাদেশে থাকতে দেওয়া হবে না। গরিব হবে এই রাষ্ট্র এবং এই সম্পদের মালিক, শোষকরা হবে না। এই রাষ্ট্রে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ থাকবে না। এই রাষ্ট্রের মানুষ হবে বাঙালি। তাদের মূলমন্ত্র– 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। কিন্তু এর অর্থ বিশৃঙ্খলা নয়।" বঙ্গবন্ধুর মানস নির্মিতি ও রাজনৈতিক চিন্তার বিকাশ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা পাওয়া যায় তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচায়'। ছাত্রাবস্থায় মাদারীপুরে স্বদেশ আন্দোলনকারী ও তাঁদের নেতা অধ্যক্ষ পূর্ণেন্দু দাসের মুক্তিতে কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'পূর্ণ অভিনন্দন' কবিতা ও তাতে 'জয় বাংলা'র উল্লেখ এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পার্টির সাথে যোগাযোগের কারণে তাঁর মনোজগতে প্রগতিশীলতা ও অসাম্প্রদায়িকতার বীজমন্ত্র রোপিত হতে থাকে। পাশাপাশি নিয়মিত দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা, কবি নজরুল ও কবি হুমায়ুন কবিরের সাথে সখ্যতা তাঁর শুদ্ধ সংস্কৃতি মনস্কতা সৃষ্টিতে জোরালো ভূমিকা রাখে। তিনি হতে থাকেন পুরোপুরি এক বিশুদ্ধ বাঙালি।

বাংলার নদী, বাংলার জল, খাবার, বাংলার গান, বাংলার উর্বর জমি আর নৈসর্গিক সৌন্দর্য তাঁকে সব সময় বিমোহিত করত। একবার এক অনুষ্ঠান শেষে নদীপথে নৌকা দিয়ে ঢাকার উদ্দেশে আসছিলেন। বাংলার শ্রেষ্ঠ লোকসংগীতশিল্পী আব্বাসউদ্দীন ছিলেন সহযাত্রী। পথে আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠে ভাটিয়ালি গান শুনে তিনি খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি লেখেন, 'নদীতে বসে আব্বাসউদ্দীন সাহেবের ভাটিয়ালি গান তাঁর নিজের গলায় না শুনলে জীবনের

একটা দিক অপূর্ণ থেকে যেত। তিনি যখন আস্তে আস্তে গাইতেছিলেন তখন মনে হচ্ছিল, নদীর ঢেউগুলিও যেন তাঁর গান শুনছে।' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'কারাগারের রোজনামচা'য় ভূমিকা লিখতে গিয়ে লিখেছেন, 'বাংলার মানুষ যে স্বাধীন হবে, এ আত্মবিশ্বাস বারবার তাঁর (বঙ্গবন্ধু) লেখায় ফুটে উঠেছে। এত আত্মপ্রত্যয় নিয়ে পৃথিবীর আর কোনো নেতা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছেন কি না জানি না।'

'কারাগারের রোজনামচা'য় ৭ জুন, ১৯৬৬ বঙ্গবন্ধু লিখলেন, '...জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করেছে। তারা ছয় দফা সমর্থন করে আর মুক্তি চায়, বাঁচতে চায়, ব্যক্তি স্বাধীনতা চায়। ...এ খবর শুনলেও আমার মনকে বুঝাতে পারছি না। একবার বাইরে একবার ভিতরে, খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। বন্দি আমি, জনগণের মঙ্গল কামনা ছাড়া আর কী করতে পারি। তাঁর হাত দিয়ে বাঙালি যেমন নিজের রাষ্ট্র পেয়েছে, তেমনি পেয়েছে মানুষের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার আদর্শ। এই তিনিই তো ১৯৭১-এর ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই।' সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, অসীম আত্মবিশ্বাস, গভীর দেশপ্রেম ও ত্যাগের মানসিকতার পাশাপাশি মানুষের ভালোবাসা বঙ্গবন্ধুকে স্বীয় স্থানে পৌঁছে দেয়। এ কারণেই বঙ্গবন্ধু আজ 'জীবিতের চেয়েও অধিক জীবিত'।

ভারতের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালাম তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'The Wings of Five'-এ লিখেছেন, 'আমরা সবাই আমাদের ভেতরে এক স্বর্গীয় আগুন নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। আমাদের উচিত, এই আগুনে ডানা জুড়ে দিয়ে সেই আলোর মহিমায় পৃথিবীকে মহিমান্বিত করে দেওয়া।' ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় এক ছোটো আগুনের ফুলকি নিয়ে জন্ম নেওয়া শেখ মুজিবুর রহমান খোকা। তাঁর অন্তর্গত ফুলকিকে প্রজ্বলিত মশালে রূপ দিয়ে শুধু বাংলাদেশ নয়, পুরো বিশ্বকে আলোকিত করেছিলেন। এই ধ্রুব সত্য তাঁর শত্রুরাও অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য। কবি জসীমউদ্‌দীন তো তাঁকে নিয়েই লিখেছেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান/যেন বিসুভিয়াসের অগ্নি-উগারী বান'।

লেখক : সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

তথ্যপ্রবাহ দুর্নীতি হ্রাস করে

সাঈদ হাসান

বরিশালের বানারীপাড়ার সিদ্দিকুর রহমান তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আওতায় বানারীপাড়া উপজেলার ২ নং ইলুহার ইউনিয়নের চল্লিশ দিনের কর্মসূচির বিভিন্ন প্রকল্পের ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ, সিপিসির নাম, মাস্টাররোল, লেবারদের তালিকা ইত্যাদি তথ্য চেয়ে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিকট বিধি মোতাবেক আবেদন করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পেয়ে তিনি ১২.১২.২০১৯ তারিখে বরিশাল জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষের (আরটিআই) নিকট আপিল আবেদন করেন। তথ্য অধিকার আইনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না পেয়ে জনাব সিদ্দিকুর রহমান ৫ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বিধি মোতাবেক তথ্য কমিশনে অভিযোগ করেন। তথ্য কমিশনের ৩ মার্চ ২০২০ তারিখের নিয়মিত সভায় অভিযোগটি পর্যালোচনান্তে শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়। করোনা ভাইরাস মহামারির কারণে সরকার কর্তৃক সাধারণ ছুটি ঘোষণা হওয়ায় নির্ধারিত তারিখে শুনানি সম্ভব না হওয়ায় পরবর্তীতে ২৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখে শুনানির দিন ধার্য করা হয়। সময় আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন ১২ নভেম্বর ২০২০ পুনরায় শুনানির দিন ধার্য করেন এবং ওই দিন উভয়পক্ষকে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে (Zoom Apps ব্যবহার করে) হাজির হয়ে বক্তব্য রাখার জন্য সমন জারি করা হয়; কিন্তু নির্ধারিত সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ হাজির থাকায় পুনরায় ১২ ডিসেম্বর ২০২০ শুনানির জন্য দিন ধার্য করা হয়। নির্ধারিত সময়ে উভয়পক্ষ Zoom Apps-এর মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন। উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনে তথ্য কমিশন তথ্য প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাকে সাত কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য প্রদানের নির্দেশ দেন। এ ছাড়া তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাকে অসহযোগিতার জন্য তিন হাজার টাকা জরিমানা করেন। তথ্য কমিশনের এটি একটি নিয়মিত কার্যক্রম। করোনা অতি মহামারির সময়ও তথ্য কমিশন তাদের প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতাসহ নানা সমস্যার মধ্যেও তথ্য অধিকার আইনের আওতায় জনগণের অধিকার আদায়ে নিয়মিত কাজ করেছেন এবং করছেন।

দেশে ১১০০-এর বেশি আইন আছে। এসব আইনে নাগরিকরা কী করতে পারবে, আর কী করতে পারবে না বা কতটুকু করতে পারবে, তা উল্লেখ আছে। এসব আইন জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করে। তথ্য অধিকার আইন এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। এই আইনের অধীনে তথ্য না দিলে বা বাধা দিলে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তি দেওয়ার বিধান রয়েছে। জনগণকে যে সকল সেবা দেওয়ার জন্য সরকারি, বেসরকারি বা বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত সংস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে তারা সঠিকভাবে জনগণকে সেবা দিচ্ছে কি না বা জনগণ সে সুবিধা যথাযথভাবে পাচ্ছে কি না, তা জানার অধিকার তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে জনগণকে দেওয়া হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে জনগণের নিকট জবাবদিহির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটি জনবান্ধব আইন। শুধু আটটি জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ব্যতীত সকল সরকারি, বেসরকারি এবং বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত সংস্থাতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা তথ্য অধিকার আইনের মূল লক্ষ্য। এ আইনের ৭ ধারায় উল্লিখিত বিষয় ব্যতীত সকল তথ্য জনগণকে দেওয়া বাধ্যতামূলক। এ ছাড়া ৬ ধারা অনুযায়ী জনগণের নিকট সহজলভ্যভাবে তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আইনের ১০ ধারা অনুযায়ী সকল দপ্তরে তথ্য প্রদানের জন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য না দিলে আপিল করার সুযোগ আছে। আপিল কর্মকর্তা ও নির্ধারণ করে দেওয়া আছে। আপিল কর্মকর্তার কাছে প্রতিকার না পেলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করার সুযোগ আছে। বরিশালের বানারীপাড়ার সিদ্দিকুর রহমান তথ্য অধিকার আইনের এই সুযোগ গ্রহণ করেছেন এবং প্রতিকার পেয়েছেন। বিবেচ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছিল কি না সেটি মূল বিষয় না, মূল বিষয় হলো তথ্য না দেওয়ার মানসিকতা। সমাজের সকল ক্ষেত্রে এ মেসেজটি দেওয়া সম্ভব হলে সকলেই স্বচ্ছতার সাথে বিধি মোতাবেক কাজ করতে বাধ্য হবে এবং জবাবদিহি নিশ্চিতের মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস পাবে। তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে কোনো কর্তৃপক্ষ সহজলভ্যতাকে সংকুচিত করতে পারবে না–এ বিষয়ে তথ্য কমিশনের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

গণশুনানির মাধ্যমেও দুর্নীতি হ্রাস করা সম্ভব। সরকারি দপ্তরগুলোতে নিয়মিত সেবাগ্রহীতাসহ সকল স্তরের জনগণের উপস্থিতিতে গণশুনানির

আয়োজন করা হয়। সেবাগ্রহীতাদের মতামত ও পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে থাকে। তবে করোনাকালে সরাসরি গণশুনানির আয়োজন আগের মতো সম্ভব হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে ভার্চুয়ালি গণশুনানির আয়োজন করা যেতে পারে। তথ্য জনগণকে সচেতন করে, ক্ষমতায়িত করে এবং দুর্নীতি হ্রাস করে। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী, সকল দপ্তরে স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক। এ জন্য স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য গণশুনানির মাধ্যমেও দুর্নীতি হ্রাস করা সম্ভব। সরকারি দপ্তরগুলোতে নিয়মিত সেবাগ্রহীতাসহ সকল স্তরের জনগণের উপস্থিতিতে গণশুনানির আয়োজন করা হয়। সেবাগ্রহীতাদের মতামত ও পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে থাকে। তবে করোনাকালে সরাসরি গণশুনানির আয়োজন আগের মতো সম্ভব হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে ভার্চুয়ালি গণশুনানির আয়োজন করা যেতে পারে। তথ্য জনগণকে সচেতন করে, ক্ষমতায়িত করে এবং দুর্নীতি হ্রাস করে। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সকল দপ্তরে স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক। এ জন্য স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০১৪ জারি করা হয়েছে। টিআইবির গবেষণা অনুযায়ী, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে বেসরকারি সংস্থার চেয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বেশ এগিয়ে আছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১৬.৬-এ উল্লেখ করা হয়েছে 'সকল পর্যায়ে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার মাধ্যমে কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ঘটানো'। সবার জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ প্রদান করা এবং সর্বস্তরে কার্যকর জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের সহায়ক শক্তি হিসেবে তথ্য কমিশন ভূমিকা রাখছে। দুর্নীতিকেই বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ ছাড়া দুর্নীতিকে বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবেও দেখা হয়। কারণ উন্নত, উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত সকল দেশেই দুর্নীতি রয়েছে। তবে উন্নত দেশগুলো তাদের নাগরিকদের সচেতন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে। এসব দেশে তথ্যের আদান-প্রদান এবং তথ্যের চাহিদা বৃদ্ধি বজায় রাখার মাধ্যমে দুর্নীতিকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, ঠিক তেমনই সুশাসনও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

দুর্নীতিবিরোধী গণসচেতনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর ও অধিদপ্তরগুলো দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত গঠনের লক্ষ্যে জনগণকে সচেতন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

করছে। তার পরও বাস্তবতা হচ্ছে দুর্নীতির মাত্রা জন আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কমেনি। তবে আশার কথা হলো, মানুষ দুর্নীতিকে ঘৃণা করে, সমাজের সকল স্তর থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কমবেশি প্রতিবাদ হচ্ছে, সবাই কথা বলছেন। দুর্নীতি দমন কমিশনও সীমিত সম্পদ নিয়ে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আইন ও বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে। এ ছাড়া দুর্নীতি দমন কমিশন সমাজে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

দেশের মোট জনসমষ্টির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ তরুণ। এই বিশালসংখ্যক যুবসমাজই আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের দুর্নীতিমুক্ত রাখতে পারলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক হবে। সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টার মাধ্যমে দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, এটা একটা যুদ্ধ, আর তাই এ যুদ্ধে আমাদের সকলকে এক হয়ে কাজ করতে হবে।

লেখক : উপপরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিস, চট্টগ্রাম

টেকসই আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সরকারের অঙ্গীকার

রেজাউল করিম সিদ্দিকী

৪ অক্টোবর বিশ্ব বসতি দিবস। বিশ্বব্যাপী মানুষের নিরাপদ ও বাসযোগ্য আবাসন নিশ্চিত করতে সর্বস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৮৬ সাল থেকে UN Habitat-এর উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব বসতি দিবস পালন করা হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে Accelerating Urban Action for a Carbon Free World. যার বাংলা অর্থ করা হয়েছে 'কার্বনমুক্ত বিশ্ব গড়তে নগরায়ণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করি'।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশ। এক লাখ ৪৮ হাজার ৪৬০ বর্গকিলোমিটার ক্ষুদ্র আয়তনের এই দেশে প্রায় ১৭ কোটি লোকের বাস। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করা একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। উপরন্তু ক্রমবর্ধিষ্ণু অর্থনীতি, দ্রুত নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে পরিবেশদূষণ এবং ব্যবহারযোগ্য জমির পরিমাণ দ্রুত কমে আসা এ চ্যালেঞ্জকে বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণে। তথাপি সরকার এবং দেশের আপামর জনসাধারণ এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সর্বদা সচেষ্ট ও তৎপর রয়েছে। দেশের সকল নাগরিকের জন্য টেকসই ও মানসম্মত আবাসন নিশ্চিত এবং পরিকল্পিত নগরায়ণ ও উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

সুশাসন নিশ্চিত করতে সরকারি কর্মচারীদের উন্নত কর্মপরিবেশ ও নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত করা অপরিহার্য। জাতিসংঘ প্রণীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (Sustainable Development Goal) [SDG] টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ১১ অনুয়ায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সরকারি, বেসরকারি, ছিন্নমূল সকল নাগরিকের জন্য আবাসনের সুব্যবস্থা করার নিমিত্ত অধীনস্থ সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিশেষ করে রাজধানী ঢাকায় কর্মরতদের আবাসনসংকট দীর্ঘদিনের। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ইতিপূর্বে সরকারি আবাসন ৮ শতাংশ হতে ৪০ শতাংশে

উন্নীত করার জন্য অনুশাসন দেন। উক্ত অনুশাসনের প্রেক্ষিতে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও এর অধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বহুতল ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে, যাতে একই সাথে বিপুলসংখ্যক মানুষের আবাসনের ব্যবস্থার পাশাপাশি ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

প্রকল্পগুলির মধ্যে আজিমপুর, মতিঝিল ও মালিবাগ সরকারি কলোনিতে বহুতল ভবন নির্মাণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য তেজগাঁওয়ে আবাসিক ভবন নির্মাণ এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য মিরপুরে আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প অন্যতম। এ ছড়া এ সময় জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত বস্তিবাসীদের জন্য ভাড়াভিত্তিক ৩০০টি ফ্ল্যাটের বরাদ্দ প্রাপকদের নিকট বরাদ্দপত্র হস্তান্তর করা হয়।

জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ নিজস্ব অর্থায়নে ১৪৮ কোটি ৭৭ লাখ ৮৫ হাজার টাকা ব্যয়ে ঢাকার মিরপুর ১১ নম্বর সেকশনে ১৪ তলাবিশিষ্ট পাঁচটি ভবনে মোট ৫৩৩টি ফ্ল্যাট নির্মাণের লক্ষ্যে ২০১৮ সালের ১৬ জানুয়ারি একটি প্রকল্প হাতে নেয়। দুই একর জমির ওপর নির্মিত এসব অত্যাধুনিক ভবনে মাসিক, সাপ্তাহিক এমনকি দৈনিক ভিত্তিতে ভাড়া পরিশোধের মাধ্যমে বস্তিবাসী বসবাসের সুযোগ পাবে। ইতোমধ্যে ৩০০টি ফ্ল্যাট বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে এবং সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে বরাদ্দ প্রাপকদের নিকট এসব ফ্ল্যাটের বরাদ্দপত্র হস্তান্তর করা হয়।

জুন ২০২১ সালে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত ঢাকার মিরপুর, আজিমপুর, মতিঝিল ও মালিবাগে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বসবাসের জন্য নির্মিত ২৪৭৪টি অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসংবলিত ফ্ল্যাট উদ্বোধন করা হয়, যার মধ্যে ২৮৮টি ফ্ল্যাট গণপূর্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এবং ৫৮টি ফ্ল্যাট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বসবাসের জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও দিকনির্দেশনায় নির্মিত এসব ভবনে ব্যবহার করা হয়েছে অত্যাধুনিক নির্মাণসামগ্রী। জানালায় তাপ প্রতিরোধী থাই গ্লাস, উন্নত ফিটিংস ও টাইলসকৃত ফ্লোরসহ আধুনিক নির্মাণ প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে এসব ভবনে। রয়েছে নিজস্ব অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, জরুরি ফায়ার এক্সিট ও সুপরিসর বারান্দা ও কমন স্পেস। প্রকল্পসমূহে নিজস্ব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য স্থাপন করা হয়েছে স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট বা এসটিপি। রয়েছে রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেম ও প্রয়োজনীয়

সংখ্যক কার পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। পরিবেশ সুরক্ষা ও মনোরম পরিবেশ নিশ্চিত করতে এসব প্রকল্প এলাকায় বৃক্ষরোপণ ও জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন গণপূর্ত অধিদপ্তর বর্তমানে ৩৫টি মন্ত্রণালয়ের মোট ৩০৩টি প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করছে।

এ ছাড়া চলমান করোনাসংকট মোকাবিলায় করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় আইসিইউয়ের ভৌত অবকাঠোমো নির্মাণ, ডাক্তার-নার্সদের অস্থায়ী আবাসন ব্যবস্থা, হাসপাতালসমূহে PCR Laboraory-এর অবকাঠামো নির্মাণ, আইসোলেশন ইউনিট, কোয়ারেন্টাইন সেন্টার, করোনা ইউনিট স্থাপন, স্থাপনাসমূহের নিরবচ্ছিন্ন পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণসহ জীবাণুনাশক ছিটানো ইত্যাদি নানাবিধ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর স্বল্প সময়ে বাস্তবায়ন করেছে।

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পূর্বাচল নতুন শহর (ইউসুফগঞ্জ) প্রকল্প এলাকায় ইতোমধ্যে বিভিন্ন আকারের ২৪৮৫৯টি আবাসিক প্লট বরাদ্দ করা হয়েছে। পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এলাকায় (১৫ নম্বর সেক্টরে) ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভিত্তি, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে তাঁর উত্থিত তর্জনীর প্রায় ১৫০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট প্রতিকৃতি স্থাপনের মাধ্যমে উক্ত এলাকাটি ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান হিসেবে সর্বসাধারণের নিকট তুলে ধরার নিমিত্ত 'বঙ্গবন্ধু স্কয়ার নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পটি Asian Townscape Award, ২০১৯-এ ভূষিত হয়েছে। পূর্বাচল নতুন শহর (ইউসুফগঞ্জ) প্রকল্প এলাকায় পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের জন্য সম্প্রতি একটি বেসরকারি সংস্থার সাথে রাজউক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। প্রকল্প এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং পানি সরবরাহের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। ফলে দেশের প্রথম স্যাটেলাইট সিটি পূর্বাচল নতুন শহর মানুষের বসবাসের জন্য পূর্ণরূপে প্রস্তুত হবে।

জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৩৪টি আবাসন প্রকল্প চলমান। যার মধ্যে ৩২টি নিজস্ব অর্থায়নে এবং দুটি জিওবি ঢাকা প্রকল্প মহানগরীর বস্তিতে বসবাসকারী ভাসমান ও ছিন্নমূল মানুষের জন্য নিজস্ব অর্থায়নে 'মিরপুরস্থ সেকশন-১১-এ বস্তিবাসীদের জন্য ভাড়াভিত্তিক ৫৩৩ (পাঁচশত তেত্রিশ)টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প এবং বিশ্বব্যাংক ও জিওবি অর্থায়নে 'স্বল্প আয়ের মানুষের উন্নত জীবনব্যবস্থা' শীর্ষক প্রকল্প উল্লেখযোগ্য।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের পরিচালন ও উন্নয়ন খাতে এ বছর যথাক্রমে এক হাজার ৮০৩ এবং চার হাজার ৫৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মোট ১০৫টি প্রকল্প বর্তমানে চলমান, যার মধ্যে জিওবি/বৈদেশিক অর্থায়নে ৫৯টি এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে ৪৬টি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

আধুনিক ও টেকসই ভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে গণপূর্ত অধিদপ্তর অবিরত কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সচিবালয়সহ সকল সরকারি সংস্থার অফিস, কোয়ার্টার, বাসভবন, প্রতিটি জেলায় সার্কিট হাউসসহ কোর অফিসসমূহ নির্মাণ করছে গণপূর্ত অধিদপ্তর।

অন্যদিকে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সকল জেলা ও উপজেলা শহরের পরিকল্পিত নগরায়ণ ও উন্নয়নের জন্য প্রতিটি শহরের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের জন্য কাজ করছে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর। এ ছাড়া রাজধানীর নাম কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর সংস্থা দেশের পরিকল্পিত উন্নয়নসহ নাগরিকদের জন্য আবাসন নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড-২০২০ অনুমোদিত হয়েছে। রাজধানী ঢাকার জন্য ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান বা ড্যাপ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ সামলাতে রাজধানী ঢাকার বিকল্প হিসেবে দেশের প্রথম স্যাটেলাইট টাউন পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। এসব পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হলে দেশের ভূমির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতের পাশাপাশি প্রত্যেক নাগরিকের জন্য টেকসই নিরাপদ ও বাসযোগ্য আবাসন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। একই সাথে পরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে পরিবেশদূষণ এবং পরিবেশে কার্বন নিঃসরণ বহুলাংশে হ্রাস পাবে। ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণ ও তীব্রতা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা অনেকাংশে সমাধান করা সম্ভব হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

লেখক : সিনিয়র তথ্য অফিসার, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

বিশ্ব মান দিবস হোক ভোক্তার অধিকার

তারিক মোহাম্মদ

বিশ্ব মান দিবস (World Standards Day) প্রতিবছর ১৪ অক্টোবর আন্তর্জাতিকভাবে উদযাপন করা হয়। পণ্য, সেবা প্রভৃতির মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী কর্মরত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের অবদানের প্রতি সম্মান জানানোর জন্যই এই দিনটির অবতারণা। এই দিবসটি মূলত পণ্য, সেবা প্রভৃতির মানোন্নয়ন ও মান বজায় রাখার প্রতি কর্তৃপক্ষ, উদ্যোক্তা, উৎপাদনকারী, বিক্রেতা এবং ভোক্তাদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে পালন করা হয়।

১৯৪৬ সালের ১৪ অক্টোবর ইংল্যান্ডের রাজধানী লন্ডনে বিশ্বের ২৫টি দেশের মোট ৬৫ জন প্রতিনিধি বিশ্বব্যাপী পণ্য, সেবার মান বজায় রাখার জন্য একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মান নির্ধারক সংস্থার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন, যা পরের বছর থেকে International Organization for Standardization (ISO) নাম ধারণ করে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। ওই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতেই আইএসও ১৯৭০ সাল থেকে দিবসটি বৈশ্বিকভাবে পালন করে আসছে।

আন্তর্জাতিক মান সংস্থা (আইএসও) একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, যা বিভিন্ন দেশের মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে গঠিত। ১৯৪৬ সালে ১৪ অক্টোবর তারিখে লন্ডনে বিশ্বের ২৫টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পরের বছর ১৯৪৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি আইএসও প্রতিষ্ঠিত হয়। আইএসওর প্রধান কাজ শিল্প ও বাণিজ্যের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মান নির্ধারণ, প্রণয়ন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে মানের সনদপত্র প্রদান।

আইএসও (ISO) নিজেকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে, তবে মান প্রণয়নে এর ক্ষমতা অনেক বেশি এবং এর প্রণীত অধিকাংশ মান চুক্তি কিংবা জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়। এ কারণে অধিকাংশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আইএসও অনেক শক্তিশালী। বাস্তবে বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রের সরকারের সাথে আইএসওর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। বর্তমানে আইএসওর সদস্য সংখ্যা ১৬৫। আইএসওর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত।

আইএসওর সাথে ইন্টারন্যাশনাল ইলেকট্রো-টেকনিক্যাল কমিশনের (IEC) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, যারা ইলেকট্রনিক পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে রয়েছে। বিশ্বে অন্যান্য যে সকল আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা রয়েছে তাদের মধ্যে American Society of Mechanical Engineers (ASME), International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), International Telecommunication Union (ITU), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Internet Engineering Task Force (IETF) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের প্রধান মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম হলো বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই বিএসটিআই ১৯৭৪ সালে আইএসওর সদস্যপদ লাভ করে। বিএসটিআই শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, যা মূলত পণ্য ও সেবার গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে গঠিত। এই সংস্থার অনুমোদন ছাড়া কোনো পণ্য উৎপাদন ও বিক্রি করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

বিএসটিআই আইএসও ব্যতীতও বিশ্বের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মান নির্ধারক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করেছে, যার মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর লিগ্যাল মেট্রোলজি (ওআইএমএল); কোডেক্স আলিমেন্টারিয়াস কমিশন (সিএসি); ইন্টারন্যাশনাল ইলেকট্রো-টেকনিক্যাল কমিশন (আইইসি); এশিয়া প্যাসিফিক মেট্রোলজি প্রগ্রাম (এপিএমপি); এশিয়ান ফোরাম ফর ইনফরমেশন টেকনোলজি (এএফআইটি); স্ট্যান্ডিং গ্রুপ ফর স্ট্যান্ডারডাইজেশন, মেট্রোলজি, টেস্টিং অ্যান্ড কোয়ালিটি; আন্তর্জাতিক ওজন ও পরিমাপ ব্যুরো (International Bureau of Weights and Measures) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্যিক পণ্য মানসম্মতকরণে বিএসটিআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মান প্রণয়নে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগকে স্বীকৃতি দিতে প্রতিবছর আইএসও যে বিশ্ব মান দিবস উদযাপন করে তার সাথে সংহতি প্রকাশ করে বিএসটিআইয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশেও দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়। মান দিবস বিশ্ব অর্থনীতি ও মানবজীবনে মান প্রমিতকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির একটি সুযোগও বটে।

প্রতিবছর মান দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে চলমান বিষয়াদিকে ঘিরে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় "Shared Vision for a Better World - Standards for SDG's" অর্থাৎ 'সমন্বিত উদ্যোগে টেকসই উন্নত বিশ্ব বিনির্মাণে-মান'। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে সামাজিক ভারসাম্যহীনতা দূরীকরণ, টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রা সীমিতকরণ অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা। এ সকল লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনের সহযোগিতা ও সমন্বয় এবং সম্ভাব্য সকল উপকরণের সফল ব্যবহার ও প্রয়োগ। আন্তর্জাতিক মান ও সামঞ্জস্য নিরূপণ বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে সকলের সুরক্ষার জন্য অন্যতম হাতিয়ার। পৃথিবীর মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সকল ক্ষেত্রে মানসম্মত পণ্য উৎপাদন ও সেবা প্রদান নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

চলমান কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির পরিপ্রেক্ষিতে বৈশ্বিক সমাজসমূহের দৃঢ়ীকরণ, সংহতকরণ ও সমতা আনয়নে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টকে অন্তর্ভুক্ত করা আজ সময়ের দাবি। ক্ষতিগ্রস্ত সমাজ পুনর্নির্মাণে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই লক্ষ্যসমূহ অর্জনে আন্তর্জাতিক মান অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় অধিকতর প্রাসঙ্গিক।

পূর্ণাঙ্গ মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা সহযোগিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। জনগণের ক্ষমতায়ন না করা হলে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন কঠিন। সহযোগিতার শক্তির ওপর নির্ভর করেই আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সহায়তা করবে। অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও বৈশ্বিক মান পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট জাতিসংঘ কর্তৃক ২০১৫ সালে গৃহীত হয়, যা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে প্রতিস্থাপিত করে। ইহা 'এজেন্ডা-২০৩০' নামেও পরিচিত। কারণ এর মেয়াদ ২০৩০ সাল পর্যন্ত। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মোট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা এবং সর্বমোট ১৬৯টি সূচক রয়েছে। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত এসব লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জনের জন্য নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। সংক্ষেপে এই ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা হলো : (১) দারিদ্র্য দূরীকরণ (২) ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব ও খাদ্য নিরাপত্তা (৩) স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ (৪) গুণগত ও মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণ (৫) লৈঙ্গিক সমতা আনয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন (৬) সুপেয় পানির সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ (৭) দূষণমুক্ত জ্বালানি সহজলভ্যকরণ (৮) সর্বজনীন কর্মসংস্থান

ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (৯) উদ্ভাবন, অবকাঠামো নির্মাণ ও শিল্পায়ন (১০) সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ (১১) টেকসই নগরী ও বসবাসযোগ্য সমাজ (১২) দায়িত্বশীল উৎপাদন ও পরিমিত ভোগ (১৩) জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রা হ্রাসকরণ (১৪) সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ (১৫) স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষা প্রদান (১৬) শান্তি স্থাপন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ (১৭) অভীষ্ট বাস্তবায়নে বৈশ্বিক অংশীদারি ও পারস্পরিক সহযোগিতা।

সহযোগিতা ও সমন্বয়করণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যদি আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সুসংহত ও সামঞ্জস্য করা যায় তবে তা শেষ বিচারে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখবে। মান কেবল টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সাহায্যই করবে না বরং ত্বরান্বিত করবে। এ প্রসঙ্গে ভুলে যাওয়া যাবে না যে পৃথিবী চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের আবির্ভাবে তথ্য-প্রযুক্তির সর্বব্যাপী প্রসার এবং উৎপাদনব্যবস্থার যান্ত্রিকীকরণের কারণে মানবসমাজে যে অভিঘাত সৃষ্টি হবে তার জন্য এখন হতেই আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। বিশ্বায়নের কারণে অবধারিতভাবে যোগাযোগ প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন হয়েছে। বিশ্বায়ন ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আমাদের পরিচিত পৃথিবী এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন নিয়ে আসবে। পরিবর্তিত পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক মান এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং আরো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে।

বিশ্বায়ন উত্তর পৃথিবীতে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বব্যাপী প্রসারে আমদানি ও রপ্তানি পণ্যসমূহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে গমনাগমন করে। বাণিজ্য সম্প্রসারণে মান নিয়ন্ত্রণ ও মানসম্মতকরণ অতি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ অতিক্রমে 'মান' গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠবে।

পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রুত নগরায়ণ ও ত্বরিত বিশ্বায়ন সংঘটিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিশ্ব নেতৃত্ব ইতোমধ্যে কঠোর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। প্রযুক্তিগত বাধা অতিক্রম করে নবনব সুযোগ, সম্ভাবনা ও সমাধান উন্নয়নকল্পে মানসম্মতকরণ ও মানসমূহ নিয়ন্ত্রণ একটি নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। মানকরণ প্রথা ও পদ্ধতি চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উত্তর বিশ্বে জ্বালানি অপচয় রোধ এবং বায়ু, পানি ও ভূমির দূষণ রোধপূর্বক গুণগত মান বৃদ্ধি করে সার্বিকভাবে পরিবেশের মান উন্নতকরণে সহায়তা করবে।

পরিশেষে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলা যায়, বিশ্ব মান দিবস উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচি বিশেষায়িত অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে শিল্প উদ্যোক্তা, উৎপাদক, বিক্রেতা, কর্তৃপক্ষ এবং ভোক্তা সাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে। এই দিবসের তাৎপর্য অনুধাবন করার মাধ্যমে শিল্প উৎপাদক এবং আমদানি ও রপ্তানিকারকগণ মানসম্মত পণ্য উৎপাদন, বিক্রয় ও বিতরণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে প্রত্যাশিত সেবা প্রদানে অধিক মনোনিবেশ করতে পারেন। বাংলাদেশে সাধারণ ভোক্তাগণের আস্থা অর্জনের জন্য যদি বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউটশন (বিএসটিআই) অধিকতর দক্ষতা, জবাবদিহি ও দায়িত্বশীলতা প্রদর্শন করে তবে তা বিদেশি ও দেশীয় পণ্য ও সেবাসমূহের মান প্রণয়ন ও মানোন্নয়নের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের বিশ্বাস অর্জনে সক্ষম হবে।

লেখক : উপপরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট

প্রতিষ্ঠিত হোক সকল শিশুর অধিকার ও সুরক্ষা

মো. আলমগীর হোসেন

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তারাই আগামী দিনে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় নেতৃত্ব দেবে। জ্ঞানচর্চা ও প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে তুলবে সকলের জন্য কল্যাণকর নতুন বিশ্ব। তাই শিশুদের প্রতি আমাদের বিশেষভাবে যত্ন নেওয়া উচিত। তারা যেন সৃজনশীল, মননশীল এবং মুক্তমনের মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব বিশ্বের প্রতিটি মানুষের। বর্তমানে বিশ্বে মোট শিশুর সংখ্যা প্রায় ২২০ কোটি। এই শিশুদের অর্ধেকের বেশি কোভিড মহামারিতে স্কুল বন্ধ থাকায় পড়াশোনার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ও ৭০ লাখ শিশু চরম অপুষ্টির শিকার হয়েছে। শিশুশ্রমে জড়িত হয়েছে এক কোটি ৬০ লাখ শিশু। কোভিড-১৯ মহামারি ছাড়াও বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সময়ে শিশুরা যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দারিদ্র্য ও মানবসৃষ্ট বিভিন্ন দুর্যোগের শিকার হয়ে তাদের অধিকার ও সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

বাংলাদেশে শিশুদের কল্যাণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শিশুদের জন্য সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব দেবে। দেশ স্বাধীনের পূর্বে ১৯৫৮ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আইয়ুব খান জোর করেই দেশের ক্ষমতা দখল করে শেখ মুজিবসহ বহু নেতাকর্মীকে জেলে আটকে রাখেন। পাঁচ বছরের জন্য পুরো দেশের রাজনীতি বন্ধ করার নির্দেশ দেন। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বমুহূর্তে জাতির পিতা কর্মীদের নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'এই পাঁচ বছর তোমরা শিশু সংগঠন কচিকাঁচার মেলার মাধ্যমে কাজ করো। নিজেদের সচল রাখো।' বঙ্গবন্ধু ১৯৬৩ সালে ঢাকার প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে কচিকাঁচার মেলা আয়োজিত শিশু আনন্দমেলায় এসে বলেছিলেন, 'এই পবিত্র শিশুদের সঙ্গে মিশি মনটাকে একটু হালকা করার জন্য'। শিশুদের সান্নিধ্যে জাতির পিতার এই অনুভূতি থেকে উপলব্ধি করা যায় শিশুদের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা ও ভালোবাসার গভীরতা। সরকারি ও দলীয়

কাজে বঙ্গবন্ধু যখন বিভিন্ন সফরে যেতেন তখন চলার পথে কোনো শিশু দেখলে গাড়ি থামিয়ে সেসব শিশুর সাথে গল্প করতেন ও খোঁজখবর নিতেন। দুস্থ ও অসহায় শিশুদের পরম মমতায় কাছে টেনে নিতেন। কখনো কখনো নিজের গাড়িতে উঠিয়ে নিজের বাড়িতে বা অফিসে নিয়ে যেতেন। কাপড়, খেলনাসহ বিভিন্ন উপহার দিয়ে তাদের মুখে হাসি ফোটাতেন।

আজ থেকে ৬৯ বছর পূর্বে ১৯৫২ সালে চীনের পিকিংয়ে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে বঙ্গবন্ধু সেই শান্তি সম্মেলনে যোগদান করেন। শিশুদের উন্নয়নে চীন সরকারের গৃহীত কার্যক্রম ও সে দেশের শিশুদের উন্নয়ন কাছ থেকে দেখেছেন। জাতির পিতার সেই ভ্রমণ ভাবনার মধ্যেও ছিল তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন সোনার বাংলা। দেশের শিশুদের কীভাবে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা যায় সেসব ভাবনাও তিনি সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করেছেন 'আমার দেখা নয়াচীন' বইটিতে। তিনি স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে অভিজ্ঞতায় লিখেছেন, "ভদ্রলোক ইংরেজি জানেন। তার সাথে এক ঘণ্টা আলাপ হলো। তিনি আমাকে বললেন, বাধ্যতামূলক ফ্রি শিক্ষার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছি। প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে স্কুলে দিতে হয়। সরকার তাদের যাবতীয় খরচ বহন করে।" ('আমার দেখা নয়াচীন", পৃষ্ঠা ৬০)। চীনের নতুন ভবন, স্কুল নির্মাণ ও স্কুল শিশুদের দেখে জাতির পিতা তাঁর ভ্রমণ কথায় লিখেছেন, '...শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি দেখে ফিরে এলাম। খাওয়াপরা পেয়ে নয়াচীনের ছেলেমেয়েদের চেহারা খুলে গিয়েছে। মুখে তাদের হাসি, বুকে তাদের বল, ভবিষ্যতের চিন্তা নাই। মনের আনন্দে তারা খেলছে।' ('আমার দেখা নয়াচীন', পৃষ্ঠা ৬০)।

দীর্ঘ ৯ মাস সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পর জাতির পিতা শিক্ষার উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেন। বিশেষ করে সদ্য স্বাধীন দেশের শিশুদের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সকল শিশু যাতে শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে সে জন্য একসাথে লক্ষাধিক শিক্ষকের চাকরিসহ ৩৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয় করেন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করেন। সংবিধানের ১৭ নম্বর অনুচ্ছেদে গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। একই সাথে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ধ্বংস ও বিধ্বস্ত স্কুলগুলো

নতুনভাবে তৈরি ও সংস্কার করেন। বাংলাদেশ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে অনুস্বাক্ষর করে ১৯৮৯ সালে, যার ১৫ বছর পূর্বে জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করেন।

জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার শিশুদের নিরাপদে বেড়ে ওঠা, সুষম বিকাশ ও সুরক্ষার বিষয় গুরুত্বের সাথে বিভিন্ন আইন, নীতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। একসাথে ছাব্বিশ হাজার স্কুল ও এক লাখ বিশ হাজার শিক্ষকের চাকরি জাতীয় করেছেন। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ শিশুকেন্দ্রিক বাজেট বাস্তবায়ন করছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজিতে শিশুদের উন্নয়ন ও সুরক্ষায় যেসব লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে তা অর্জনে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মায়ের গর্ভাবস্থা থেকে ৩ বছর পর্যন্ত মা ও শিশুর পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি চালু আছে। কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য দূর করা এবং তাদের শিক্ষিত ও দক্ষ জনগোষ্ঠী রূপে গড়ে তুলতে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদানসহ নানামুখী কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই ও শিক্ষা উপকরণ তুলে দেওয়া হচ্ছে। দেশের বিদ্যালয়সমূহে নতুন আকর্ষণীয় ভবন নির্মাণ করছেন। ছাত্রীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পৃথক ওয়াশ রুম করা হয়েছে। স্কুলগুলোতে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এসব উদ্যোগের ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখন ভর্তির হার প্রায় শতভাগ, যা একদশক আগে ছিল মাত্র ৬১ শতাংশ। এর ফলে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার হার বেড়েছে বহুগুণ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত এক যুগ সরকার পরিচালনাকালে শিশুদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে যুগোপযোগী বিভিন্ন আইন, নীতি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন, যা দেশে শিশুদের উন্নয়ন ও বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে জাতীয় শিশুনীতি-২০১১, শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩, শিশু আইন-২০১৩, যৌতুক নিরোধ আইন-২০১৮, ডিএনএ আইন-২০১৪, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আইন-২০১৮ ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে 'বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন-২০২০, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন-২০২১ ও বাল্যবিয়ে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২০১৮ ২০৩০ প্রণয়ন

করেছেন। কন্যাশিশুর নারী শিক্ষার প্রসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক পিস ট্রি পুরস্কারে ভূষিত হন। ২০১৯ সালের জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে টিকাদান কর্মসূচিতে সফলতার স্বীকৃতিস্বরূপ গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনস অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন 'ভ্যাকসিন হিরো' হিরো পুরস্কার প্রদান করে। এ বছর জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে তিনি এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। মাননীয় প্রধামন্ত্রী শিশুদের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন এসব অর্জনতার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। অর্থনীতির সকল সূচকে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র্যমোচন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য দরকার শিশুদের উন্নয়নে বিনিয়োগ। শিশুদের ওপর বিনিয়োগ করলে তার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে দেশ ও সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন প্রত্যেক শিশুর অন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও নিরাপত্তার চাহিদা পূরণ ও তা নিশ্চিত করা। সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০-এ শিশুদের উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য যেসব অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে তা অর্জনে কাজ চলমান। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারের লক্ষ্য ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে একটা উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা। দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার এই পরিক্রমায় সরকার শিশুদের ওপর কাঙ্ক্ষিত বিনিয়োগ করছে। এই লক্ষ্যে সরকারের পনেরোটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ আশি হাজার কোটি টাকার শিশুকেন্দ্রিক বাজেট বাস্তবায়ন করছে। এই শিশুকেন্দ্রিক বাজেট বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার আগামী প্রজন্মকে মেধাবী ও দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলবে।

মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় শিশুর উন্নয়ন, সুরক্ষা, অধিকার প্রতিষ্ঠা, শিক্ষাসহ শিশুর সামগ্রিক উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি শিশু বিকাশ কেন্দ্র, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, প্রারম্ভিক মেধাবিকাশ কার্যক্রম, আবৃত্তি, সংগীত, চিত্রাঙ্কন, নৃত্যসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। ফলে আমাদের শিশুরা দেশ ও বিদেশে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অসামান্য সাফল্য অর্জন করছে। গত দেড় বছরে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে আমাদের শিশুরা ছিল ঘরবন্দি। তবে এই মহামারিতেও শিশুরা তাদের পড়াশোনা থেকে দূরে ছিল না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা নিয়ে গ্রামের শিশু শিক্ষার্থীটিও কোভিড-১৯ দুঃসময়ে ঘরে বসে পড়াশোনা চালিয়ে গেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আমরা কোভিড-১৯ মহামারি অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। দীর্ঘদিন পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হয়েছে। এখন শিশুদের পদচারণে মুখরিত শিক্ষাঙ্গন। শিক্ষার আলোয় বিকশিত হোক তাদের জীবন। সকল শিশুর জীবন হোক সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও নিরাপদ।

লেখক : সিনিয়র তথ্য অফিসার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বৈষম্য নয়, বন্ধন

মাহবুবুর রহমান তুহিন

'প্রবীণ' শব্দটি উচ্চারণ করতেই মনে পড়ে যায় জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী নচিকেতার সেই গানের কথা 'কেউ বলে বুড়ো ভাম, কেউ বলে পাজি, কেউ এইবার ব্যাটা মরলেই বাঁচি'। এ গান সমাজে প্রবীণদের তাচ্ছিল্যভরে দেখার একটি করুণ ছবি। এই গানেরই যেন একটি প্রতিউত্তর পাওয়া যায় সুমনের একটি গানে 'আজকে যে বেপোরোয়া বিচ্ছু, ঘরকুনো হয়ে যাবে কাল সে'। সময়ের সাথে আমরা অবিরাম হেঁটে চলেছি। সময় আমাদের শৈশব-কৈশোর, যৌবন-প্রৌঢ় ও বার্ধক্যে উপনীত করে। পর্যায়ে আসীন করে তাই প্রবীণদের অবহেলা নয়, তাঁদের বরণ করে নেওয়ার মানসিকতা জাগ্রত করতে হবে। প্রবীণদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি বার্ধক্যের বিষয়ে বিশ্বব্যাপী গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯১ সাল থেকে প্রতিবছর ১ অক্টোবর আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্ব প্রবীণ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে জাতিসংঘ। এ বছর প্রবীণ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, 'Digital Equity for All Ages'. অর্থাৎ 'সকল বয়সের জন্য প্রাযুক্তিক সাম্য' প্রযুক্তি এখন জনগণের ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র্যদূরীকরণের অন্যতম হাতিয়ার। এ হাতিয়ারকে কাজে লাগিয়ে সহজে ও সুলভে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ একদিকে যেমন জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য এনেছে, অন্যদিকে সময় ও অর্থের সাশ্রয় ঘটিয়েছে। এই বাড়তি সময় একদিকে নতুন নতুন চিন্তার দুয়ার উন্মোচন করেছে, অন্যদিকে প্রযুক্তি পুরো পৃথিবীকে একই প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসেছে। এই প্ল্যাটফর্মে তরুণরা যেমন নতুন নতুন গন্তব্য বেছে নিতে পারছে, প্রবীণদের জন্যও এই প্ল্যাটফর্মে প্রবেশের সুযোগ অবারিত করতে হবে। এখানে কোনো বিভেদ ও বৈষম্য করা যাবে না।

২০০২ সালে মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত ১৫৯টি দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে প্রবীণবিষয়ক দ্বিতীয় বিশ্ব সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনা ও রাজনৈতিক ঘোষণা গৃহীত হয়। এতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে 'সকল বয়সিদের জন্য উপযুক্ত একটি সমাজ নির্মাণের জন্য উন্নয়নের অধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা ও সকল ধরনের মানবাধিকার রক্ষা ও উন্নয়ন খুবই প্রয়োজন।'

এই সম্মেলনে যে এগারোটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় সেগুলো হচ্ছে (১) সকল প্রবীণ নাগরিকের মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের পূর্ণ বাস্তবায়ন, (২) নিরাপদ বার্ধক্য অর্জন এবং প্রবীণ বয়সে দারিদ্র্যদূরীকরণ এবং প্রবীণদের জন্য জাতিসংঘ নীতিমালা বাস্তবায়ন, (৩) নিজেদের সমাজে স্বেচ্ছামূলক কাজ ও আয়বর্ধকমূলক কাজের মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাপনে পরিপূর্ণ ও কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রবীণদের ক্ষমতায়ন, (৪) জীবনব্যাপী এবং শেষ জীবনেও সচ্ছল, আত্মপরিতৃপ্তি ও ব্যক্তিগত উন্নয়নে সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে, (৫) প্রবীণরা কোনো একক সমজাতীয় বস্তু নয় বিষয়টি স্বীকার করে তাদের জীবনব্যাপী শিক্ষা ও কমিউনিটি অংশগ্রহণের সুযোগ, (৬) প্রবীণরা যেন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার এবং ব্যক্তির নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত এবং তার বিরুদ্ধে সকল বৈষম্য ও সন্ত্রাস দূর করতে হবে, (৭) জেন্ডারকেন্দ্রিক বৈষম্য দূর করে প্রবীণদের মধ্যে জেন্ডার সাম্য প্রতিষ্ঠা করার অঙ্গীকার; (৮) সামাজিক উন্নয়নের জন্য পারস্পরিক সংহতি, আন্তঃপ্রজন্ম নির্ভরশীলতা ও পরিবারে স্বীকৃতি প্রদান, (৯) প্রতিরোধ ও পুনর্বাসনমূলক স্বাস্থ্যসেবা, সহায়তা এবং সামাজিক নিরাপত্তার সুযোগ থাকা, (১০) প্রবীণদের মধ্যে প্রাইভেট সেক্টর, সিভিল সোসাইটি ও সরকারের সব মহলের মধ্যে অংশীদারি গড়ে তোলার সহযোগিতা, (১১) উন্নয়নশীল দেশসমূহে অন্যান্যের মধ্যে বার্ধক্যের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত প্রতিক্রিয়াগুলো কেন্দ্র করে যন্ত্রপাতি আবিষ্কারসহ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে উৎসাহ প্রদান, এ ছাড়া আদিবাসী প্রবীণদের বিশেষ পরিস্থিতি ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় রেখে তাদের বক্তব্য কার্যকরভাবে প্রকাশের সুযোগ দেওয়া।

এই সম্মেলনে যে তিনটি নির্দেশনা কার্যকর করতে বলা হয়েছে সেগুলো হলো : (ক) প্রবীণ জনগোষ্ঠী ও উন্নয়ন, (খ) প্রবীণদের স্বাস্থ্য ও সচ্ছলতা বৃদ্ধি; (গ) প্রবীণদের জন্য সক্ষমতা ও সহায়তামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করা। সম্মেলনে ২৩৯টি সুপারিশ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই অবহেলিত, পশ্চাৎপদ ও বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে সংবিধানে তাদের অধিকারের কথা সন্নিবেশিত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুই স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে প্রবীণ হিতৈষী সংঘকে সুসংগঠিত করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। প্রবীণদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দেশ পরিচালনায় নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী চিন্তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

দেশে বর্তমানে তরুণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা তুলনামূলক বেশি হলে ও আর মাত্র তিন দশকের মধ্যে প্রবীণদের মোট সংখ্যা অপ্রাপ্তবয়স্কদের ছাড়িয়ে যাবে। ৬০ বছরের বেশি বয়সি মানুষকে দেশে প্রবীণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ হিসেবে বাংলাদেশে বর্তমানে মানুষের গড় আয়ু ৭১ বছরের বেশি। দেশে ২০৩০ সালের আগেই প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দুই কোটি ছাড়িয়ে যাবে, যার একটি বিশাল প্রভাব পড়বে শ্রমবাজারের ওপর। জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞদের অভিমত, ২০৪৭ সাল নাগাদ বাংলাদেশে অপ্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় প্রবীণদের সংখ্যা বেশি থাকবে। দেশে এখন ৬৮ শতাংশের বেশি মানুষ কর্মক্ষম; কিন্তু তিন দশক পর প্রবীণদের সংখ্যা আরো বেড়ে গেলে দেশের সার্বিক উৎপাদনেও একটি বড়ো ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

প্রবীণদের যদি সমাজের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে সমন্বিত করা না হয় তাহলে প্রবীণ জনগোষ্ঠী একসময় সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। বর্তমান হারে ২০৫০ সাল নাগাদ দেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় সাড়ে চার কোটি।

বাংলাদেশের সমাজনীতি ও সরকার মোটামুটি প্রবীণবান্ধব, বিশেষ করে দেশের বিরাট আকারের প্রবীণদের বাস্তব কল্যাণ বিধানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ উদ্যোগ, সাফল্য ও সুনাম প্রশংসনীয়। এ দেশে ১৯২৫ সালে ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত অবসরকালীন পেনশন ব্যবস্থার পর ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে যুগান্তকারী বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি প্রচলন, জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা-২০১৩ এবং মাতাপিতার ভরণপোষণ আইন-২০১৩ প্রণয়ন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স ৫৯-৬০ বছর করা, পেনশন সুবিধা সম্প্রসারণ, মাতাপিতাকে অন্তর্ভুক্ত করে পরিবারের সদস্য ৪ থেকে ৬ জনে উন্নীতকরণ, বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের প্রবীণ স্বাস্থ্যসেবা খাতে অনুদান বৃদ্ধি করাসহ প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠনের উদ্যোগ প্রবীণদের সুরক্ষায় সরকারের দায়বদ্ধতার প্রত্যক্ষ উদাহরণ।

দেশের বয়োজ্যেষ্ঠ দুস্থ ও স্বল্প উপার্জনক্ষম অথবা উপার্জনে অক্ষম বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে পরিবার ও সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে 'বয়স্ক ভাতা' কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। ২০০৯-১০ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ২০ লাখ থেকে বাড়িয়ে ২২ লাখ ৫০ হাজার এবং জনপ্রতি মাসিক ভাতার হার ২০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০ টাকায় উন্নীত করা হয়। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে ৪৯ লাখ বয়স্ক ব্যক্তিকে জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়।

বর্তমানে বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ এবং সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা হলো ২০১৩ সালে প্রণীত বাস্তবায়ন নীতিমালা সংশোধন করে যুগোপযোগীকরণ, অধিকসংখ্যক মহিলাকে ভাতা কার্যক্রমের আওতায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে মহিলাদের বয়স ৬৫ বছর থেকে কমিয়ে ৬২ বছর নির্ধারণ, উপকারভোগী নির্বাচনে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও অন্য জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্তকরণ, ডাটাবেইস প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ এবং ১০ টাকায় ভাতাভোগীর নিজ নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে।

কাউকে ফেলে রেখে নয়, বরং সবাইকে নিয়ে বিশ্বসমাজের প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অভিযাত্রা চলমান রাখতে হবে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য দলিলের মহাত্ম্য এখানেই। প্রবীণরা সমাজে বটবৃক্ষের মতো। তাদের সারা জীবনের অভিজ্ঞতা তরুণদের চলার পথের পাথেয়।

আজকের প্রবীণরাই তরুণ বয়সে জীবনকে তুচ্ছ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পরবর্তী প্রজন্মকে একটি স্বাধীন স্বদেশ উপহার দিয়েছে। এই তরুণরাই তারুণ্যের স্পর্ধিত অহংকারে সমস্ত ব্যারিকেড ভাঙার শপথ উচ্চারণ করেছে। রক্তস্নাত পলল ভূমিতে মুক্তির বীজ বপন করেছে। বুলেটের সামনে গিয়ে বলেছে 'জীবন যেখানে দ্রোহের প্রতিশব্দ, মৃত্যুই সেখানে শেষ কথা নয়'। সেই তরুণরাই আজকে প্রবীণ। আমাদের পথনির্দেশক। বয়সের ভারে ন্যুব্জ। তাদের অবহেলা মানে আমাদের আত্মা ও অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। তাই আজকের নবীনদের শেকড়সন্ধানী হতে হবে। তবেই তারা দেশের জন্য যেমন আরো নিবেদিত হবে এবং অগ্রজকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে শিখবে।

সময় তথ্য ও প্রযুক্তিনির্ভর। তথ্য-প্রযুক্তির নব নব আবিষ্কারে জীবনে এখন নবসুন্দর গতিধারা। এই গতিধারায় নবীন ও প্রবীণ–সবাই উদ্ভাসিত হবে। আমরা বলব, 'নবীন-প্রবীণ গড়বে দেশ, ডিজিটাল হবে বাংলাদেশ'।

লেখক : তথ্য অফিসার, প্রথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন : প্রয়োজন জনসচেতনতা

মোছা. সাবিহা আক্তার লাকী

'সবার জন্য প্রয়োজন জন্ম ও মৃত্যুর পরপরই নিবন্ধন'–এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এ বছর ৬ অক্টোবর পালিত হচ্ছে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার ২০১৮ সালের ৬ অক্টোবরকে 'জাতীয় জন্ম নিবন্ধন দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ৮০ শতাংশ জন্ম এবং মৃত্যু নিবন্ধন সম্পন্ন করতে 'জাতীয় জন্ম নিবন্ধন দিবস'কে 'জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস' ঘোষণা করা হয়। এ বছর দিবসটি উদ্‌যাপনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয় কেন্দ্রীয় পর্যায়সহ তৃণমূল পর্যায়ে আলোচনাসভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস পালনের ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে জনসচেতনতা তৈরিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করবে।

জন্ম নিবন্ধন প্রতিটি শিশুসহ বয়স্কদেরও একটি নাগরিক অধিকার। একটি শিশুর জন্ম নিজ দেশকে, বিশ্বকে আইনগতভাবে জানান দেওয়ার একমাত্র পথ জন্মের পর জন্ম নিবন্ধন করা। প্রথম জন্ম নিবন্ধনের অধিকার জাতিসংঘের শিশু সনদে (Convention on the Rights of the Child-CRC) স্পষ্ট উল্লেখ আছে। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের অনুচ্ছেদ ৭ অনুযায়ী, Every child to be registered immediate after birth. বাংলাদেশের জাতীয় শিশু নীতি-২০১১ অনুযায়ী, সকল শিশুর জন্মের পরপরই জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করতে হবে। এটি শিশুর মৌলিক অধিকার, রাষ্ট্রীয় অধিকার।

আজ থেকে কয়েক বছর আগেও জন্ম নিবন্ধন করা হতো মূলত বহির্বিশ্বে গমন বা বিশেষ প্রয়োজনে। যদিও জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন রয়েছে ব্রিটিশ আমল থেকেই; কিন্তু তার কার্যকারিতা ছিল খুবই নগণ্য। ১৮৭৩ সালে তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতে প্রথম জন্ম ও মৃত্যু বিষয়ক একটি আইন পাস হয়। এখন সময় পাল্টেছে। দেশের সব মানুষকে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের আওতায় আনতে ২০০১ সালে ইউনিসেফ-বাংলাদেশের সহায়তায় প্রকল্প শুরু হয়। তখন হাতে

লেখা জন্ম ও মৃত্যু সনদ দেওয়া হতো। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সরকার তা বাধ্যতামূলক করেছে। এ লক্ষ্যে সরকার নতুন করে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন-২০০৪ (সংশোধিত-২০১৩) প্রণয়ন করে। জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, শিশু অধিকার সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে আইনটি ৩ জুলাই, ২০০৬ থেকে কার্যকর করা হয়েছে।

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন অনুসারে, জন্ম নিবন্ধন হলো একজন মানুষের নাম, লিঙ্গ, জন্মের তারিখ ও স্থান, মা-বাবার নাম, তাঁদের জাতীয়তা এবং স্থায়ী ঠিকানা নির্ধারিত নিবন্ধক কর্তৃক রেজিস্টারে লেখা বা কম্পিউটারে এন্ট্রি প্রদান এবং জন্ম সনদ প্রদান করা। একইভাবে মৃত্যু নিবন্ধন হলো মৃত ব্যক্তির নাম, মৃত্যুর তারিখ, মৃত্যুর স্থান, লিঙ্গ, মাতা/পিতা বা স্ত্রী/স্বামীর নাম নির্ধারিত নিবন্ধক কর্তৃক কম্পিউটারে এন্ট্রি প্রদানসহ ডেটাবেইসে সংরক্ষণ ও মৃত্যু নিবন্ধন সনদ প্রদান করা। সাধারণত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, পৌরসভা/সিটি করপোরেশনের মেয়র বা মেয়র কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কাউন্সিলর বা অন্য কোনো কর্মকর্তা, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং দূতাবাসসমূহের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো অফিসার জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন করে থাকেন। পাশাপাশি br.lgd.gov.bd ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধকের কার্যালয় বরাবর অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন আবেদন করা যায়। আবেদনের প্রিন্ট কপি নিবন্ধন অফিসে দাখিল করলে নিবন্ধক জন্ম নিবন্ধন করতে পারবেন।

শিশু জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধন ফ্রি। জন্ম বা মৃত্যুর ৪৫ দিন পর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত নিবন্ধন ফি দেশে ২৫ টাকা, বিদেশে ১ ডলার। ৫ বছর পর নিবন্ধন ফি দেশে ৫০ টাকা, বিদেশে ১ ডলার। জন্মতারিখ সংশোধনের জন্য আবেদন ফি দেশে ১০০ টাকা, বিদেশে ২ ডলার। অন্যান্য তথ্য সংশোধন এবং বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় সনদের নকল সরবরাহের জন্য আবেদন ফি দেশে ৫০ টাকা, বিদেশে ১ ডলার। ২০১৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় দেশে-বিদেশে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের এ ফি নির্ধারণ করা হয়েছে।

জন্ম নিবন্ধন করা থাকলে একজন শিশু বা একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ বহু ধরনের সুবিধা পেতে পারে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন-২০০৪-এর ধারা ১৮ অনুযায়ী পাসপোর্ট ইস্যু, বিবাহবন্ধন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগদান, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু, ভোটার তালিকা প্রণয়ন, জমি রেজিস্ট্রেশন, জাতীয় পরিচয়পত্র, লাইসেন্স ইনস্যুরেন্স পলিসিসহ

বিভিন্ন ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। একইভাবে সাকসেশন সার্টিফিকেট প্রাপ্তি, পারিবারিক পেনশন প্রাপ্তি, মৃত ব্যক্তির লাইফ ইনস্যুরেন্স দাবি, নামজারি ও জমিজমা প্রাপ্তিতে মৃত্য সনদ জরুরি।

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বর্তমান সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সকল নাগরিকের একটি শুদ্ধ ডাটাবেইস প্রস্তুতকরণে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন তথ্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পদক্ষেপ হিসেবে, সবার জন্ম নিবন্ধন করতে ২০১০ সাল থেকে অনলাইন জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয়। সারা দেশে সরাসরি জন্ম নিবন্ধনের পাশাপাশি অনলাইনেও নিবন্ধন কার্যক্রম চলছে। শুধু অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন আবেদন ও সনদ ডাউনলোডই নয়, জন্ম নিবন্ধন যাচাইও করা যায় সহজেই। এখন যে কেউ মোবাইলে 'জন্ম তথ্য যাচাই' অ্যাপস ব্যবহার করে জন্ম নিবন্ধন অনলাইন কপি যাচাই করে দেখতে পারেন। সরকারের এমন যুগান্তকারী উদ্যোগে বন্ধ হয়েছে দ্বৈত নিবন্ধন কার্যক্রম।

বর্তমানে সরকার দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি মিশনসমূহের জন্য আলাদা আলাদা ৫টি জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালাসমূহকে একীভূত করে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৭ প্রণয়ন করেছে। পরবর্তীতে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন পদ্ধতি আরো সহজীকরণের লক্ষ্যে ২০১৭ সালে প্রণীত বিধিমালায় বেশ কিছু পরিবর্তন এনে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৮ জারি করা হয়, যা ৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে পূর্বের নির্দেশিকা রহিত করে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নির্দেশিকা ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে নেওয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ। ফলে সাম্প্রতিক সময়ে জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, বেড়েছে মৃত্যু নিবন্ধনের সংখ্যাও। নিবন্ধন রেজিস্ট্রার জেনারেল কার্যালয় সূত্র অনুযায়ী জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রমের শুরু থেকে ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে মোট জন্ম নিবন্ধন হয়েছে ১৭ কোটি ৬৪ লাখ ৪৭ হাজার ৫৩১ জনের। এর মধ্যে জন্মের ৫ বছরের মধ্যে নিবন্ধন হয়েছে ১ কোটি ৬৯ লাখ ১ হাজার ২১১ জনের। ২০২০ সালে জন্ম নিবন্ধন হয়েছে ৩৮ লাখ ৩৯ হাজার ২৮ জনের। শুরু থেকে ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে মোট মৃত্যু নিবন্ধন হয়েছে ৯৯ লাখ ৩৯ হাজার ৯০০ জনের। এর মধ্যে ২০২০ সালে মৃত্যু নিবন্ধন হয়েছে ৩ লাখ ৬৭ হাজার ৪০০ জনের।

বর্তমানে দেশ ও দেশের বাইরে মিলিয়ে ৫ হাজার ৫৩২টি জায়গা থেকে জন্ম নিবন্ধন করা যাচ্ছে। দেশের সব ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, পৌরসভা কার্যালয়, সিটি করপোরেশনের আঞ্চলিক কার্যালয়, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের পাশাপাশি বিদেশের বাংলাদেশি দূতাবাসে অনলাইনের মাধ্যমে জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

এই কার্যক্রমকে আরো বেগবান করতে এবং এসডিজি এবং এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশসমূহে গৃহীত সিআরভিএস (CRVS) দশকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, স্থানীয় সরকার বিভাগ যুগান্তকারী কিছু উদ্ভাবনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এখন স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত মাঠকর্মীদের নিকট থেকে নিবন্ধক কার্যালয়ের মাসিক সভায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিবন্ধক শিশুর জন্মের পূর্ব সময়ে পরিবারের নিকট অভিনন্দন বার্তাসহ জন্ম নিবন্ধন আবেদন ফরম প্রেরণ করবেন। অনুরূপভাবে ইউপি সদস্য, গ্রাম পুলিশ ও অন্যান্য সূত্রে মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তির পর নিবন্ধক শোকবার্তাসহ মৃত্যু নিবন্ধন আবেদন ফরম পরিবারের নিকট প্রেরণ করবেন। গ্রাম পুলিশ কর্মচারীর মাধ্যমে এই ফরম ও নিবন্ধন সনদ বিতরণ এবং আবেদনপত্র সংগ্রহ করা হবে। আশা করা যায়, এমন উদ্যোগ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমের সাফল্যে মাইলফলক স্থাপন করবে।

লেখক : তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

উদ্ভাবনের হাত ধরেই আগামীর পৃথিবীতেও ডাকসেবার প্রয়োজনীয়তা অব্যাহত থাকবে

ম. শেফায়েত হোসেন

ইতিহাসের পথরেখায় সংবাদ আদান-প্রদানে ডাকসেবার অভিযাত্রা আজ থেকে সাড়ে চার হাজার বছর আগে থেকে। দীর্ঘ এই পথপরিক্রমায় প্রাচীন মেসোপটেমিয়া হয়ে ব্যাবিলনীয় সভ্যতার পথ হেটে অগ্নিশিখা সংকেত, শিকারি কবুতর পাঠিয়ে কিংবা ঘোড়ার পিঠ রানারের ঝুলির যুগ থেকে স্যামুয়েল মোর্সের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি টরে-টক্কার যুগ অতিক্রম করেছে পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠনটি। হাজার বছরের বৈশ্বিক বিবর্তনের পথ বেয়ে ডিজিটাল প্রযুক্তি যুগে ডাকসেবা আজ প্রবেশ করেছে। সংবাদ আদান-প্রদানে প্রাচীনতম এই মাধ্যমটি সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে আজও তার অস্তিত্ব ধরে রেখেছে সগৌরবে। ডিজিটাল প্রযুক্তির কল্যাণে চিঠির যুগ শেষ হয়ে গেলেও ডাকসেবার প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়নি বরং উত্তরোত্তর এর প্রয়োজনীয়তা বেড়েই চলেছে এর বহুমাত্রিক ডিজিটাল সেবা প্রদানের বদৌলতে উদ্ভাবনের হাত ধরেই আগামীর ডিজিটাল শিল্প বিপ্লবের পৃথিবীতেও ডাকসেবার প্রয়োজনীয়তা অব্যাহত থাকবে।

ডাকসেবা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইউনিভার্সেল পোস্টাল ইউনিয়নের উদ্যোগে প্রতিবছর ৯ অক্টোবর বিশ্ব ডাক দিবস পালিত হয়ে আসছে। ১৮৭৪ সালের ৯ অক্টোবর সুইজারল্যান্ডের বের্নে ২২টি দেশের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে গঠিত হয় আন্তর্জাতিক পোস্টাল ইউনিয়ন। ইউনিয়ন গঠন করার মহেন্দ্রক্ষণটি স্মরণীয় রাখতে সংগঠনের পক্ষ থেকে ১৯৬৯ সালে ৯ অক্টোবরকে বিশ্ব ডাক দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বাংলাদশে ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ইউনিভার্সেল পোস্টাল ইউনিয়ন (ইউপিইউ) এবং আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদস্য পদ অর্জন করে। এর পর থেকে দেশে প্রতিবছর বিশ্ব ডাক দিবস পালিত হয়ে আসছ। বিশ্ব ডাক দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য হলো, 'I nnovate to recover' বা পুনরুদ্ধারে উদ্ভাবন।

কোভিড-১৯ অতিমারির কবল থেকে টিকা উদ্ভাবন বিশ্বকে রক্ষা পেতে সহায়তা করেছে। কোভিড সংকটের শুরুতে উদ্বেগ ছিল অতিমারি মোকাবিলায় টিকা উদ্ভাবিত হতে অনেক বছর সময় লাগবে। কিন্তু ব্যক্তি সংস্থা সর্বোপরি বিজ্ঞানী গবেষকদের নিরন্তর প্রচেষ্টায় এক বছরের মধ্যে এই টিকা উদ্ভাবিত হয়েছে। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধের নতুন আশা জাগিয়েছে। এই উদ্ভাবন কীভাবে মহামারি থেকে মানুষকে রক্ষা করেছে তা আন্তর্জাতিক ডাক খাত অনুকরণ করতে পারে। সেদিক থেকে এ বছরের প্রতিপাদ্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়েছে।

ডাকসেবার ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ১৮৪০ সালে পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম ডাকটিকিট ব্যবহার করা হয় ব্রিটেনে। তার এক যুগ বাদে ভারতীয় উপমহাদেশে ডাকটিকিটের প্রথম ব্যবহার শুরু হয় ১৮৫২ সালে তৎকালীন সিন্ধুপ্রদেশের কমিশনার স্যার বার্টেল ফেরির হাত ধরে। ওই ডাকটিকিটের নাম ছিল 'সিন্ডে ডক'। বছর দুয়েক ওই ডাকটিকিট চলার পর গোটা উপমহাদেশজুড়ে এক অভিন্ন ডাকব্যবস্থা চালু করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ওই ডাকটিকিটে ছিল কুইন ভিক্টোরিয়ার ছবি। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের সব ডাকটিকিটই হয় কুইন ভিক্টোরিয়া অথবা তাঁর উত্তরসূরিদের ছবি বহাল থাকত। ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সাথেও জড়িয়ে আছে ডাকসেবার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। 'আমরা কেবল অস্ত্র দিয়েই যুদ্ধ করিনি। সংস্কৃতিকর্মী, খেলোয়াড়, সাধারণ জনগণ ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমেও আমাদের যুদ্ধটা হয়েছে। ডাকটিকিটেও সেই লড়াইয়ের অংশীদার। ১৯৭১ সালের ২৯ জুলাই ভারতীয় নাগরিক বিমান মল্লিকের (বিমান চাঁদ মল্লিক) ডিজাইন করা আটটি ডাকটিকিট মুজিবনগর সরকার, কলকাতায় বাংলাদেশ মিশন ও লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। মুজিবনগর সরকার কূটনৈতিক প্রক্রিয়া হিসেবে স্বাধীনতার সপক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার জন্য এই উদ্যোগ গ্রহণ করে।

একাত্তরের ২৯ জুলাই মুজিবনগর সরকার এবং যুক্তরাজ্যের হাউস অব কমন্স থেকে প্রকাশিত আটটি স্মারক ডাকটিকিট বিশ্বে আমাদের জাতিসত্তা, রাষ্ট্রসত্তা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। এই দিবসটি কেবল ডাক অধিদপ্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে দিবসটিকে জাতীয় দিবস হিসেবে পালনের যৌক্তিকতা আছে। স্মারক এই ডাকটিকিটসমূহ কেবলই ইতিহাসের ধারক ও স্মারক নয়, এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তুলে ধরা হয়েছে, যা সারা দুনিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ইতিমধ্যে ডিজিটাল কমার্স যুক্ত করায় ডাক বিভাগ নতুনরূপে আবির্ভূত হচ্ছে।

ডিজিটাল প্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বকে একটি গ্লোবাল হাউসে পরিণত করেছে। প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ডাক সার্ভিসকে লাগসই প্রযুক্তিতে রূপান্তর করার বিকল্প নেই। দেশে দশ হাজার ডাকঘরে প্রায় ৪০ হাজার কর্মী ডাকসেবায় নিয়োজিত। চল্লিশ হাজার মানুষের আশি হাজার হাত এবং দেশব্যাপী ডাকঘরের বিস্তীর্ণ অবকাঠামো ও নেটওয়ার্ক জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠায় উপযোগী শক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে ডাকঘরকে ডিজিটাল করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। অনেক পুরাতন প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির অনেক ত্রুটি ও পশ্চাদপদতা আছে। বিদ্যমান পশ্চাদপদতা কাটিয়ে উঠতে ডাক অধিদপ্তরের সমস্ত কার্যক্রম ডিজিটাল করার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অবিসংবাদিত রাজনীতিক প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার চলমান সংগ্রাম সফল করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার অভিযাত্রায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বারের দিকনির্দেশনায় ডাক অধিদপ্তর সনাতনী পদ্ধতি থেকে ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করেছে। ডিজিটাইজেশন কর্মসূচির ফলে ডাক অধিদপ্তরে মোবাইল ফিন্যানশিয়াল সার্ভিস, ডিজিটাল মানিঅর্ডার, পোস্টাল ক্যাশকার্ড, ডিজিটাল কমার্স ইত্যাদি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। দেশে আট হাজার ৫০০ ডাকঘরকে ডিজিটাল ডাকঘরের রূপান্তরের ধারাবাহিকতায় দেশের তৃণমূল জনগোষ্ঠী সরকারের ২০০ ডিজিটাল সেবা পাচ্ছে। দেশব্যাপী ডাকঘরের সুবিশাল নেটওয়ার্ক ডিজিটাল কমার্সে নিয়োজিত বেসরকারি উদ্যোক্তাদের ব্যবহারের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রস্তুত করা হচ্ছে। এর ফলে দেশব্যাপী দ্রুত সময়ে শাকসবজিসহ পচনশীল পণ্য পরিবহন ও বিতরণ সম্ভব হবে। এই লক্ষ্যে ডাক পরিবহনের গাড়ি ও দেশের ৬৪টি জেলায় শর্টিং সেন্টারে হিমায়িত চেম্বার করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এর ফলে দেশে ডিজিটাল কমার্সের বিকাশে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হবে। ডিজিটাইজেশনের ধারাবাহিকতায় এক সময়ে অস্তিত্বের সংকটে পড়া ডাকঘর আজ জনগণের কাছে অত্যাবশ্যকীয় হিসেবে গড়ে উঠেছে। কোভিড-১৯ সৃষ্ট বৈশ্বিক অতিমারিতে থেমে যাওয়া জীবনযাত্রায় ডাকঘরের বিস্তীর্ণ পরিবহন নেটওয়ার্ক ও বিশাল অবকাঠামো মানুষের সেবায় কাজে লাগানো হয়েছে। বিনা মাশুলে কৃষকের সবজি, আম, লিচুসহ উৎপাদিত কৃষিপণ্য এবং কোভিড চিকিৎসা সরঞ্জাম দেশের প্রতিটি জেলায় পৌঁছে দিয়ে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির অভাবনীয় বিকাশ এবং এর প্রয়োগের ফলে প্রাচীন প্রতিষ্ঠান ডাক বিভাগ ঘুরে

দাঁড়াচ্ছে। ডাকঘরকে ডিজিটাল ডাকঘর হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি বিদ্যমান জনবলকে ডিজিটাল উপযোগী করে গড়ে তুলতে উদ্যোগ ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়।

ডিজিটাল কমার্সে করোনাকালীন লকডাউনে কেনাকাটা সচল রেখেছে এবং আগামী দিনগুলোতে ডিজিটাল কমার্সের চাপ অনেক বেড়ে যাবে। ডিজিটাল কমার্স শহরের পণ্য যেমন গ্রামে যাবে, ঠিক তেমনি গ্রামের পণ্য শহরে আসবে। উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষিত করতে পারলে ডিজিটাল কমার্সের ব্যাপক সক্ষমতা গড়ে তোলা সম্ভব। এই ক্ষেত্রে ডিজিটাল ডাকঘরের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ডিজিটাল সক্ষমতা তৈরি করতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এ বছর বিশ্ব ডাক দিবসের একটি বড়ো চমক হচ্ছে দিবসটি উপলক্ষে বিশ্বসেরা পত্র লেখককে সংবর্ধনা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ডাক অধিদপ্তর। বিশ্ব ডাক সংস্থা ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন (ইউপিইউ) আয়োজিত ৫০তম পত্র লিখন প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক লাভ করেছে সিলেট আনন্দ নিকেতন বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী নুবায়শা ইসলাম। আইভরি কোস্টের শহর আবিদজানে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৫০তম আন্তর্জাতিক চিঠি লিখন প্রতিযোগিতায় (এলএলডব্লিউসি) জয়ী হয়েছে কিশোরী নুবায়শা ইসলাম। নুবায়শা তার ছোটো বোন আমলের উদ্দেশে চিঠিটি লিখেছিলেন। গত ২৭ আগস্ট এক অনুষ্ঠানে বিজয়ী চিঠি লেখকের নাম ঘোষণা করে এলএলডব্লিউসি। 'করোনা ভাইরাসের মহামারিতে পরিবারের একজন সদস্যের প্রতি চিঠি'–এই প্রতিপাদ্যে লেখা চিঠি ক্যাটাগরিতে জয়ী ঘোষণা করা হয় নুবায়শা ইসলামকে। নুবায়শার এই অর্জনে উৎফুল্ল বাংলাদেশ। মাননীয় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার 'এটি আমাদের মেধার বিশ্বস্বীকৃতি' বলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

লেখক : তথ্য অফিসার, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব প্রতিরোধ

তানজিনা পারভিন

সম্প্রতি কুমিল্লায় একটি 'পূজামণ্ডপে কোরআন রাখার ঘটনা 'ঘটিয়ে' ও ফেসবুকে তা 'রটিয়ে' দেশব্যাপী অবিশ্বাস্য সাম্প্রদায়িক অপ্রীতিকর অরাজকতার সৃষ্টির অপচেষ্টা করা হলো। আমাদের দেশে এক শ্রেণির দুষ্ট লোক মাঝে মাঝে এ ধরনের ঘটনা সৃষ্টির চেষ্টা করে। এভাবে গুজব রটিয়ে অতীতেও বিভিন্ন সময়ে মানবাধিকার লঙ্ঘনের নানা দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাই এখনই যদি গুজবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে আমরা প্রতিরোধ না করি এবং জনসচেতনতা সৃষ্টি না করি তাহলে এই তালিকা আরো লম্বা হবে।

ফেসবুক বা যেকোনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা কোনো গণমাধ্যমে এমন কিছু লেখা বা পোস্ট করা বা স্ট্যাটাস দেওয়া বা মন্তব্য করা কিংবা ছবি বা ভিডিও আপলোড করা যা মানহানিকর, বিভ্রান্তিমূলক, অশালীন, অরুচিকর, অশ্লীল, আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্যে হয় তা 'সাইবার অপরাধ' বলে বিবেচিত হবে। এ ছাড়া দেশে অরাজক ও অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করতে, রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা সম্ভাবনা আছে এ রকম যেকোনো কমর্কাণ্ড কিংবা দেশবিরোধী কোনো কিছু অনলাইনে করলে তাও সাইবার অপরাধ হবে। এ ছাড়া অনলাইনে কারো নামে ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুললে বা হ্যাক করলে, ভাইরাস ছড়ালে, তথ্য চুরি করলে কিংবা ইলেকট্রনিক কোনো সিস্টেমে অনধিকার প্রবেশ করলে 'সাইবার অপরাধ' হবে। সাইবার অপরাধ হয়, এ রকম কোনো পোস্ট বা স্ট্যাটাস বা মন্তব্য বা ছবি বা ভিডিও শেয়ার, লাইক, কিংবা ট্যাগ দিলেও 'সাইবার অপরাধ' হতে পারে। অর্থাৎ অনলাইনে ইচ্ছাকৃতভাবে যেকোনো অপরাধমূলক কমর্কাণ্ড যা কেউ পড়লে বা দেখলে বা শুনলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে, যার মাধ্যমে মানহানি ঘটে, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা বা করতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উসকানি প্রদান করাসহ সবই 'সাইবার অপরাধ' বলে বিবেচিত হবে। অনলাইনে প্রকাশিত যেকোনো ছবি, খবর বা তথ্যটি সঠিক কি না বা এর সোর্স

কি তা যাচাই করতে গুগলসহ বেশ কিছু সার্চ ইঞ্জিনের সাহায্য নিতে পারেন। এ ছাড়া বেশ কিছু সফটওয়্যার ব্যবহার করেও তথ্য যাচাই করতে পারেন। প্রথমেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো ছবি, ভিডিও বা তথ্য শেয়ার করতে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কোনো তথ্য, ছবি বা ভিডিও সঠিক কি না সেটা বুঝতে হলে শেয়ার করা তথ্যটি কে বা কারা শেয়ার করেছে সেদিক খেয়াল রাখতে হবে।

পরিচিত ও বিশ্বস্ত কোনো বন্ধু, অনলাইন সেলিব্রিটি অথবা কোনো পত্রিকা তথ্যের সূত্র কী, তা জানতে হবে। এ ছাড়া যে বা যারাই এই তথ্যগুলো শেয়ার করেছে তারা সেটা নিজে দেখেছে, নাকি অন্য কারো কাছ থেকে জেনেছে সেটা জানাও খুব জরুরি। যখন কোনো মুভমেন্ট তথ্য আন্দোলন বা কোনো সংকটকালীন পরিস্থিতি বিরাজ করে তখন কোনো তথ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করার আগে বারবার ক্রস চেক করে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া উচিত। তার পরও যদি মনে হয়, সেই তথ্য শেয়ার করলে দেশ ও জাতির জন্য বিভ্রান্তিকর হতে পারে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে পারে সে ক্ষেত্রে এমন তথ্য শেয়ার না করাই ভালো। আরেকটি বিষয়, কোনো তথ্য শেয়ার করার আগে অবশ্যই একটু সময় নিতে হবে। এক থেকে চার ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর শেয়ার করলে এই সময়ের মধ্যে ওই তথ্য সঠিক নাকি গুজব সে সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। গুগলে ইমেজ সার্চ করেও ছবি সঠিক নাকি মিথ্যা তা জানা সম্ভব।

গুগলে ইমেজ সার্চ অপশনে যে সোর্স থেকে ইমেজগুলো এসেছে সেই সোর্সের লিংক অথবা ছবি গুগল ইমেজে ইনপুট দিলে ওই ছবির সাথে সম্পর্কিত ছবিগুলো দেখা যায়। তখন প্রকৃত ছবি কবে কোনো সাইটে বা অনলাইনে কোথায় আপলোড করা হয়েছে তা জানা যায়। ছবি বা তথ্যটি নতুন নাকি পুরনো, সঠিক নাকি ভুল এবং কত তারিখের তাও জানা যায়। অনলাইন ব্যবহার করে কেউ কোনো অপরাধ করলে সংক্ষুব্ধ বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থানায় অভিযোগ করতে পারে। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে অথবা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিটের সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং টিমের পর্যবেক্ষণে যদি অপরাধ হয়েছে বলে যুক্তিসংগত কারণ থাকে তাহলে অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ও মিথ্যা তথ্য প্রচার রোধে মানুষকে সচেতন করে তুলতে 'আসল চিনি' নামে একটি ক্যাম্পেইন চালু করেছে সরকার। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সি (ডিএসএ) ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) এলআইসিটি প্রকল্প যৌথভাবে তিন মাসব্যাপী এ ক্যাম্পেইনে দেশের প্রায় ৭০ লাখ মানুষকে সচেতন করবে। বর্তমানে দেশে চারটি সাইবার নিরাপত্তা ইউনিট কাজ করছে। প্রতি মাসে প্রায় তিন হাজারেরও বেশি সাইবার অপরাধের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। অভিযোগকারীদের সিংহভাগই নারী। তবে পুরুষ ভুক্তভোগীর সংখ্যাও কম নয়। সাইবার ইউনিটগুলো এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে দ্রুত তদন্ত করে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

জনসচেতনতার পাশাপাশি বর্তমান সরকার গুজব প্রতিরোধে কার্যকর পরিকল্পনা করে যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ ইন্টারনেটভিত্তিক সকল ওয়েবসাইট ২৪ ঘণ্টার নজরদারিতে আনা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে একটি বিশেষ সেল গঠন করেছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। এই নজরদারির ফলে ভাইরাল হওয়া নেতিবাচক যেকোনো লিংক বা কনটেন্ট দ্রুত অপসারণ করার সুযোগ আছে। নবগঠিত সাইবার সিকিউরিটি সেলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকার ও রাষ্ট্রবিরোধীসহ বিভিন্ন রকম আপত্তিকর কনটেন্ট নজরদারিতে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি সামাজিক, রাজনৈতিক, পর্নোগ্রাফি, সাংস্কৃতিক কিংবা ধর্মীয় বিষয়ে উসকানিমূলক ও উগ্রবাদী কনটেন্টগুলোকে সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রাখতে এই সেলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিটিআরসির তথ্য মতে, গত এক বছরে ১৮ হাজার ৮৩৬টি আপত্তিকর ফেসবুক লিংক বন্ধ করার অনুরোধের প্রেক্ষিতে চার হাজার ৮৮৮টি লিংক বন্ধ করা হয়েছে। ৪৩১টি ইউটিউব লিংক বন্ধ করার অনুরোধে ৬২টি ক্ষেত্রে ইউটিউব কর্তৃপক্ষ সাড়া দিয়েছে। গুজবের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত তথ্য অধিদফতর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, চলচিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে নিয়মিত সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করে যাচ্ছে।

সোশ্যাল মিডিয়া বর্তমানে বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের নানা সামাজিক প্রতিবাদে সোচ্চার কণ্ঠ হিসেবে এটি ব্যবহার হয়েছে। বেশির ভাগ ঘটনাতেই ইতিবাচক ভূমিকায়

ব্যবহার করা হয়েছে। আবার অনেক সময়ই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে নানা ভুল তথ্য, ছবি ও গুজব ছড়ানো হয়েছে। মত প্রকাশের অধিকার আছে সবার। কিন্তু মত প্রকাশের স্বাধীনতা মানে যা খুশি তা করা নয়। আইন মেনেই করতে হয়। অনলাইনে মত প্রকাশের সময় এই দায়িত্ববোধ রয়েছে। সুতরাং ফেসবুক ব্যবহারে এমন সতর্কতা ও দায়িত্বশীল হতে হবে, যাতে একটি পোস্ট বা মন্তব্য যেন আইন লঙ্ঘন না করে। তাই সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের সকলকে দায়িত্বশীল আচরণের মাধ্যমে সুনাগরিকের পরিচয় দিতে হবে।

লেখক : ফ্রিল্যান্সার

Skilled Youth for Developed Nation

A H M Masum Billah

The youth is the driving force of a country's development. Today's youth will lead the country in the future. They come first in any crisis. From the anti-British movement or our language movement to the liberation war, there was effective participation of the youth in all fields. The youth of the country is playing a very important role in tackling the Covid-19 crisis. Doctors, nurses, sample collectors, volunteers and those who have come forward for burial are mostly young in age.

Young people are full of potentials. If this promising youth force can be utilized, the country will move forward towards development step by step. For this, the youth have to acquire new skills according to the needs of the age. They have to establish themselves in new professions. It is not enough to just sit in the hope of getting a job, they should aim at becoming an entrepreneur to create job opportunities for others. The role of the youth is especially important in the context of achieving the Sustainable Development Goals and the Fourth Industrial Revolution. Therefore, it is important to give utmost importance to the education, training and skill development of the youth.

At present about 32 percent of the total population of Bangladesh is youth. It is estimated that about 22 lakh young people enter the job market every year. Of these, two to two and a half lakhs youths are able to create their workplaces in the country's market. In addition, every year job opportunities are created for an average of eight lakh to one million young

people abroad. Apart from these, a large part of the youth is engaged in informal employment. All of them need to be involved in the mainstream of development. This requires skill development training. At the same time, we need to be more aware that all the training conducted for the youth is of international standard.

In addition to acquiring skills technical areas, young people also need to pay attention to acquiring proficiency in foreign languages, especially those who are employed abroad or trying to achieve this goal. Proficiency in a foreign language creates the possibility of higher wages and pay. At present, those interested in getting employment abroad are being trained in several languages including English, Japanese and Korean in the country. According to government estimates, there are more than 12 million Bangladeshi workers abroad with reputation in different countries of the world. However, the amount of income of NRBs is not satisfactory. The same manpower in India and the Philippines is earning several times more than us. The main reason for this is that we are not able to send skilled human resources abroad. Therefore, after acquiring proper work skills, young people should concentrate on employment abroad.

However, young people should not run after jobs only, rather as entrepreneurs they can be self-employed and can create new jobs markets for the people around them. In the context of achieving SDGs by 2030 and building a developed country by 2040 the time has come for young people to pay more attention to the possibility of becoming entrepreneurs. The youth society has to take responsibility for the implementation of Vision 2041 and they have to be developed as worthy citizens to realize that dream. Our country will become a developed country by 2041 with the hands of the youth

The government is working sincerely to solve the problems of the youth of the country and to enable them to play a role in the development activities. The government continues its efforts to accelerate the pace of development by harnessing the power of young generation. In addition to formulating the National Youth Policy 2017 for their welfare, the policy for National Service Program has been formulated to include the educated youth in the nation building work. Recently, the government has taken initiative to work with the youth of the country through the Youth for Global Bangladesh program. The goal of this program is to work out how to make the young generation more efficient. In addition, on the occasion of the OIC Youth Capital Summit, the Ministry of Youth and Sports has taken decision to give 'Bangabandhu Global Youth Leadership Award' to 10 people in the categories of innovation, environment, humanity, sports-culture-art and entrepreneurship. The Department of Youth Development is implementing numbers of project including modernizing and strengthening of Sheikh Hasina National Youth Centre, training capacity enhancement of Department of Youth Development, creating employment opportunity to improve the skills of the youth.

The current world has entered the era of the Fourth Industrial Revolution. Our young people will need different skills to survive in the face of this challenge. So we have to think about the issues regarding this industrial revolution and make training policies accordingly for the youth. The National Skills Development Authority is working to ensure quality training in youth skills development. This will increase the quality of training for the trainees. Training institutes have to register with the National Skills Development Authority, which

will then monitor all activities including training procedures, trainers, verification standards. This will increase the capacity of training institutes.

In order to continue our economic prosperity in the future, the youth must be properly utilized. The future of the country and the nation largely depends on their development and prosperity. For this, everyone has to come forward to harness the potential of the youth by coordinating the government and private initiatives.

Writer : Senior Information Officer, Press Information Department

আমার শৈশব, আমার অধিকার

কাজী শাম্মীনাজ আলম

রাজশাহীর সাবিনা, অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত, বয়স আনুমানিক ১৪ বছর হবে। স্বপ্ন তার লেখাপড়া করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। একটা ভালো চাকরি করবে। কিন্তু করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে গত বছর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। দিনমজুর বাবা কাজ হারিয়ে সংসারের চাহিদা মেটাতে অক্ষম হয়ে পড়েন। খরচের দায়মুক্তির জন্য তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক সাবিনার বিয়ে দিয়ে দেন।

প্রাচীনকাল থেকে মেয়েদের 'পরিবারের বোঝা' মনে করার মানসিকতা এখনো বিদ্যমান। তারই প্রতিফলন সাবিনা। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির বিয়ে মানেই বাল্যবিয়ে। এই উপমহাদেশে বাল্যবিয়ের প্রথা প্রচলিত আছে এক হাজার বছর পূর্ব থেকে। তবে এটি প্রশ্নবিদ্ধ হয় বিংশ শতাব্দীর দিকে, যখন বিভিন্ন দেশে বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স বৃদ্ধি পায়। গবেষণায় দেখা গেছে, বিশ্বব্যাপী বর্তমানে জীবিত ৬৫ কোটি নারীর বিয়ে হয়েছিল শৈশবে। এর প্রায় অর্ধেক ঘটেছে বাংলাদেশ, ব্রাজিল, ইথিওপিয়া, ভারত ও নাইজেরিয়ায়। হতাশার বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশ বাল্যবিয়ের উচ্চহারে বিশ্বে চতুর্থ এবং দক্ষিণ এশিয়ায় এক নম্বর দেশ।

ইউনিসেফের তথ্য মতে, বাংলাদেশে শিশু বিয়ের প্রবণতা ১৯৭০ সালের তুলনায় ৯০ শতাংশের বেশি কমেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকারি-বেসরকারি প্রচেষ্টায় দেশে বাল্যবিয়ের হার হ্রাস পেলেও করোনাকালে আর্থ-সামাজিক বিপর্যয়ের কারণে শিশু বিয়ে আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। সাম্প্রতিক এ প্রবণতা আরো উদ্বেগজনক। দারিদ্র্যপীড়িত ও প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে করোনাকালে পরিবারে মেয়েশিশুদের দেখা হয়েছে বোঝা হিসেবে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, দেশে বাল্যবিয়ের হার ছিল ৩৩ শতাংশ। কিন্তু সম্প্রতি ব্র্যাকের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে বাংলাদেশে জরিপকৃত কিছু এলাকায় করোনাকালীন বাল্যবিয়ে ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা গত ২৫ বছরে দেশে বাল্যবিয়ের সর্বোচ্চ হার। ইউনিসেফ, ইউএনএফপিএ এবং প্যান ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায় বেসরকারি সংস্থা 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' পরিচালিত এক

জরিপে দেখা যায়, ২০২০ সালে মার্চে কোভিড-১৯ শুরুর প্রথম সাত মাসে দেশের ২১ জেলার ৮৪ উপজেলায় প্রায় ১৪ হাজার বাল্যবিয়ে সংঘটিত হয়েছে, যা অন্যান্য সময়ের তুলনায় অনেক বেশি। সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮-এর তথ্য মতে, করোনাকালীন বাল্যবিয়ের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় হেল্পলাইন ১০৯ সহ অন্য নম্বরগুলোতে বাল্যবিয়ের ঘটনার ফোনকলের সংখ্যা বেড়েছে। রাজশাহী জেলা শিক্ষা অফিসের তথ্য মতে, রাজশাহীতে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ছয় হাজার ৫১২ জন ছাত্রী বাল্যবিয়ের শিকার হয়েছে। বিগত দশকে বাল্যবিয়ে রোধে সরকারের সব অর্জনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করার হুমকিতে ফেলছে করোনাকালে বাল্যবিয়ে বৃদ্ধির এই উচ্চহার।

সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বাল্যবিয়ের একটি অন্যতম কারণ পরিবার ও সমাজে নারী-পুরুষের ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বাল্যবিয়ের মাধ্যমে নারী-পুরুষের অসমতাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বাংলাদেশেও পরিবারগুলোতে ছেলে ও মেয়েরা ভিন্ন ভিন্নভাবে বেড়ে ওঠে। পরিবার, সমাজ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তারা ভিন্নভিন্ন সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, ভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয়। ছেলেসন্তানের মাধ্যমে বংশ এবং সম্পদ রক্ষা হয় এবং মেয়েদের বিয়ের উপযুক্ত করে তৈরি করা হয়। করোনা পরিস্থিতি এই বাঁধাধরা চিন্তার রসদ হিসেবে কাজ করেছে। আয়ের উৎস বন্ধ বা সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় এবং এই সংকট দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কায় মা-বাবাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সুযোগকে কাজে লাগিয়েছেন। এ ছাড়া দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় গ্রামীণ পরিবারগুলো মেয়েদের শিক্ষাজীবন প্রলম্বিত না করতে এবং ভারমুক্ত ও নিশ্চিন্ত থাকতে অনেক অভিভাবক কমবয়সি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। করোনার জন্য সমাগম করে সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনে নিষেধাজ্ঞা থাকায় অনেকেই ঘরোয়াভাবে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করছেন। ফলে বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে প্রশাসনের নজরদারি এড়ানো সম্ভব হচ্ছে। লকডাউনে নিকটাত্মীয়দের দ্বারা মেয়েশিশুদের যৌন হয়রানির ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক অভিভাবক মেয়েদের বিয়ে দিচ্ছেন। সমাজ বিশ্লেষকরা বলছেন, অভিবাসী শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিরা করোনাকালে দেশে ফিরেছেন। 'পাত্র' হিসেবে প্রবাসীদের চাহিদা বেশি বলে কন্যাশিশুদের অভিভাবকরা বিয়ে দিচ্ছেন। যার ফলস্বরূপ করোনায় বাল্যবিয়ে 'নয়া মহামারি' হিসেবে দেখা দিয়েছে।

বাল্যবিয়ে নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম অন্তরায় এবং মানবাধিকারের লঙ্ঘন। বাল্যবিয়ের শিকার মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়, যা তাদের অর্থনৈতিক মুক্তিকে বাধাগ্রস্ত করে এবং পরিবারে পুরুষের সাথে তাদের অসম অবস্থান তৈরি হয়। এর ফলে পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয় তারা। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় অনেক বিষয়ে মেয়েদের সচেতনতার অভাব দেখা যায়। মেয়েরা কম বয়সে গর্ভধারণ করে ফলে সন্তান জন্মদানে জটিলতা সৃষ্টি হয়। বাল্যবিয়ে মাতৃস্বাস্থ্য ছাড়া শিশুস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। এতে মাতৃ মৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার অনেক বেড়ে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, ১৮ বছরের নিচে মেয়েদের অপরিণত সন্তান বা কম ওজনের সন্তান জন্মদানের সম্ভাবনা ৩৫-৫৫ শতাংশ এবং শিশুমৃত্যুহার ৬০ শতাংশ। কমবয়সি নারীর গর্ভজাত শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুবই দুর্বল ও বেশির ভাগ শিশুই অপুষ্টিতে ভোগে। যা যেকোনো দেশের উন্নতির অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। বাল্যবিয়ে মেয়েদের মেধা ও সম্ভাবনাকে অকেজো করে দেয়, ফলে দেশ একটি মেধাবী প্রজন্ম থেকে বঞ্চিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত বাল্যবিবাহ বিষয়ক বৈশ্বিক সম্মেলনে অঙ্গীকার করেন, ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বছরের নিচে মেয়েদের বিবাহ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে সব ধরনের বাল্যবিবাহ বন্ধ হবে। সেই লক্ষ্যে সরকার বাল্যবিয়ে রোধে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে এবং সফলতা অর্জন করেছে। বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ ও নারী উন্নয়নে বিভিন্ন আইন, বিধি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটিগুলো বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করছে। বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রান্তিক ও অসহায় কিশোর-কিশোরীদের জেন্ডার বেইজড লেন্স প্রতিরোধ করার জন্য আট হাজার কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন করা হয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য এক কোটি মহিলাকে তথ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে সরকারের আরেকটি সময়োপযোগী উদ্যোগ ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে সংসদে পাস হওয়া 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭' এ আইন পাসের ফলে ব্রিটিশ আমলে প্রণীত 'চাইল্ড ম্যারেজ রেসট্রেইন্ট অ্যাক্ট-১৯২৯' বাতিল হয়ে যায়া বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ পাসের আগে বাল্যবিবাহ রোধে, ব্রিটিশ সরকার প্রণীত 'চাইল্ড ম্যারেজ রেসট্রেইন্ট

অ্যাক্ট-১৯২৯' ছিল, যাতে বলা হয়েছিল কোনো নারী ১৮ বছরের আগে এবং কোনো পুরুষ ২১ বছরের আগে যদি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ এই শাস্তির সময়কাল এবং অর্থদণ্ড বর্তমান সময়ের সাপেক্ষে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কম ছিল, ফলে এই আইনটি অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। ২০১৭ সালে প্রণীত বর্তমান আইনে বয়সের সীমা একই রেখে, শাস্তির সময়কাল এবং অর্থদণ্ডের পরিমাণ সর্বোচ্চ দুই বছর এবং এক লাখ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। পাশাপাশি নতুন আইনে শাস্তির আওতায় কারা আসবে তার পরিষ্কার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যারা বিয়ে পরিচালনা করেন এবং বিয়ে রেজিস্ট্রি করেন, তাঁদের ও শাস্তির আওতায় আনা হয়েছে। অর্থাৎ শুধু অপ্রাপ্ত বয়স্ক বর, কনে বা তাদের পরিবারসংশ্লিষ্ট সবাই আইন ভঙ্গের শাস্তি পাবে। নতুন আইনের সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে, প্রমাণক প্রদর্শনের জন্য বয়স নির্ধারণকারী সনদগুলো 'নির্দিষ্ট'।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে পরিচালিত শেখ হাসিনার সরকার নারীর ক্ষমতায়নে যেকোনো সিদ্ধান্ত ও গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে আপসহীন। বাল্যবিয়ের অবসান ঘটানো নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। বাল্যবিয়ে রোধে অনেক বছর ধরেই সরকার সচেষ্ট। কিন্তু করোনা মহামারিতে সময়োপযোগী, সুদূরপ্রসারী ও বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ প্রয়োজন, যা বাল্যবিয়ে রোধে সাম্প্রতিক অগ্রগতিতে আরো বেগবান করতে পারে। এ ছাড়া প্রয়োজন সরকার ও সিভিল সোসাইটি এবং বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে সুসমন্বয়। প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক ও সমাজের অগ্রসর নাগরিকদের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে বাল্যবিয়ে রোধে কাজ করতে হবে। তবে সবার আগে বাল্যবিয়ের মতো সামাজিক ব্যাধি নির্মূলে নারীর প্রতি সমাজের প্রতিটি স্তরে অসম ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। তবেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বৈষম্যমুক্ত, মর্যাদাপূর্ণ ও অধিকারভিত্তিক 'সোনার বাংলা' গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

লেখক : তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

ডিজিটাল বৈষম্য : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

মো. বেলায়েত হোসেন

বৈষম্য আমাদের কাছে খুবই পরিচিত একটি শব্দ। আমরা অনেক রকম বৈষম্যের কথা জানি। আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, উচ্চবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তের পরস্পরের মধ্যে সম্পদের বৈষম্য আমাদের সামনে আছেই। গ্রাম ও শহরের বৈষম্য আমাদের সমাজব্যবস্থাকে প্রকটভাবেই তুলে ধরছে। এসব বৈষম্যের পাশাপাশি ডিজিটাল বৈষম্য আমাদের সামনে আরো বেশি দৃশ্যমান হয়েছে। এ বৈষম্য দূর করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখ করেছিলেন 'আমার গ্রাম, আমার শহর'। এটি বাস্তবায়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি সকলকে সমন্বিতভাবে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন শহরের সব সুবিধা গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে মানুষের জীবনমান উন্নয়ন হবে এবং এর মাধ্যমে ২০৩০ সালে এসডিজি এবং ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গঠন করা সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সে পথেই এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার করোনাকালেও ৫.৪৭ শতাংশ ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে জিডিপির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭.২ শতাংশ। পার ক্যাপিটাল ইনকাম বৃদ্ধি পেয়ে এখন দুই হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার ছাড়িছে গেছে। করোনা মহামারির সময় সারা বিশ্ব যখন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে দিয়ে নানা রকম সমস্যা মোকাবিলা করে চলছে বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম না হয়েও আর্থিক ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করছে। এগুলো সম্ভব হয়েছে মূলত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ নেতৃত্ব ও সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করতে পারার কারণে।

করোনাকালে অনেক সমস্যাকে পেছনে ফেলে ডিজিটাল বৈষম্য আমাদের সামনে ব্যাপকভাবে দৃশ্যমান হয়েছে। প্রযুক্তি মানুষের জীবনকে বদলে দিয়েছে, জীবনযাত্রাকে করছে সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময়, তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তবে বহু মানুষ এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, এটাও মেনে নিতে হবে। ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে আমাদের দেশের অনেকেই ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারণা সম্পর্কে অনুধাবন করতে পরেনি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন ভিশন-

২০২১-এর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন এবং তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিলেন এবং এর মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনে পথ দেখালেন, তখন দেশবাসী এটাকে লুফে নিল। আমরা এখন ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা ভোগ করছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় সবাই সমানভাবে এ সুবিধা গ্রহণ করতে পারছি না।

Digital Discrimination বা ডিজিটাল বৈষম্য প্রথম বিশ্ববাসীর সামনে আনেন ড্যান লায়ন ২০০৩ সালে তাঁর বই 'Surveillance as Social Sorting: Privacy, Risk and Digital Discrimination'-এ। Digital Discrimination কে আগে ডিজিটাল ডিভাইড বলা হতো। গত শতাব্দীর শেষ নাগাদ ডিজিটাল বৈষম্যের বিষয় নিয়ে আওয়াজ তুলেছিলেন নাইজেরিয়ার জন দাদা নামের এক ব্যক্তি। ২০০০ সালের মে মাসে জন দাদার প্রস্তাবের আলোকে জাপানের ওকিনাওয়ায় জি-৮ সম্মেলনে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ডিজিটাল বৈষম্য বিষয় নিয়ে কথা বলেন। জন দাদা ২০০২ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে জাতিসংঘের এক সভায় ডিজিটাল বৈষম্যের তখন 'ডিজিটাল ডিভাইড' পদটি ব্যবহারের বিষয়ে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন। এ সভায় তিনি ভবিষ্যতের ডিজিটাল সমাজের একটি রূপরেখাও তুলে ধরেন।

করোনা অতিমারিকালে বিশ্বের সকল দেশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে। ব্যক্তিগত ও আর্থিক বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে সকল দেশই তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দৈনিক কার্যক্রমকে অনলাইনভিত্তিক করতে বাধ্য হয়েছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। আমাদের দেশেও সরকারি-বেসরকারি নানা রকম কার্যক্রমকে অনলাইনভিত্তিক করা হয়েছে। অফিস-আদালত, ব্যাংক, শিক্ষা, চিকিৎসা, ক্রয়-বিক্রয়সহ অনেক রকম সেবার ক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে প্রযুক্তির সাহায্য নিতে হয়েছে এবং হচ্ছে। অনলাইনভিত্তিক কেনাকাটা এবং ব্যাংকিংসেবা এখন খুব জনপ্রিয়। মানুষ ঘরে বসেই সব কিছু তার পছন্দমতো কেনাকাটা করতে পারছে। খাবার অর্ডার দেওয়ার কিছু সময়ের মধ্যে খাবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি অফিসের চাকরিজীবীদের বেতন তোলা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেতন জমা দেওয়া, সকল ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, পাসপোর্টের জন্য টাকা জমা দেওয়া সবই অনলাইনে ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে করা সম্ভব হয়েছে। সশরীরে লাইনে দাঁড়িয়ে বিল পরিশোধ করা কিংবা ব্যাংক থেকে টাকা তোলা বা জমা দেওয়া মানুষ এখন আর পছন্দ করে না। এমনকি আদালতের বিচার কার্যক্রমও তথ্য-প্রযুক্তির সাহায্যে ভার্চুয়ালি

শুরু হয়েছে। অনলাইনভিত্তিক এসব সেবা শহুরে মানুষের জীবনকে সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুললেও শহর ও গ্রামের মানুষের একটা বড়ো অংশ এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও আর্থিক কারণে তারা এ সুবিধাগুলো ভোগ করতে পারছে না। এ ছাড়া অবকাঠামোগত সমস্যার কারণেও অনেক মানুষকে এ সুবিধার আওতায় আনা যাচ্ছে না। বিআরটিসির তথ্য মতে, দেশে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা কমবেশি ১৮ কোটি। শহর ও গ্রামের নিম্নআয়ের মানুষের অধিকাংশের স্মার্টফোন নেই। দেশে ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫ কোটিরও বেশি। বিশ্বে সর্বোচ্চ ফেসবুক ব্যবহারকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান দশম। দেশে মেসেঞ্জার ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি, আর ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১১ কোটিরও বেশি। এর মধ্যে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ১০ কোটি ২৩ লাখেরও বেশি। দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী প্রয়োজনীয় ডিজিটাল ডিভাইস, ইন্টারনেট সংযোগ ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান না থ াকার কারণে ডিজিটাল বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। এ ছাড়া পুরুষের তুলনায় মহিলারা বেশি ডিজিটাল বৈষম্যের স্বীকার। প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অসমতা দেশের জনগণের মধ্যকার বর্তমান বৈষম্যকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

করোনাকালে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষার সুযোগসহ অনলাইন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি সেবাগুলোর সহজীকরণ ও তথ্য-প্রযুক্তিতে দক্ষতাও প্রয়োজন। আর এ দুই ক্ষেত্রেই দরিদ্র ও নিম্নবিত্তের মানুষের ঘাটতি রয়েছে। পুরুষের তুলনায় মহিলাদের ঘাটতি আরো বেশি। বর্তমানে দেশের ৫৫ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারে ইন্টারনেট সংযোগ নেই, ৫৯ শতাংশের স্মার্টফোন নেই। এসব ঘাটতি পূরণ করার জন্য ইতোমধ্যে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে। আইসিটি বিভাগ থেকে দেশের সকল ইউনিয়নে পর্যায়ক্রমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড সংযোগ দেওয়া কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিদ্যমান ইন্টারনেটের গতির তারতম্য দূর করাসহ ইন্টারনেটকে সুলভ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এটা একটি চলমান প্রক্রিয়া।

লেখক : তথ্যপ্রযুক্তিবিদ

বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা ও আজকের কৃষি

মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন

বিখ্যাত দার্শনিক রুশো বলেছিলেন, 'পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ও গৌরবমণ্ডিত শিল্প হচ্ছে কৃষি'। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী ও বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক রাজনৈতিক নেতা। তিনি দার্শনিক রুশোর বাণীকে লালন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, অর্থনৈতিকভাবে উন্নত ও সমৃদ্ধ একটি সোনার বাংলা গড়তে কৃষিশিল্পের উন্নয়ন অপরিহার্য এবং কৃষি একটি জ্ঞাননির্ভর শিল্প। গতানুগতিক কৃষিব্যবস্থা দ্বারা দ্রুত ক্রমবর্ধমান বাঙালি জাতির খাদ্যের জোগান নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তাই খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য চাই কৃষির ব্যাপক আধুনিকীকরণ।

কৃষির সার্বিক উন্নয়নে মেধাবী শিক্ষার্থীদের যদি কৃষিশিক্ষায় আগ্রহী করে তোলা না যায়, তাহলে কৃষি খাতে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা কখনো সম্ভব হবে না। এই উপলব্ধি থেকে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রদত্ত ভাষণটি একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে আজও সাক্ষ্য দেয়। সেদিন এ ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি বলেছিলেন, আমাদের কৃষির দিকে নজর দিতে হবে। তিনি কৃষিবিদদের উদ্দেশে বলেন, 'আপনাদের কোট-প্যান্ট খুলে একটু গ্রামে নামতে হবে। কেমন করে হালচাষ করতে হয়, এ জমিতে কত ফসল হয়, এ জমিতে কেমন করে লাঙল চষে, কেমন করে বীজ ফলন করতে হয়, আগাছা কখন পরিষ্কার করতে হবে। ধানের কোন সময় নিড়ানি দিতে হয়। কোন সময় আগাছা ফেলতে হয়। পরে ফেললে আমার ধান নষ্ট হয়ে যায়। এগুলো বই পড়লে হবে না। গ্রামে গিয়ে আমার চাষি ভাইদের সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল কাজ করে শিখতে হবে। তাহলে আপনারা অনেক শিখতে পারবেন।' ১৯৯৬ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্ন 'সোনার বাংলা' গড়ার লক্ষ্যে কৃষি খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পুষ্টি উন্নয়ন, মহিলাদের কৃষিতে অংশগ্রহণ ও দারিদ্র্যমোচনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল তখন। ফলে

বাংলাদেশ ২০০০ সালে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। জাতির এ অর্জনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এএফও) থেকে 'সেরেস' পদকে ভূষিত হন।

পরবর্তী সময়ে কয়েকটি বছর কৃষি উন্নয়ন থমকে গিয়েছিল, ফলে খাদ্য আমদানি করতে হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দফায় ২০০৮ সালে আবার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সম্ভাবনা আরো এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। কৃষি খাতে আবার ভর্তুকি, সার বিতরণ ও সেচব্যবস্থার উন্নয়ন, একটি বাড়ি, একটি খামার প্রকল্প, শস্য বহুমুখীকরণসহ অনেক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বর্তমান সরকার। স্বাধীনতার ৫০ বছরে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ আবাদি ভূমি কমে যাওয়া সত্ত্বেও খাদ্যশস্য বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে প্রায় চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদেরও উৎপাদন কয়েক গুণ বেড়েছে।

২০০৯ সালে খাদ্য ঘাটতি ছিল ২৬ লাখ টন। একই বছরের প্রথম ক্যাবিনেট সভায় সারের দাম কমানোর প্রস্তাব পাস হয়। ৯০ টাকা কেজি সারের মূল্য ২২ টাকায়, ৮০ টাকার সার ১৫ টাকায় আনা হয়। বীজ, সেচ, বিদ্যুতে ভর্তুকিসহ সব কিছু পর্যাপ্ত ও সহজপ্রাপ্য করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়। একই সঙ্গে পানি সেচের ব্যবস্থা করার জন্য পাম্প চালনার জন্য ডিজেলের মূল্যে ভর্তুকির ব্যবস্থা করা হয়েছে। জমির পরিমাণ ভেদে দুই স্তরে যথাক্রমে ৮০০ ও ১০০০ টাকা হিসাবে ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে। কৃষকদের জন্য ১০ টাকা মূল্যে ব্যাংক হিসাব খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে গড়ে ছয় লাখ টন চালের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফলে ২০১৩ সালে সব ঘাটতি পূরণ করে আবারও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় দেশ এবং এখন পর্যন্ত সেই ধারা অব্যাহত আছে। মোট দেশজ উৎপাদন তথা জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১৯.১ শতাংশ এবং কৃষি খাতের মাধ্যমে ৪৮.১ শতাংশ মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে।

কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণের স্বপ্ন ছিল বঙ্গবন্ধুর। সেই ধারাবাহিকতায় কৃষি যান্ত্রিকীকরণে সরকারি সহায়তায় এবার এই মহামারির মধ্যেই শেষ হয়েছে দেশের ইতিহাসে সবার আগে হাওরাঞ্চলের বোরো ধান কর্তন। বর্তমানে প্রায় তিন হাজার ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ' প্রকল্পের মাধ্যমে অঞ্চলভেদে ৫০-৭০ শতাংশ ভর্তুকি দিয়ে প্রায় ৫২ হাজার কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হবে। এটি সারা বিশ্বে একটি বিরল ঘটনা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ প্রকল্পের অধীনে বরাদ্দপ্রাপ্ত

২০৮ কোটি টাকার মাধ্যমে সারা দেশে এক হাজার ৭৬২টি কম্বাইন হারভেস্টার, ৩৭৯টি রিপার, ৩৪টি রাইস ট্রান্সপ্লান্টারসহ প্রায় দুই হাজার ৩০০টি বিভিন্ন ধরনের কৃষিযন্ত্র কৃষকের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে এ প্রকল্পে বরাদ্দ রয়েছে ৬৮০ কোটি টাকা। পাশাপাশি কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করতে দক্ষ জনবল তৈরিতে ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে কৃষি প্রকৌশলীর ২৮৪টি পদ সৃজন করা হয়েছে।

শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তির ক্ষেত্রে শুধু কৃষি যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে প্রতিবছর মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনের ৭-১০ ভাগ অপচয় হয়। কৃষিকাজের প্রতিটি স্তরে কৃষিযন্ত্র ব্যবহার নিশ্চিত করা হলে বছরে আরো ৭০ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য উৎপাদন বেশি হতো। কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন ব্যাপক কৃষি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দানাশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ফসল উৎপাদনে ও প্রক্রিয়াজাতকরণে কর্তনপূর্ব, কর্তনকালীন ও কর্তনোত্তর সময়ে ফসলের ক্ষতি হয়। বাংলাদেশে দানাশস্যে ফসল কর্তনোত্তর ক্ষতির পরিমাণ মোট উৎপাদনের ১২-১৫ ভাগ, যা ফল ও শাক-সবজির ক্ষেত্রে প্রায় ২৫-৪০ ভাগ। বাংলাদেশের মোট উৎপাদনের প্রায় ৭ ভাগ গম, ১২.০৫ ভাগ তেলবীজ, ২৫ ভাগ শাক-সবজি এবং আলু, ১২.০৫ ভাগ ডাল ফসল এবং ১০.০৫ ভাগ মরিচ ফসলে কর্তনোত্তর ক্ষতি হয় শুধু দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের না করার ফলে। খাদ্য সরবরাহ ও জোগানের মধ্যে যে ঘাটতির রয়েছে তা সঠিক ফসল কর্তনোত্তর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই কমানো সম্ভব। অন্যদিকে প্রতিনিয়তই কৃষিকাজে শ্রমিকের অভাব দেখা দেওয়ায় কৃষকরা সঠিক সময়ে ফসল জমিতে লাগাতে পারছে না। ফলে কৃষকদের মাঝে কৃষিকাজে যন্ত্র ব্যবহারের ব্যাপক চাহিদা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কৃষিকাজের এ অবস্থার কারণে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত কৃষি যন্ত্রপাতির চাহিদা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। স্থানীয়ভাবে তৈরি এসব কৃষি যন্ত্রপাতির চাহিদার বৃদ্ধির ফলে গড়ে উঠেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি কারখানা। বারির ফার্ম মেশিনারি অ্যান্ড পোস্টহারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের এক জরিপে দেখা গেছে, কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের শুধু বারি গুটি ইউরিয়া সার প্রয়োগ যন্ত্র ও মাড়াইযন্ত্র ব্যবহারের ফলে ইউরিয়া সাশ্রয় ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি সাশ্রয় বাবদ সাত হাজার ৩৫০ কোটি টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব।

কৃষিতে তথ্য-প্রযুক্তির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে একটি শব্দ, তা হলো ই-কৃষি। ই-কৃষিকে অনেক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এগুলোকে একত্রিত করলে যা দাঁড়ায় তা হলো, কৃষির

জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ নির্ভরযোগ্যভাবে কৃষক, কৃষিজাত পণ্যের ব্যবসায়ী, সংশ্লিষ্ট গবেষক ও বিজ্ঞানী, পরিকল্পনাবিদ, ভোক্তা ইত্যাদি গোষ্ঠীর কাছে দ্রুততার সাথে পৌঁছে দিতে ইলেকট্রনিক মাধ্যমের (ইন্টারনেট, ইন্ট্রানেট, রেডিও, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন ইত্যাদি) ব্যবহারই ই-কৃষি। কৃষিসেবা অনলাইন ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রদানের জন্য বেশ কিছু ই-কার্যক্রম রয়েছে। 'ডিজিটাল ক্রপক্যালেন্ডার' : জমিতে বছরব্যাপী পরিকল্পনামাফিক চাষাবাদ করার জন্য কৃষক ফসল প্যাটার্ন পছন্দ করার পর একটি কার্ড প্রিন্ট করতে পারবে, যেখানে তারিখসহ চাষাবাদ পদ্ধতি, সার, সেচ, বালাই দমন ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা লেখা থাকবে। 'কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা' : ছবিভিত্তিক কৃষকের চাষাবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষক ছবি দেখে ১২০টি ফসলের উন্নত চাষ প্রণালী, সার ও পানি ব্যবস্থাপনা এবং বালাই ব্যবস্থাপনা এসব সম্পর্কে জানতে পারবে। 'অনলাইনে কৃষকের জানালা' : ছবি দেখে বালাই শনাক্তকরণ এবং তার ব্যবস্থাপনার বর্ণনা এখান থেকে পাওয়া যাবে। ই-কৃষি সেবা বিস্তারের লক্ষ্যে ৬৪টি জেলা থেকে সংগৃহীত খুচরা, পাইকারি ও কৃষকপ্রাপ্ত বাজার দর দৈনিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক ভিত্তিতে অনলাইনের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়, যা পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ওয়েবসাইটে সহজলভ্য করা হয়ে থাকে।

কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষক লাভবান হওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান তৈরি হবে। একই সঙ্গে ফসলের নিবিড়োতা বাড়বে সময় বাঁচার ফলে আলাদা একটা ফসল করা যাবে। এর ফলে কৃষিতে বৈপ-বিক পরিবর্তন আসবে। কৃষি দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবে ও কৃষিপণ্যের রপ্তানি বাড়বে। কৃষির ওপর ভিত্তি করে উন্নত বাংলাদেশ হবে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের টেকসই রূপদানের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় এই দেশে কৃষিভিত্তিক টেকসই শিল্পোন্নয়নের প্রসার ঘটানো সম্ভব।

সবার সম্মিলিত আন্তরিক এবং কার্যকরী প্রচেষ্টায় আমাদের নিয়ে যাবে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সর্বোচ্চ সীমানায়। অদূর ভবিষ্যতে আমরা বিনির্মাণ করতে পারব স্বনির্ভর সুখী-সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ। কথার চেয়ে কাজ বেশি, পরিকল্পনার চেয়ে বাস্তবায়ন বেশিই হোক আমাদের আন্তরিক অঙ্গীকার। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন হোক আমাদের হৃদয়ের মনমানসিকতার ঐকান্তিক ইচ্ছা ও কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

লেখক : সিনিয়র তথ্য অফিসার, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস ২০২১ : আসুন, বাঘ সংরক্ষণে সরকারের সহযোগী হই

দীপংকর বর

মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃক্ষ ও বন-বনানী থাকা অত্যাবশ্যক। উপকূলীয় বন প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষাসহ বিপর্যয়কর ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে মানুষকে সুরক্ষা দেয়। সুন্দরবন বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিবাসীদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে। অন্যদিকে 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' আমাদের সুন্দরবনের রক্ষক। হলুদের ওপর কালো ডোরাকাটা অভিজাত প্রজাতির এ বাঘের উপস্থিতির কারণেই সুন্দরবন এত বৈচিত্র্যময় ও আকর্ষণীয়। সুন্দরবনে বেঙ্গল টাইগার না থাকলে সেখানকার সামগ্রিক প্রতিবেশ ব্যবস্থা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই সুন্দরবনকে বাঁচাতে বাঘ সংরক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চীন, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, ভুটান, নেপাল ও রাশিয়া প্রভৃতি পৃথিবীর মাত্র ১৩টি দেশে এখন বাঘের অস্তিত্ব আছে। বাঘ বাঁচাতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বাঘ সমৃদ্ধ দেশগুলোর সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে অনুষ্ঠিত বাঘ সমৃদ্ধ বর্ণিত ১৩টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বাঘ সংরক্ষণ কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রতিবছর ২৯ জুলাই আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। বাঘের প্রাকৃতিক আবাসস্থল রক্ষা এবং এর সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা ও ভয় দূরীকরণ সর্বোপরি বাঘ সংরক্ষণে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে এ দিবস পালন করা হয়। 'বাঘ বাঁচায় সুন্দরবন, সুন্দরবন বাঁচায় লক্ষ জীবন' প্রতিপাদ্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশে ২৯ জুলাই বাঘ দিবস ২০২১ পালন করা হবে।

বাঘের বসবাস উপযোগী নিরাপদ বনাঞ্চল ও প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস, চোরাশিকারিদের কারবার, প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয় জলের অভাব, বাঘ ও মানুষের দ্বন্দ্ব, বনের অভ্যন্তরে অবাধে নৌ চলাচল, লবণাক্ততা বৃদ্ধি,

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বনের পাশে শিল্প-কারখানা স্থাপন, বিভিন্ন ধরনের রোগ, বনে পর্যটকদের আনাগোনা, বাঘশিকারিদের শাস্তির অভাব ইত্যাদি কারণে বিশ্বব্যাপী বাঘের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য মতে, বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রকৃতিতে বিদ্যমান বন্য বাঘের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার ৯০০টি। বাঘ বিশেষজ্ঞগণের মতে, বিশ্বব্যাপী বাঘের সংখ্যা দ্রুত কমে যাওয়ার এই প্রবণতা চলমান থাকলে আগামী কয়েক দশকে পৃথিবী থেকে বাঘ হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনে বাঘের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিনের নেতৃত্বে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বহুমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। সুন্দরবনের বাঘ রক্ষার জন্য আবাসস্থলের উন্নয়ন ও নিয়মিত টহল প্রদান করে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যথোপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে উভয় সুন্দরবনের বাঘ সংরক্ষণ, বাঘ ও শিকারি প্রাণী পাচার বন্ধ, দক্ষতা বৃদ্ধি, মনিটরিং ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ২০১১ সালে একটি সমঝোতা স্মারক এবং একটি প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০১৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসের ১৪-১৬ তারিখ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক দ্বিতীয় স্টকটেকিং সম্মেলন আয়োজন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

বাঘসহ অন্যান্য বন্য প্রাণী শিকার ও পাচার রোধে ২০১৬ সালের ২৬-২৭ অক্টোবর ঢাকায় বাংলাদেশ সরকারের আয়োজনে 'সাউথ এশিয়ান ওয়াইল্ডলাইফ এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক'-এর তৃতীয় বার্ষিক সভায় অনুষ্ঠিত হয়। বাঘ সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ টাইগার অ্যাকশন প্ল্যান ২০১৮-২০২৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাঘ এবং অন্য বন্য প্রাণীদের অবাধ বিচরণ ও বংশবিস্তারের লক্ষ্যে সুন্দরবনের ৫২ শতাংশ এলাকাকে রক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বনদস্যুর সাথে সংগ্রাম করে সুন্দরবন ও এর বাঘ রক্ষায় কাজ করে যাওয়া মাঠ পর্যায়ের বনকর্মীদের কাজে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ৩০ শতাংশ ঝুঁকিভাতা প্রদান করছে। সুন্দরবন ও বাঘ সংরক্ষণের জন্য সুন্দরবনের চারটি রেঞ্জে জিপিএসের সাহায্যে নিয়মিত স্মার্ট প্যাট্রলিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সুন্দরবনের মধ্যে বাঘসহ অন্যান্য বন্য প্রাণী শিকার প্রতিরোধে বন বিভাগের সাথে পুলিশ, র‍্যাব, কোস্ট গার্ড ও নৌ পুলিশ সমন্বিতভাবে কাজ করছে।

মানুষ-বাঘ দ্বন্দ্ব নিরসনে ২০০৮ সালে সুন্দরবনের আশপাশের গ্রামে ৪৯টি 'ভিলেজ টাইগার রেসপন্স টিম' গঠন করা হয়েছে। এর ফলে লোকালয়ে বাঘ আসা মাত্র খবরাখবর আদান-প্রদান ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। ২০১০ সালে 'কমিউনিটি প্যাট্রল টিম' ও 'কো-ম্যানেজমেন্ট কমিউনিটি' গঠন করা হয় এবং এই দলগুলোর সমন্বয়ে নিয়মিতভাবে প্যাট্রলিং ও তথ্য আদান-প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সুন্দরবন ও বাঘ সংরক্ষণের জন্য বন অধিদপ্তরের কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বাঘ সংরক্ষণ বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এ বিষয়ে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করছে।

মানুষ ও বাঘ দ্বন্দ্ব নিরসনের লক্ষ্যে বন্য প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১-এর অধীন বাঘের আক্রমণে নিহত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়িয়ে ১ লাখ থেকে ৩ লাখ টাকা এবং গুরুতর আহত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৫০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা করা হয়েছে। এ ছাড়া বাঘের আক্রমণে নিহত ও গুরুতর আহত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য 'বন্য প্রাণীর আক্রমণে জানমালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা-২০১০' এবং পরবর্তীতে প্রণীত 'বন্য প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১' অনুসারে ২০১১ সাল থেকে জুন, ২০২১ সময়কাল পর্যন্ত ৬২টি পরিবারের মধ্যে ৫৮ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে।

বাঘ হত্যা বন্ধ করার লক্ষ্যে অধিকতর শাস্তির বিধান রেখে বাংলাদেশ বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এর ধারা-৩৬-তে বাঘ হত্যার জন্য সর্বনিম্ন দুই বছর এবং সর্বোচ্চ সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং সর্বনিম্ন ১ লাখ থেকে সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটালে সর্বোচ্চ ১২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড দণ্ডিত করার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত আইনের ধারা-৩৬ অনুযায়ী বাঘ হত্যা জামিন অযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

বাঘ সংরক্ষণের জন্য নিরাপদ আবাসস্থল ও পর্যাপ্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সুন্দরবন ও এ বনের বন্য প্রাণী রক্ষায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন পাঁচ বছর মেয়াদি 'সুন্দরবন সুরক্ষা প্রকল্প' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পে সুন্দরবন এবং এই বনের বন্য প্রাণী রক্ষায় বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম, ইকোলজিক্যাল মনিটরিং ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চলতি বছর ৩ মার্চ সুন্দরবনে বন ও বন্য প্রাণী রক্ষায় পর্যবেক্ষণ

কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বন অধিদপ্তরের নিকট চারটি ড্রোন হস্তান্তর করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই বন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ড্রোন পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

বন বিভাগের তথ্য মতে, ২০১৪-১৫ সালে বন অধিদপ্তর কর্তৃক ক্যামেরা ট্র্যাপিং পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত বাঘ জরিপে সুন্দরবনে ১০৬টি বাঘের সন্ধান পাওয়া যায়। পরবর্তীতে ২০১৭-১৮ সালে বন অধিদপ্তর কর্তৃক ক্যামেরা ট্র্যাপিং পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত বাঘ জরিপে সুন্দরবনে ১১৪টি বাঘের সন্ধান পাওয়া যায়। অর্থাৎ তিন বছরের ব্যবধানে সরকারের বিভিন্ন কার্যকর উদ্যোগের কারণে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ৮ শতাংশ বেড়েছে।

সুন্দরবনে বাঘ সংরক্ষণের জন্য 'বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্প' নামক একটি প্রকল্প গ্রহণের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বয়স ও লিঙ্গ অনুপাতে সুন্দরবনের কম বাঘসম্পন্ন এলাকায় বাঘ স্থানান্তর, ক্যামেরা ট্র্যাপিংয়ের মাধ্যমে বাঘ জরিপ, সুন্দরবনে বাঘের প্রধান খাবার হরিণ এবং বন্য শূকর জরিপ, বাঘের আপেক্ষিক ঘনত্ব নির্ধারণ, সুন্দরবনের লোকালয়সংলগ্ন এলাকায় নাইলনের রশির বেষ্টনী তৈরি, ড্রোন ব্যবহারের মাধ্যমে সুন্দরবনের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসমূহ পরিবীক্ষণ, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ইত্যাদি নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

সুন্দরবনকে রক্ষা করতে হলে বাঘ সংরক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। বাঘ বাঁচাতে ও বাড়াতে তার বাসস্থান, খাবার ও বাইরের শিকারিদের কবল থেকে মুক্ত করতে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করছে সরকার। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় তথা বন অধিদপ্তরের একার পক্ষে বাঘ হত্যা ও চোরাচালান বন্ধ করা কষ্টসাধ্য। আমাদের জাতীয় প্রাণী বাঘ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। অন্যথায় এ বিপন্ন প্রাণীটি আমাদের দেশ থেকে অচিরেই হারিয়ে যাবে। তাই আসুন, আমরা নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থেই সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সুন্দরবনের রক্ষক বাঘকে বাঁচাতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হই।

লেখক : সিনিয়র তথ্য অফিসার, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হাইকোর্টের নির্দেশনা

তসলিমা আক্তার

হাইকোর্ট ৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ এক রায়ে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশনায় এই ভাষণ পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার পর দীর্ঘ দুই যুগের বেশি সময় স্বাধীনতাবিরোধী চক্র ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ নিষিদ্ধ করে রাখে। যারা মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসকে ভয় পায়, তাদের জন্য হাইকোর্টের এই রায় একটি কঠোর সতর্কবার্তা। বর্তমানে নির্দিষ্ট কিছু ক্লাসে/কোর্সে বঙ্গবন্ধুর এ ঐতিহাসিক ভাষণ পড়ানো হয়। চার বছর আগে একজন আইনজীবীর করা এক রিটের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট প্রদত্ত এ নির্দেশনা বাস্তবায়িত হলে নতুন প্রজন্ম জাতির পিতার নেতৃত্বে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আরো বেশি করে জানতে পারবে। সকল অপশক্তি মোকাবিলায় এর চেয়ে বড়ো মোক্ষম অস্ত্র আর কী হতে পারে! এ রিটের শুনানিতে হাইকোর্টের ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০-এর নির্দেশনার আলোকে সরকার ৭ই মার্চকে 'জাতীয় ঐতিহাসিক দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। উচ্চ আদালত একই সাথে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান) ঐতিহাসিক ভাষণস্থলে বঙ্গবন্ধুর তর্জনী উঁচিয়ে ভাষণের ভঙ্গির ভাস্কর্য নির্মাণের নির্দেশনা দিয়েছেন। মুজিববর্ষের মধ্যে সারা দেশে সকল জেলায় ও উপজেলায় বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপনের নির্দেশনাও দিয়েছেন হাইকোর্ট।

বিশ্বনেতাদের বেশ কিছু ভাষণ বর্তমানে নির্দিষ্ট কিছু কোর্সের শিক্ষার্থীদের পড়ানো হয়। পাঠ্যসূচিভুক্ত এসব ভাষণের মধ্যে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে দশ লক্ষাধিক মানুষের বিশাল সমাবেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ এক অনন্য স্থান দখল করে আছে। কোটি

কোটি বাঙালিকে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে কঠিন শপথে উদ্দীপ্তকারী বঙ্গবন্ধুর সেই বজ্রকণ্ঠের ভাষণ শিক্ষার্থী বিশেষ করে সাহিত্য অনুরাগীদের কাছে অত্যন্ত আগ্রহের একটি বিষয়। ঐতিহাসিক এই ভাষণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, পাবলিক অ্যাড্রেস সম্পর্কিত সকল যোগাযোগ দক্ষতার ফলপ্রসূ প্রয়োগ, যার জন্য ভাষণটি যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ বিশেষ করে শিক্ষকদের কাজে 'টেক্সবুক এক্সামপল'-এর মর্যাদা লাভ করেছে। প্রত্যেক নেতাই একজন শিক্ষক বা ভালো যোগাযোগ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি। এ অনন্য দক্ষতা আমরা বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ করি। একজন শিক্ষক যখনই বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ দেখবেন, শুনবেন, পড়বেন, তিনি নিশ্চিতভাবে শিক্ষণীয় কিছু না কিছু পাবেন, যোগাযোগ দক্ষতা সম্পর্কিত বিষয় তো অবশ্যই।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের মতো আর কোনো সেরা ভাষণ বিশ্বকে এতটা নাড়া দিতে পারেনি। অনলাইনে ক্লিক করলে এ ভাষণের ওপর ব্যাপক লেখালেখি মুহূর্তের মধ্যে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ নিয়ে প্রতিদিনই কোনো না কোনো জার্নাল, সংকলন, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গবেষণাপত্র, সংবাদ প্রতিবেদন, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের খবর প্রকাশিত হচ্ছে। মার্কিন নিউজ ম্যাগাজিন 'নিউজউইক'-এর ৫ এপ্রিল, ১৯৭১ ইস্যুতে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়, যেখানে বঙ্গবন্ধুকে 'পোয়েট অব পলিটিক্স' (রাজনীতির কবি) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে শুরু থেকেই চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছিল। সে সময় নিউজউইকের এ মূল্যায়ন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দিকে বিশ্বের দৃষ্টি ফেরাতে সহায়তা করে।

সাহিত্যের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে আমি মনে করি, প্রত্যেক রাজনৈতিক নেতাই একজন কবি। কবিদের মতো রাজনৈতিক নেতারাও তাঁদের জনগণকে একটি স্বপ্নের জগতে নিয়ে যান। বঙ্গবন্ধুও ছিলেন সে ধরনের একজন বড়োমাপের কবি, একজন রাজনীতির কবি, যিনি তাঁর দেশের মানুষকে স্বপ্নে বিভোর, মন্ত্রমুগ্ধ করতে পেরেছিলেন। সে স্বপ্ন ছিল হাজার বছরের পরাধীনতার শিকল ভেঙে একটি স্বাধীন দেশ পাওয়ার, প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার। কবিরা স্বপ্ন দেখেন, স্বপ্ন দেখান, স্বপ্নকে বাস্তব করার কথা না-ও ভাবতে পারেন। একজন রাজনীতির কবি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর বিশেষত্ব হচ্ছে, তিনি যে স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তাঁর জনগণকে যে স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর করেছিলেন, তিনি তা বাস্তবে রূপ দিতে সমর্থ হয়ে ছিলেন। এ দেশের হাজার

বছরের ইতিহাসে অনেক বড়ো বড়ো নেতা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি। একমাত্র বঙ্গবন্ধুই হাজার বছরের লালিত স্বপ্নপূরণে সফল হয়েছিলেন। আর তাই তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালি জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি এবং জাতির পিতা। বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু অবিচ্ছেদ্য। যত দিন বাংলাদেশ থাকবে, তত দিন বঙ্গবন্ধুও থাকবেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুকে খাটো করে দেখানোর ষড়যন্ত্র কখনো সফল হয়নি। বরং ষড়যন্ত্রকারীই বারবার ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

বহুলপ্রত্যাশিত স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক–ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির কবি' খ্যাতি এনে দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনে অসংখ্য জনসভায়, অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছেন। তাঁর প্রতিটি ভাষণই একেকটি কবিতা। ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল তাঁর সেরা ভাষণ, 'মাস্টারপিস'। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, নেতৃত্বের মোহনীয়তা, জ্ঞানের প্রগাঢ়তা, চিন্তার গভীরতা, ব্যক্তিত্বের বিশালতা–সব দিক থেকেই তিনি তখন চূড়ান্ত শিখরে। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধারা যখন এ ভাষণ শুনতেন, তাঁরা এক অসাধারণ মানসিক শক্তি পেতেন। অর্ধশতাব্দী পরও আমরা যখনই এই বিশ্বসেরা ভাষণ শুনি, রক্তে একটা আলোড়ন অনুভব করি। এ ভাষণের শব্দগুলো এমনি এক বিস্ময়কর গাঁথুনিতে গাঁথা যে, এর একটি শব্দও এদিক-ওদিক করার সাধ্য কারো নেই। কেউ এতে কলম ধরতে পারবে না। আমরা যখন এটি পড়ি, আমরা যখন এটি শুনি–আমাদের কাছে মনে হবে এক অবিস্মরণীয় শক্তিধর কবিতা, কখনো গদ্য মনে হয় না।

জনসমাবেশে তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় অত্যন্ত দক্ষ বঙ্গবন্ধুর আরেকটি সহজাত গুণ ছিল লেখালেখি। এ ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভা ছিল অসাধারণ। দৈনিক ইত্তেহাদসহ বেশ কিছু পত্রপত্রিকায় সাংবাদিকতায় তাঁর দক্ষতা আমরা লক্ষ করি। এ ছাড়া বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' (বঙ্গবন্ধুর প্রায় ১৩ বছরের কারাবাসের দৈনন্দিন ডায়েরির ওপর গ্রন্থ) 'আমার দেখা নয়াচীন' এবং 'স্মৃতিকথা' (প্রকাশের অপেক্ষায়) গ্রন্থে আমরা তাঁর স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ সৃজনশীল লেখালেখির প্রতিভা লক্ষ করি।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়–জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচির অংশ হিসেবে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের ৭ই মার্চের ভাষণ ও এর পটভূমি নিয়ে ব্যাপক পড়াশোনা করতে

হয়। এসব ছাত্রছাত্রীকে বিশ্বসেরা অন্য ভাষণগুলোও অধ্যয়ন করতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের 'দ্য গেটিসবার্গ অ্যাড্রেস', মার্কিন মানবতাবাদী নেতা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের 'আই হ্যাভ এ ড্রিম' এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার 'লং ওয়াক টু ফ্রিডম' (আত্মজীবনী ও ভাষণসমূহ)। রেফারেন্স হিসেবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল, সোভিয়েত নেতা ভ্লাদিমির লেলিন, গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠাতা মাও সে তুং, ভিয়েতনামের নেতা হো চি মিন, ভারতের অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতা মহাত্মা গান্ধী এবং ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহেরুর ভাষণগুলো শিক্ষার্থীদের পড়ানো হয়।

বিশ্বসেরা ভাষণগুলোর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের অবস্থান সবার ওপরে। এটি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ। এই ভাষণের বিশেষত্ব হচ্ছে, কোনো ধরনের স্ক্রিপ্ট বা টকিং পয়েন্টস ছাড়াই বঙ্গবন্ধু একেবারে এক্সটেম্পো এই ভাষণ দেন। বর্তমানে প্রাপ্ত স্ক্রিপ্ট অডিও-টেপ শুনে তৈরি করা। আরেকটি বিশেষ দিক হচ্ছে, বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দিয়েছেন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। এ ধরনের প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে ভাষণ দিতে আমরা আর কোনো নেতাকে দেখি না। আব্রাহাম লিংকনের সেরা ভাষণ 'দ্য গেটিসবার্গ অ্যাড্রেস' ছিল মাত্র তিন মিনিটের, শব্দসংখ্যা ২৭৫-এরও কম। 'ব্যাটেল অব গেটিসবার্গ'-এ নিহত সৈন্যদের স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত এ ভাষণের স্ক্রিপ্ট পূর্বে তৈরি করা ছিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল তাঁর সেরা ভাষণ 'নেভার ওয়াজ সো মাচ ওড বাই সো মেনি টু সো ফিউ' দিয়েছিলেন 'ব্যাটল অব ব্রিটেন' যুদ্ধে রয়েল এয়ার ফোর্সের নিহত পাইলটদের স্মরণে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর একক নেতৃত্বে দীর্ঘ দুই যুগের মুক্তিসংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে আন্দোলনরত নেতাকর্মীদের পক্ষ থেকে অনতিবিলম্বে স্বাধীনতার ঘোষণার দাবিতে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে পড়েন। নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার গড়িমসি-ছলচাতুরী থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার এই চাপ তৈরি হয়। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নোর যুক্তফ্রন্ট, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয় দফা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের সাধারণ নির্বাচন-পরবর্তী অসহযোগ আন্দোলনের পর বাঙালিরা ঘোষণা করে, তারা স্বাধীনতা ছাড়া আর ঘরে ফিরবে না। অন্যদিকে পাকিস্তানি জান্তার ভাষায় একপক্ষীয় স্বাধীনতা ঘোষণা

বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং তারা যেকোনো মূল্যে তা দমন করবে। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতা বঙ্গবন্ধু কখনো বিচ্ছিন্নতাবাদী দুর্নাম মেনে নিতে রাজি ছিলেন না।

স্বাধীনতাযুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক সহায়তা ও সহানুভূতিও বঙ্গবন্ধুর বিবেচনায় ছিল। এ জন্যই তাঁকে ৭ই মার্চের ভাষণের শব্দ নির্বাচন করতে হয়েছে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে, অনেক কৌশলী হয়ে। তিনি কতটা কৌশলী ছিলেন! বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণের শেষ দিকে আসন্ন যুদ্ধে শত্রু মোকাবিলায় যার যা কিছু আছে তা নিয়ে তৈরি থাকতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং সর্বাত্মক নির্দেশনা প্রদান করেন। অবশ্য ভাষণের প্রায় মাঝামাঝিতে ২৫ মার্চ ডাকা অ্যাসেম্বলি সেশনে যোগ দেওয়ার বিষয় চিন্তা-ভাবনা করতে বঙ্গবন্ধু চারটি শর্ত দেন। এসব শর্তের মধ্যে ছিল–মার্শাল 'ল' প্রত্যাহার, সেনা সদস্যদের ব্যারাকে ফেরানো, বাঙালি হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করা এবং জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সর্বাত্মকভাবে প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়ে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা 'আমরা ভাতে মারব। আমরা পানিতে মারব'। এই ভাষণের পরপরই পাকিস্তানি সৈন্যদের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'তোমরা আমার ভাই–তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না'। ভাষণে বঙ্গবন্ধু চলমান হরতালে সরকারি, আধাসরকারি অফিস, আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ অব্যাহত থাকবে বলে ঘোষণা দেন। একই সাথে দরিদ্র মানুষের দুর্ভোগ বিবেচনা করে রিকশা, ঘোড়াগাড়ি, রেল, লঞ্চ প্রভৃতি হরতালের বাইরে রাখার ঘোষণা দেন। ভাষণে পাকিস্তানি সামরিক জান্তাকে লক্ষ করে বঙ্গবন্ধুর সেই কঠোর হুঁশিয়ারি, 'আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকের উপর হত্যা করা হয়...'; 'কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না, ভালো হবে না' সেই থেকে সবার মুখে মুখে। একই ভাষণে দেশবাসীর প্রতি বঙ্গবন্ধুর আকুতি, 'এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-নন-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আমাদের ওপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়...মনে রাখবেন'। এভাবে এই ঐতিহাসিক ভাষণে আমরা কোমল হৃদয়ের মানবিক বঙ্গবন্ধু এবং একই সাথে লক্ষ্য অর্জনে অবিচল, কঠোর ও আপসহীন বঙ্গবন্ধুকে দেখতে পাই।

কথোপকথনের ভঙ্গি ৭ই মার্চের ভাষণকে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করেছে। বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি শাসকদের শোষণ ও নির্যাতনের পুরো ইতিহাস সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী এ ভাষণে উঠে এসেছে। বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে বিশাল জনসভায় জনতা, ভয়াবহ সাইক্লোনে মহাসাগরের তীব্র ঢেউয়ের মতো উদ্বেলিত হতে থাকে। তাঁর উদাত্ত আহ্বান পুরো বাঙালি জাতিকে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের জন্য তৈরি করে তোলে।

ভাষাশৈলী ও যোগাযোগের বিবেচনা থেকেও বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ভাষা শিক্ষণ জ্ঞানের আলোকে আমরা জানি, পুরোপুরি বোধগম্য যোগাযোগের জন্য একজন ব্যক্তি প্রতি সেকেন্ডে সর্বোচ্চ তিনটি শব্দ উচ্চারণ করতে পারেন। জনসমাবেশে ভাষণের ক্ষেত্রে বোধগম্য যোগাযোগের জন্য বক্তাকে আরো অনেক ধীরগতিতে কথা বলতে হয়। শত শত লাউড স্পিকার ব্যবহার করে রেসকোর্স ময়দানে ১০ লাখের বেশি মানুষের বিশাল সমাবেশে সর্বোচ্চ বোধগম্য যোগাযোগের জন্য শব্দের এই হিসাব হবে সাধারণ শব্দসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। তাত্ত্বিক এ হিসাবের সাথে বঙ্গবন্ধুর সে ভাষণের শব্দসংখ্যা একবারে মিলে যায়। প্রায় ১৯ মিনিটের সে ভাষণে শব্দসংখ্যা ১,১০৭। অসাধারণ বক্তা বঙ্গবন্ধু বোধগম্য যোগাযোগের সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে সে ভাষণে প্রতি মিনিটে গড়ে ৫৮ থেকে ৬০টি শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন।

একেবারে এক্সটেম্পো ৭ই মার্চের ভাষণে কোনো শব্দের অনর্থক পুনরাবৃত্তি বা কোনো অপ্রাসঙ্গিক শব্দ দেখা যায় না। অবশ্য দু-একটি ক্ষেত্রে বক্তব্যে জোর দেওয়ার জন্য শব্দের পুনরাবৃত্তি দেখা গেছে। গণমানুষ থেকে ওঠে আসা সহজাত নেতা বঙ্গবন্ধু তাঁর ভরাট কণ্ঠ, উচ্চারণ, স্বরের ওঠানামা, ব্যক্তিত্ব, বডি ল্যাংগুয়েজ বিশেষ করে তর্জনী উঁচিয়ে সেরা সেই ভঙ্গির মাধ্যমে এতটাই সহজবোধ্য ছিলেন যে সে বিশাল সমাবেশে উপস্থিত প্রত্যেকে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন। ভাষণ দেওয়ার সময় সমাবেশে প্রতিটি অংশের দর্শক-শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তিনি যেভাবে ঘুরছিলেন, সে কৌশলও ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ভাষণে গণমানুষের মুখের ভাষা ব্যবহার এটিকে আরো ফলপ্রসূ করেছে। যেমন বঙ্গবন্ধু ভাষণে পাকিস্তানি সৈন্যদের উদ্দেশ করে বলেছেন, 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।' এখানে আঞ্চলিক ভাষার শব্দচয়ন বক্তব্যকে অনেক বেশি বলিষ্ঠ করেছে।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের এ অতুলনীয় দক্ষতা বঙ্গবন্ধু বহু বছরের সাধনায় অর্জন করেছেন। তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ ভাষণ দিয়েছেন তাৎক্ষণিকভাবে, কোনো ধরনের পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই। ডায়াস থেকে জনসমাবেশের মানুষ দেখেই তাৎক্ষণিক বক্তব্য তৈরি করার এক অসাধারণ মেধা তাঁর ছিল। কারো সাথে কোথাও কথা বললে দীর্ঘদিন পরও তিনি তাকে মনে রাখতে পারতেন। এমনকি নামও মনে রাখতে পারতেন। তাঁর স্মরণশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি মানুষের মনের ভাষা বুঝতেন। আর তাই তিনি ছিলেন সারা দেশের গণমানুষের নেতা।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ইউনেস্কোর 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার'-এ বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই অন্তর্ভুক্তির আগে 'ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা কমিটি'র সদস্যগণ ২০১৭ সালের ২৪ থেকে ২৭ অক্টোবর প্যারিসে সংস্থাটির সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে একটি জাতিরাষ্ট্র সৃষ্টিকারী এ জ্বালাময়ী ভাষণের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মূল্যায়ন করেন। মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ বারবার ভাষণের ভিডিও দেখেন এবং বিস্মিত হন– ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি উঁচু একজন বাঙালি নেতা তাঁর শব্দের বিস্ফোরণে স্লোগানে স্লোগানে প্রকম্পিত জনতার সমুদ্রে কীভাবে ঝড় তুলে চলেছেন! ইউনেস্কো বলেছে, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে এমন অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের আহ্বান জানানো হয়েছে, যেখানে সকল জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হয়। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের অন্তর্নিহিত বাণী এখনো প্রাসঙ্গিক বলে বিশ্ববাসীকে এটি এখনো উদ্দীপ্ত করে বলে ইউনেস্কোর ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ, ঢাকা

দুর্নীতি প্রতিরোধ : শুধু আইন নয়, বদলাতে হবে মানসিকতা

মো. রমজান আলী

দুর্নীতি অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের অন্যতম একটি সমস্যা। বর্তমান সমাজে দুর্নীতি বিষয়টি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকসহ অন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হচ্ছে। দুর্নীতি যেকোনো দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বাধা। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশসহ (টিআইবি) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নির্ভরযোগ্য গবেষণা অনুযায়ী কার্যকর দুর্নীতি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হলে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার আরো ১০ শতাংশের বেশি হতে পারত। দুর্নীতি একটি বৈশ্বিক প্রপঞ্চ এবং বিশ্বায়নের সংস্কৃতিতে বাংলাদেশের সমাজে দুর্নীতির ছাপ দেখা যায়। দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা, আইনের শাসন, গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, সুশাসন, উন্নয়ন, দারিদ্র্যমোচন ও সার্বিকভাবে ইতিবাচক সমাজ পরিবর্তনের পথে দুর্নীতি এক কঠোর প্রতিবন্ধক। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য এখনই কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অতীত থেকে দুর্নীতির ক্রমাগত ধারা বহমান এবং একাডেমিকভাবে দুর্নীতি বিষয়টিকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দিয়ে গবেষণা করা হয়।

সাধারণভাবে অনৈতিক সুবিধা গ্রহণের প্রত্যাশায় ক্ষমতার অপব্যবহারকেই দুর্নীতি বলা হয়। অর্থাৎ ঘুষ, চাঁদাবাজি, অপহরণ, প্রতারণা, জালিয়াতি ইত্যাদি দুর্নীতি হিসেবে পরিগণিত হয়। দুর্নীতি ওই ব্যক্তিকেই দিয়ে হবে, যার রাজনৈতিক পদমর্যাদা, দাপ্তরিক স্ট্যাটাস ও সামাজিক অবস্থান সুসংহত হওয়ায় প্রভাব খাটিয়ে ব্যক্তিগত ও সংগঠনের সুবিধার্থে অবৈধ কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। কাজেই দুর্নীতির পরিধি ব্যাপক এবং এর সঙ্গে নানা প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিও জড়িত। জবাবদিহি ও দায়িত্ববোধের সুস্পষ্ট লঙ্ঘনের কারণেই স্বাভাবিকভাবে দুর্নীতির ছায়া সবখানেই ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'একাত্তরের মতো প্রতিটি ঘরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দুর্গ গড়ে তুলতে হবে।' যেখানে তিনি আরো বলেন, 'দুর্নীতিবিরোধী আইনের কথা, দুর্নীতিবাজ কাউকে ছাড় না দেওয়ার

কথা, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার কথা, রাজনৈতিক সদিচ্ছার কথা এবং ছাত্র, তরুণ, বুদ্ধিজীবীসহ সব নাগরিকের সংঘবদ্ধ গণ-আন্দোলনের কথা।' কিন্তু তাঁর সে প্রত্যয় বাস্তবায়নের আগেই তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।

আইনের বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকারকে সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকের দুর্নীতি, জালিয়াতি ও আর্থিক কেলেঙ্কারির সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গকে বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান; বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় পেশাদারি উৎকর্ষ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমন্বিত ও পরিপূরক কৌশল গ্রহণ; সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান ও সদস্যদের নিয়োগে যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণ এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নিয়োগদান; তথ্য অধিকার আইনে ব্যবসায়, রাজনৈতিক দল ও গণমাধ্যমকে অন্তর্ভুক্তিকরণ; তথ্য প্রকাশকারী ও তথ্যের আবেদনকারী উভয় ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং নেতৃত্ব পর্যায়ে সৎ সাহস, দৃঢ়তা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে হলে প্রথমেই দরকার শুদ্ধাচারের যথাযথ বাস্তবায়ন। এটা হলে সরকারি কর্মকর্তাদের কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে এবং স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ হবে। এ ব্যাপারে সরকারের নীতিনির্ধারক এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের কঠোর নজরদারি বৃদ্ধি করতে হবে। দ্বিতীয়ত, যারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, আয়ের সঙ্গে সংগতিহীন অর্থসম্পদ যাদের পাওয়া যাবে, তাদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে কেউ যেন দলীয় বা রাজনৈতিক আনুকূল্য না পান, তা নিশ্চিত করতে হবে। এই দুটি পদক্ষেপ নিলেই পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হবে এবং অন্যরা তখন দমে যাবে।

দুর্নীতির প্রতিরোধ ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণের অপরিহার্যতার স্বীকৃতি পাওয়া যায় বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি, নির্বাচনি ইশতেহার, সরকারের বার্ষিক বাজেট বক্তৃতা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, দীর্ঘমেয়াদি ভিশন ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের মতো গুরুত্বপূর্ণ দলিলে যেখানে, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ আছে। এসবেরই সমর্থনে ও সহায়ক ভূমিকার প্রয়াসে গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ ও বেসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে দুর্নীতিবিষয়ক তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন বা প্রকাশ করে থাকে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনের সদস্যভুক্ত হওয়া, তথ্য অধিকার আইন, তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইন ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল দুর্নীতি দমনে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পেরেছে। এসবের ফলে

বাংলাদেশের দুর্নীতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, এমনটি বলা যাবে না। তবে যে সংস্কারগুলো হয়েছে তার প্রয়োগ ও চর্চা নিশ্চিত করতে পারলে কার্যকর দুর্নীতি প্রতিরোধ মোটেই অসম্ভব নয়।

বাংলাদেশে দুর্নীতির কারণ ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রাষ্ট্র নিরপেক্ষভাবে অপরাধীদের জন্য উপযুক্ত বিচারের ব্যবস্থা করেছে। প্রেক্ষিতে দুর্নীতিবাজরা আইনের মুখোমুখি হচ্ছে এবং আদালতে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি পাচ্ছে, মানি লন্ডারিং ও অর্থায়নের সাথে জড়িতদের আইনের মুখোমুখি করে বিচার করা হচ্ছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, শাস্তির ভয়ে নতুন করে দুর্নীতির মতো ঘৃণ্য ও জঘন্য অপরাধের সাথে খুবই কমসংখ্যক সম্পৃক্ত হচ্ছে এবং দুর্নীতিবাজদের জন্য উদ্ভূত নানা পরিস্থিতিকে প্রতিকার ও প্রতিরোধের মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মকে সন্ত্রাসবাদে নিরুৎসাহী করে তুলেছে সরকার। সাম্প্রতিক সময়ে সরকার দুর্নীতি নিয়ে বেশ সরগরম অবস্থায় চলছে। চলমান পরিস্থিতিতে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপকে সকল পক্ষের লোকজন সাধুবাদ জানিয়েছে এবং অনেকেই আশার আলো দেখছেন। মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্য অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সরকারের গ্রহণীয় পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছেন। সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে দল থেকেই আসুক না কেন, অপরাধী অপরাধীই; তাঁর কোনো দলীয় পরিচয় থাকতে পারে না, সন্ত্রাসবাদের ন্যায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণের কৌশলই দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকার সফল হচ্ছে। বর্তমান সরকার থেকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হচ্ছে, উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ পেলে যে কারোর বিরুদ্ধে দুর্নীতিবিরোধী চলমান গ্রেফতার কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে কেউ দুর্নীতি করার পূর্বে অন্তত কয়েকবার চিন্তা-ভাবনা করেই দুর্নীতি না করার সিদ্ধান্ত নেবে।

পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ, তদারকি, জনগণকে সচেতন করার মাধ্যমে বর্তমান সরকার দুর্নীতির অভিশাপ থেকে রাষ্ট্রকে মুক্তি দিতে বদ্ধপরিকর। সাম্প্রতিক সময়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের যে অবস্থান তা যথাযথভাবে কার্যকর করা সম্ভব হলে কেউই আর দুর্নীতি করতে সাহস পাবে না কিংবা কেউই অনুপ্রেরণা তথা মদদ জোগাবে না। দেশপ্রেমের মহিমা ও বিবেকবোধের মেলবন্ধন ব্যতীত দুর্নীতি প্রতিরোধ কখনোই সম্ভব নয়। উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, দুর্নীতি একটি সামাজিক ব্যাধি। কাজেই দুর্নীতিকে সমাজ থেকে সমূলে উৎখাতের জন্য সরকার গৃহীত দীর্ঘমেয়াদি

পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করতে হবে। দুর্নীতির সংজ্ঞা আমরা নিজেদের মতো করে পাল্টে নিয়েছি। সমাজের প্রতিটি স্তরেই যার যেটুকু ক্ষমতা আছে, সেটি ব্যবহার করেই অবৈধ অর্থ বা সুবিধা অর্জনকে আমরা রীতিমতো অধিকার বলে মানছি। যার যতদূর ক্ষমতা আছে, তার জোরেই আইন বা প্রশাসনকে অবজ্ঞা করে চলছে অবৈধ পথে উপার্জন। শুধু আইন প্রয়োগ করে বা শাস্তি দিয়ে দুর্নীতির এই পাহাড়কে টলানো যাবে না। দুর্নীতি দূর করতে হলে এই সংস্কৃতির পরিবর্তন দরকার, প্রয়োজন আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন আর নিজের সুবিধা অনুযায়ী ন্যায়-অন্যায়ের সংজ্ঞা ঠিক না করে ভেজাল, দুর্নীতি, ঘুষসহ সব ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া। এই জটিল ইস্যু থেকে উত্তরণে শীর্ষ হতে তৃণমূল পর্যন্ত জবাবদিহির চর্চা লালন ও পালন করতে হবে। সুতরাং আমাদের স্ব স্ব কর্মস্থলে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সদিচ্ছা, দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহি থাকলে দুর্নীতি প্রতিরোধ কোনোক্রমেই অসম্ভব নয়।

লেখক : সহকারী তথ্য অফিসার, জেলা তথ্য অফিস, সাতক্ষীরা

অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর অবদান

সেলিনা আক্তার

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের শুরুতেই জাতির পিতা মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতনের শিকার নারীদের পুনর্বাসনের জন্য নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। স্বাধীনতা লাভের ৯ মাসের মধ্যে বঙ্গবন্ধু জাতিকে উপহার দেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান। যে সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী'। ২৮(১) অনুচ্ছেদে রয়েছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না' এবং ২৮(২) অনুচ্ছেদে আছে, 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করিবেন'। সরকার গঠনের শুরু থেকেই নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে জাতির পিতার নির্দেশনা ছিল। দেশে রাজনীতি ও প্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বঙ্গবন্ধু সরকারই প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে।

সমাজে প্রতিটি ক্ষেত্রই নারীদের চলাচল এবং বসবাসের জন্য হবে নির্বিঘ্ন। যার নিশ্চিত পরিবেশ আমাদেরই তৈরি করতে হবে। নারীর কর্মক্ষেত্র আরো বেশি নির্বিঘ্ন করতে হবে। ২০৪১ সালে উন্নত দেশের যে লক্ষ্য নিয়ে দেশ এগিয়ে চলেছে তা পূরণ করতে হলে পুরুষের সঙ্গে নারীকেও এগিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের উন্নয়নের রোল মডেল। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তথ্য ও প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে। এ জন্য আমাদের রয়েছে বিশাল জনসংখ্যা। এই বিশাল জনসংখ্যার অংশ হলো নারী ও পুরুষ। যে দেশগুলো বিশ্বে উন্নত দেশের কাতারে দাঁড়াতে পেরেছে সেসব দেশই নারীর ক্ষমতায়নের পথ সুগম করেছে। একসময় যে যে ক্ষেত্রগুলোতে নারীর অংশগ্রহণ চিন্তা করা যেত না অথবা সামাজিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যেত সেই ক্ষেত্রগুলো এখন মুক্ত। ফলে নারীরা স্বাধীনভাবে এসব ক্ষেত্রে অংশ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। দেশ যতই এগিয়ে চলেছে পুরুষের সঙ্গে

সঙ্গে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীর ক্ষমতায়ন হলো দেশের উন্নয়নকাজে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ।

আজ প্রতিটি কাজে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষ, কৃষি, শিল্প, ব্যাবসা-বাণিজ্য, প্রবাস, আইসিটি মোটকথা অর্থনীতির প্রতিটা ক্ষেত্রে নারীর অবদান বাড়ছে। যেখানে নারীরা ঘরের কাজ করত এখন সেখানে কেউ চাকরি, কেউ ব্যাবসা করছে। বাংলাদেশে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংসার পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে তারা চাকরি না হয় ব্যাবসা করছে। গ্রামে প্রায়ই ছোটোখাটো দোকান চালাতে দেখা যায় নারীদের। ঘরে বসে আজ ই-কমার্সের যুগে নারীরা ব্যাবসা করছেন বাংলাদেশে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, দেশে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১০ সালে যেখানে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা ছিল ১৬.২ লাখ সেখানে ২০১৬-১৭ সালে এসে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৮.৬ লাখ।

১৯৭৪ সালে শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ ছিল মাত্র ৪ শতাংশ, ২০১৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩৫.৬ শতাংশে এটি শ্রমবাজারে পুরুষ শ্রমিকের হার বৃদ্ধির তুলনায় বেশি। পরিসংখ্যান ব্যুরোর শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, বিগত বছরগুলোতে শ্রমবাজারে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলোর একটি হচ্ছে শ্রমবাজারে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নারীর অংশগ্রহণ। ইতিবাচক বিষয় হচ্ছে, গ্রমীণ নারীদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার শহরের নারীর তুলনা বেশি।

এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্টের (এসিডি) জরিপ অনুযায়ী, দেশের মোট ৪২ লাখ ২০ হাজার পোশাক শ্রমিকের মধ্যে নারীর সংখ্যা ২৪ লাখ ৯৮ হাজার। পোশাক খাতের পরই প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশি নারী শ্রমিকরা দেশের অর্থনীতির চাকা ঘোরাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। বিদেশে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন রকম নির্যাতনের শিকার হয়ে তাঁদের অনেকে দেশে ফিরে আসছেন। বহু নারী প্রবাসে শত কষ্ট সহ্য করেও গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতে যাচ্ছেন। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর তথ্যে ১৯৯১ থেকে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে মোট ৯ লাখ ৩৫ হাজার ৪৬৬ জন নারী প্রবাসে কাজ করতে গেছেন।

শহরে কর্মজীবী নারীর সঙ্গে গ্রামীণ নারীরাও হাতের কাজ যেমন–নকশিকাঁথা থেকে শুরু করে হাঁস-মুরগির খামার, গাভি পালন, কৃষিকাজ ইত্যাদি নানাভাবে

সংসারের আর্থিক অবস্থা পুনর্গঠনে সাহায্য করেছে এবং কোনো কোনো সংসারে আর্থিক আয়ে নারীই প্রধান ভূমিকা পালন করছেন। কর্মক্ষম নারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নারী কৃষিকাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

কৃষি তথ্য সার্ভিস থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেশে মোট কর্মক্ষম নারীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় কৃষিকাজে নারী শ্রমশক্তির ৭১.৫ শতাংশ নিয়োজিত কৃষিকাজে। প্রবাসী আয়প্রাপ্তির দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে সপ্তম। নিঃসন্দেহে এ অবস্থানে নিয়ে যেতে দেশের নারী শ্রমিকরাও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছেন। অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তারাও। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) সূত্রে, বর্তমানে দেশে তিন লাখ মানুষ অনলাইনে ব্যাবসা পরিচালনা করছেন আর এদের অর্ধেকই নারী ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তা। এই উদ্যোক্তরা নিজের পণ্য বিক্রির মাধ্যমে মাসে সর্বনিম্ন ১০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করছেন। দেশে গত এক দশকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সংঙ্গে যুক্ত প্রায় এক কোটি ৩০ লাখ বাড়তি শ্রমশক্তির মধ্যে ৫০ লাখই নারী।

বাংলাদেশের আজ যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি এর পেছনে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবদান রয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা কিন্তু অতীতকাল থেকেই অবহেলিত। পৃথিবীতে আজ আমরা যে অধিকারবলে চিৎকার করি সে অধিকার আদায়ের শুরুটা পৃথিবীর আলো দেখিয়ে একজন নারীই করেছে। দিনবদলের সঙ্গে সঙ্গে নারীদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ তৈরি করে নিতে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। নারীদের কাজের ক্ষেত্র বেড়েছে। ঘরের কোণ থেকে বের হয়ে আজ মহাশূন্য পর্যন্ত তাদের পদচিহ্ন রাখছে সফলতার সঙ্গে। তবে কাজের ক্ষেত্র বাড়লেও কমেনি নারীর ওপর সহিংসতার হার। তাদের ধর্ষণ করা হচ্ছে, কুপিয়ে রাস্তায় ফেলে রাখা হচ্ছে, বাসে-ট্রামে গণধর্ষণ শেষে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এত সব করেও নারীরা আমাদের উন্নয়নের অগ্রযাত্রার সমান অংশীদার। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অর্ধেক শক্তি। নারী শক্তি বাদ দিয়ে দেশের অগ্রযাত্রা অসম্ভব।

বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার দর্শন অনুসারে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের নতুন ধারা সূচিত করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত উদ্যোগের ফলে উচ্চশিক্ষাসহ সকল ধরনের শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের শতভাগ অংশগ্রহণ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্যোক্তা তৈরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সুরক্ষা ও নারীর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধ ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের পাশাপাশি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারীর নিরাপত্তা, সুরক্ষা, বাল্যবিয়ে ও যৌতুক প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছে। নারী ও শিশুর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় পর্যায়, বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটিগুলো পুনর্গঠন করা হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন কঠোরভাবে দমন এবং প্রতিরোধ কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ধারা ৯-এর উপধারা (১)-এর অধীন ধর্ষণের অপরাধের জন্য 'যাবজ্জীন সশ্রম কারাদণ্ড' শাস্তির পরিবর্তে 'মৃত্যুদণ্ড' করা হয়েছে।

বিশ্ব অর্থনীতি ফোরাম ২০২০-এর প্রতিবেদন অনুসারে, নারী-পুরুষের বৈষম্য হ্রাস করে সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের দক্ষিণ এশিয়ায় একেবারে শীর্ষে। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে সপ্তম। বাংলাদেশ আজ নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বিশ্বে রোল মডেল। এরই স্বীকৃতি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ সালে 'পিস টি', ২০১১ ও ২০১৩ সালে দুইবার 'সাউথ সাউথ', ২০১৬ সালে 'প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন', ২০১৬ সালে 'এজেন্ট অব চেঞ্জ' ও ২০১৮ সালে 'গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অর্থনীতির সকল কার্যক্রমে নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে ২০৪১ সালের পূর্বেই বাংলাদেশ উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে।

লেখক : সহকরী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য পর্যটন

মাহবুবুর রহমান তুহিন

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ উদযাপিত হবে বিশ্ব পর্যটন দিবস। জাতিসংঘের পর্যটন বিষয়ক সংস্থা 'ইউএনডব্লিউটিও এ বছরের পর্যটন দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে। 'Tourism for inclusive Growth' -অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির জন্য পর্যটন। কোভিড-১৯ মহামারি বিশ্বব্যাপী আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে তীব্র আঘাত হেনেছে। নাগরিকদের ঘরে থাকতে বাধ্য করেছে। ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পর্যটনশিল্প। লাখ লাখ মানুষ বেকার হয়েছে। অর্থনৈতিক অগ্রাযাত্রা থমকে গেছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। করোনার আঘাতে বেশি পর্যুদস্ত হয়েছে উন্নয়নশীল দেশসমূহ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। আশার কথা হলো, করোনার প্রকোপ কমে আসায় পৃথিবী আবার সচল হতে শুরু করেছে। আবার নতুন, আঙ্গিকে, নতুন উদ্দীপনায় মানুষ জীবনের আহ্বানে নিয়োজিত হচ্ছে। পর্যটনশিল্পও ধীরে ধীরে সচল হতে শুরু করেছে। ইউএনডব্লিউটিওর প্রত্যাশা সবাইকে নিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের দীপ্ত শপথে এবারের বিশ্ব পর্যটন দিবস উদযাপন পালন এক নতুন মাত্রা যোগ করবে।

অজানাকে জানার, অদেখাকে দেখার কৌতূহল মানুষের চিরন্তন। 'থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে'–এই বোধে উদ্দীপ্ত মানুষ ঘর থেকে পা ফেলতে শুরু করে। সেই থেকে শুরু পর্যটনের পথচলা। সময়ের সাথে পৃথিবীর পথে চলতে চলতে পর্যটন বৃহৎ শিল্পে পরিণত হয়েছে এবং এই শিল্পের ক্রমবর্ধমান অগ্রযাত্রা বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির বৈশ্বিক অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্ভোগের জন্য যখন শিল্পায়নকেও দায়ী করা হচ্ছে তখন বিশ্বে পরিবেশবান্ধব সম্প্রসারণশীল হিসেবে বিকাশ হচ্ছে পর্যটনশিল্পের, যা টেকসই উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার।

অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশ। এর রূপে আকৃষ্ট হয়ে আবহমানকাল ধরে বিখ্যাত পরিভ্রাজকগণ এখানে ছুটে এসেছেন। বিখ্যাত পর্যটন ইবনে বতুতা, চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাং এ দেশের সৌন্দর্যের কথা তাঁদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি

ও দারিদ্র্য দূরীকরণে পর্যটনশিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বর্তমান সরকার পর্যটনশিল্পের বিকাশের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০-এ পর্যটনশিল্পকে অগ্রাধিকারমূলক খাত হিসেবে চিহ্নিতকরণ, জাতীয় পর্যটন নীতিমালা-২০১০ প্রণয়ন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড প্রতিষ্ঠাসহ নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে।

২০১৭ সালে বিশ্বের জিডিপিতে ট্যুরিজমের অবদান ছিল ১০.৪ শতাংশ, যা ২০২৭ সালে ১১.৭ শতাংশে গিয়ে পৌঁছাবে। এ ছাড়া ২০১৭ সালে পর্যটকদের ভ্রমণ খাতে ব্যয় হয়েছে ১৮৯৪.২ বিলিয়ন ডলার। আর একই বছর পর্যটনে বিনিয়োগ হয়েছে ৮৮২.৪ বিলিয়ন ডলার। পর্যটনকে বলা হয় একটি শ্রমবহুল ও কর্মসংস্থান তৈরির অন্যতম হাতিয়ার। বর্তমানে পৃথিবীর ১০টি কর্মসংস্থানের মধ্যে একটি কর্মসংস্থান তৈরি হয় পর্যটন খাত। ২০১৭ সালে প্রায় ১১ কোটি ৮৪ লাখ ৫৪ হাজার কর্মসংস্থান তৈরি হয় পর্যটন খাতে, যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খাত মিলিয়ে প্রায় ৩১ কোটি ৩২ লাখ। অর্থাৎ মোট কর্মসংস্থানের ৯.৯ শতাংশ তৈরি হয় পর্যটন খাতে। এ ছাড়া ২০১৭ সালে পর্যটকদের ভ্রমণ খাতে ব্যয় হয়েছে ১৮৯৪.২ বিলিয়ন ডলার।

সারা বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশ এ শিল্পে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। ২০১৭ সালে বাংলাদেশের জিডিপিতে পর্যটনশিল্পের অবদান ছিল ৮৫০.৭ বিলিয়ন টাকা। এ খাতে এই পর্যন্ত কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে ২৪ লাখ ৩২ হাজার। তা ছাড়া ২০১৭ সালে ৬ লাখের বেশি বিদেশি পর্যটক বাংলাদেশে আসেন। একই বছর প্রায় ৪ কোটি দেশীয় পর্যটক সারা বাংলাদেশ ঘুরে বেড়োান। এতে দেখা যায়, বিদেশি পর্যটন আগমন খুব বেশি না বাড়লেও অভ্যন্তরীণ পর্যটনের ক্ষেত্রে একটি বিপ্লব হয়ে গেছে। এই বিপ্লবের ঢেউ বিদেশি পর্যটক আগমনকে আরো বৃদ্ধি করবে বলে সবাই আশাবাদী।

পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ এই দেশ মূলত হিমালয় অববাহিকার উর্বর পলল ভূমি সমৃদ্ধ। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, বক্ষপুত্র, সুরমা, কুশিয়ারা নদীবিধৌত এ ভূমির ইতিহাস, অগ্রযাত্রা, সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক জাগরণে নদীর ভূমিকা বিশাল, বিরাট ও ব্যাপক। তাই নদী হতে পারে এ দেশের পর্যটনের অন্যতম স্পট। নদীগুলোকে ট্যুরিস্ট প্রডাক্টে পরিণত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।

দেশের পর্যটন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু পৃথিবীর দীর্ঘতম অভগ্ন, বালুকাময় সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৭ সালে কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ৭৮ কি.মি. মেরিন ড্রাইভের উদ্বোধন করেন। মেরিন ড্রাইভকে

চট্টগ্রামের মিরসরাই পর্যন্ত সম্প্রসারণের কাজ চলছে। এটি বাস্তবায়িত হলে ব্যাপকসংখ্যক দেশি-বিদেশি পর্যটক আকৃষ্ট হবে আশা করা যায়। ফলে এ সেক্টরে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে। চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। রেল চলাচল শুরু হলে পর্যটকরা সহজে সুলভে এখানে আসতে পারবেন। কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করার কাজ চলছে। ২০১৫ সালে এর রানওয়ে ৬০০০ ফুট থেকে বাড়িয়ে ৯০০০ ফুট করা হয়েছে। পর্যটন এ নগরীর গুরুত্ব সময়ের সাথে বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এ বছরের ১৯ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী সমুদ্র থেকে ল্যান্ড ক্লেইম করে বিমানবন্দরের রানওয়ে আরো ১ হাজার ৭০০ ফুট বৃদ্ধির কাজ উদ্বোধন করেছেন। এর ফলে বোয়িং-৭৮৭ (ড্রিম লাইনার), বোয়িং-৭৭৭, বড়ো এয়ারবাস বিমানবন্দরে উড্ডয়ন ও অবতরণ করতে পারবে। ফলে পর্যটকরা সরাসরি এ পর্যটন নগরীতে আসতে সক্ষম হবে। এ ছাড়া এই বিমানবন্দরে ফুয়েলিং স্টেশন নির্মিত হবে। ফুয়েলিং স্টেশন নির্মিত হলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যগামী উড়োজাহাজ এখান থেকে ফুয়েল নিতে ল্যান্ড করবে। এতে করে এটি একটি ট্রানজিট পয়েন্ট হয়ে উঠবে। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিমানের যাত্রীরা কক্সবাজারে বেড়োনোর সুযোগ পাবেন। এভাবেই কক্সবাজার আগামী দিনের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটক আকর্ষণে কক্সবাজারে তিনটি পর্যটন পার্ক তৈরির পরিকল্পনা করেছে সরকার। প্রতিবছর এতে বাড়তি ২০০ কোটি মার্কিন ডলারের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ তিনটি ট্যুরিজম পার্ক হলো সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক, নাফ ট্যুরিজম পার্ক এবং সোনাদিয়া ইকো ট্যুরিজম পার্ক।

রয়েল বেঙ্গল টাইগারখ্যাত সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সুন্দরবন অতুলনীয় ও জীববৈচিত্র্যে অসাধারণ। এটি শুধু বাংলাদেশের মানুষের কাছে নয়, বিশ্বের প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে একটি আকর্ষণীয় স্থান। ৬ হাজার ১৭ কিলোমিটার আয়তনের এ বন লতাগুল্ম, ঘাস, গোলপাতাসহ ৩৫ প্রজাতির বৃক্ষ, ৫০ প্রজাতির সরীসৃপ, ৩২০ প্রজাতির পাখি, ৮ প্রজাতির উভচর প্রাণী এবং ৪০০ প্রজাতির মাছের বিপুল বিচিত্র সম্ভার এই বন। সুন্দরবন ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কোর ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্যের স্থান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। যথাযথ পরিচর্যা, পরিবেশবান্ধব পর্যটন ও ব্যাপক প্রচার এই বনকে বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন স্পটে পরিণত করতে পারে।

পর্যটনের অপার সম্ভাবনার নাম বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল। যা রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান নিয়ে গঠিত। পার্বত্য চট্টগ্রামে পর্যটনের মূল উপকরণ হলো পাহাড়ে ঘেরা সবুজ প্রকৃতি, যা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পর্যটকদের কাছে ধরা দেয়। এটি যেন ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতির রূপ বদলানোর খেলা। এখানে শীতে যেমন এক রূপ ধরা দেয় ভ্রমণপিপাসুদের কাছে, ঠিক তেমনি বর্ষায় অন্য এক রূপে হাজির হয়। শীতে পাহাড়, কুয়াশা আর মেঘের চাদরে যেমন ঢাকা থাকে, তার সঙ্গে থাকে সোনালি রোদের মিষ্টি আভা। আবার বর্ষায় চারদিক জেগে ওঠে সবুজের সমারোহ। এ সময় প্রকৃতি ফিরে পায় আরেক নতুন যৌবন। বর্ষায় মূলত অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিস্টদের পদচারণে সবচেয়ে বেশি থাকে এ পার্বত্য অঞ্চলে।

বাংলাদেশে পর্যটনশিল্পের অপার সম্ভাবনা বিরাজমান। কিন্তু এ বিশাল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এ শিল্প এখনো পিছিয়ে। এ জন্য প্রয়োজন সমন্বিত পরিকল্পনা। একসঙ্গে কাজ করে যেতে হবে পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরকে। দেশীয় পর্যটন বিকাশের পাশাপাশি বিদেশি পর্যটক আকর্ষণে প্রচার-প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। পাশাপাশি এ শিল্পের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। একজন পর্যটক দেশে আসা মানে ১১টি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়, পর্যটনের সাথে বিমান পরিবহণন, হোটেল, ট্যুরিস্ট গাইড, ট্রাভেল এজেন্সি, ট্যুর অপারেটর নানাভাবে সম্পৃক্ত। সুতরাং পর্যটনশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্যগুলো অক্ষত থাকতে পারে না।

আশার কথা, পর্যটনশিল্পের বিকাশে সরকার স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এটি বাস্তবায়িত হলে পর্যটন খাত হবে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম উৎস। বিশ্ব একটি বই। যারা ভ্রমণ করে না তারা যেন এই বই এর শুধু একটা পৃষ্ঠা পড়ল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি, দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী'। দেখার জন্য ভ্রমণ। জানার জন্য ভ্রমণ। প্রবৃদ্ধির জন্য পর্যটন।

লেখক : তথ্য অফিসার, প্রথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

নারীর প্রতি নির্যাতন বন্ধে চাই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

উম্মে ফারুয়া

সুমির বয়স এখন ৩৫ বছর। ১০ বছর আগে এইচএসসি পড়ার সময় বিয়ে হয় সুমির। ভালো পরিবার ও ভালো ছেলে দেখে মা-বাবা তার বিয়ে দেন। বিয়ের পর দুই বছর বেশ ভালোই চলল সংসার। বছর না ঘুরতেই ছেলেসন্তানের মা হন সুমি। এরপর তার স্বামীর আসল চেহারা একটু একটু করে প্রকাশ পেতে থাকে। বিভিন্ন অজুহাতে স্বামী তাঁকে হেনস্তা করে। সংসারে তার মতামতের কোনো মূল্য নেই। ব্যাবসা করবে বলে একদিন স্বামী সুমিকে বাবার বাড়ি থেকে এক লাখ টাকা এনে দিতে বলে। প্রথমে বাবার কাছ থেকে সে টাকা এনে দেয়। কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার টাকা চায়। বাবার আর্থিক অবস্থা জানে সুমি, তাই সে তার স্বামীকে টাকা দিতে পারবে না বলে জানায়। এর পর থেকেই শুরু হয় তার ওপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন। সন্তানের কথা ভেবে প্রথমে নির্যাতন সহ্য করে সুমি। এক সময়ে সুমির ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। বের হয়ে আসে স্বামীর ঘর থেকে। বাবার বাড়ি হয় তার আশ্রয়। হতাশা আর দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়ে সে। কিন্তু বাবার প্রেরণায় মনোবল ফিরে পায় সে। বাবার পরামর্শে সেলাই প্রশিক্ষণকেন্দ্রে গিয়ে সেলাইকাজ শেখা শুরু করে। প্রথমে বাড়িতে বসে সেলাইকাজ শুরু করে, প্রতিবেশীদের কাছ থেকে নানা কাজের অর্ডার পেতে থাকে। ব্যাবসা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। টাকা জমিয়ে সে একটি দোকান ভাড়া নেয়। আজ সে একটি টেইলারিং দোকানের মালিক। সে শুধু নিজের ভাগ্যই পরিবর্তন করেনি, অনেক মেয়ের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করেছে। সুমির মতো অনেক নারী আমাদের সমাজে এই ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। নির্যাতনের শিকার হয়ে স্বামীর ঘর ছেড়ে অনেকে নিজের চেষ্টায় স্বাবলম্বী হয়েছে; কিন্তু অনেক মেয়েই তা পারে না।

আন্তর্জাতিকভাবে নারীর প্রতি সহিংসতাকে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন হিসেবে দেখা হয়েছে। কেননা নারীর প্রতি সহিংসতা শুধু নারীর অধিকারকেই ক্ষুণ্ন করে না, বরং মানবতা, অর্থনীতি, সমাজসহ দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে বাধাগ্রস্ত করে। নারীর প্রতি সহিংসতার কারণ দেশ-কাল পাত্রভেদে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তাই এর প্রতিকারও করতে হবে সংস্কৃতি ও মানসিকতার

অবস্থাকে লক্ষ্যে রেখে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সহিংসতার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে–কোনো প্রকার কাজ বা আচরণ যার ফলে নারী শারীরিক, মানসিক, যৌন ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা এ ধরনের ক্ষতিসাধনের হুমকি দিলে, নারীর স্বাধীনতা খর্ব করলে, স্বাধীন মনোবৃত্তির বিকাশ থেকে বঞ্চিত করলে তাকে নির্যাতিত বা সহিংসতা হিসেবে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। নারীর নির্যাতন শুধু আমাদের দেশেই নয়, বিশ্বজুড়েই নারীর প্রতি সহিংসতা রয়েছে। তবে অনুন্নত, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এর মাত্রা অনেক বেশি। এখনো বিশ্বে প্রতি তিনজন নারীর মধ্যে একজন শারীরিক, মানসিকসহ নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হন। নারীর প্রতি সহিংসতা তাঁর মর্যাদাকে হেয় করে, তেমনি একপর্যায়ে নারী নিজেকেও দোষী ও ছোটো ভাবতে শুরু করেন। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ শুধু মেয়েদের কল্যাণের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য জরুরি। বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমঅধিকারের কথা বলা হয়েছে এবং দেশের বিদ্যমান আইন, নীতি ও কৌশলেও নারী-পুরুষের সমতার কথা উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রধান কারণগুলো হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, দুর্বলতা, দারিদ্র্য ও বাসস্থানের অভাব এবং সহিংসতা প্রতিরোধ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের অভাব। দক্ষিণ এশিয়া নারীর ওপর পারিবারিক নির্যাতনকে খুব সাধারণ ঘটনা হিসেবে দেখা হয়। ফলে বর্তমানে তা সহিংসতার আকার ধারণ করছে। যৌতুকের জন্য নারীর ওপর নির্যাতন; বাল্যবিয়েতে বাধ্য করা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করাসহ স্বামী, শাশুড়ি ও পরিবারের অন্যদের নারীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা; শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করাসহ আরো নানাভাবে নারীরা নির্যাতিত হয়ে থাকেন। গৃহ, রাস্তাঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শপিং মল, অফিস–এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে নারীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন না। শিক্ষিত-অশিক্ষিত অধিকাংশ নারীই কোনো না কোনোভাবেই নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। নির্যাতনের পরিণতি হচ্ছে পঙ্গুত্ব, দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা, মানসিক ভারসাম্যহীনতা, লজ্জা ও অপমানে আত্মহত্যা, সামাজিকভাবে অপদস্থ হওয়া, অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, অনেক ক্ষেত্রে চরম পরিণতি মৃত্যু।

করোনা অতিমারির সময়ে নারী ও শিশু সহিংসতা থেকে রেহাই পাইনি। আগের যেকোনো বছরের চেয়ে করোনাকালীন ও পরবর্তী সময়ে সহিংসতার পরিমাণ রেড়েছে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল ধর্ষণ ও পারিবারিক সহিংসতা। পুলিশ

সদর দপ্তর জানিয়েছে, গত বছরের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ১১ মাসে ২০ হাজার ৭১৩ জন নারী ও শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এ ছাড়া দেশে গত ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে ধর্ষণ, নারী নির্যাতন এবং রাহাজানির ঘটনা বেড়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদসচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। গত ২২ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রতিবেদন উত্থাপন করা হয়। নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, দেশের ৭২.৬ শতাংশ বিবাহিত নারী তাঁদের জীবনে স্বামীর দ্বারা এক বা একাধিক ধরনের সহিংতার শিকার হন। ৪৯.৬ শতাংশ নারী শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। এই নারীদের মধ্যে মাত্র ২.৬ শতাংশ আইনগত পদক্ষেপ নিয়েছেন। অনেক নারী এখনো মনে করেন যে স্বামী স্ত্রীকে মারধর করতে পারে। সহিংসতার শিকার বেশির ভাগ নারী ও কিশোরী ঝামেলা এবং লোকলজ্জার ভয়ে কোনো ধরনের আইনি সহায়তা নিতে চায় না। বাংলাদেশে স্বামী নির্যাতনের কারণে ৭.১ শতাংশ নারী আত্মহত্যার চেষ্টা চালান। নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক বা প্রথাগত সামাজিক রীতিনীতির কারণে অনেক সময় রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রেও কিছুটা প্রভাব ফেলে। যেমন : বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারা অনুযায়ী, স্ত্রীর বয়স ১৪ বছরের কম হলে বৈবাহিক ধর্ষণ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং মহামান্য হাইকোর্টের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে একাধিক আইন ও বিধি প্রণয়ন করেছে। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন প্রণয়ন তার বড়ো উদাহরণ।

বাংলাদেশ নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ (সিডিও) সনদে স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বাজেট নারীবান্ধব করা হয়েছে। নারী-পুরুষের সমতার বিষয়ে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সংস্থা ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর উইমেন্স অ্যান্ড চিলড্রেনস ডেভেলপমেন্টের চেয়ারম্যান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুর সহায়তায় বিভাগীয় শহরে মহিলা সহায়তা কেন্দ্র চালু রয়েছে। এ কেন্দ্রে নির্যাতনের শিকার নারীদের আশ্রয়, বিনা খরচে আইনগত পরামর্শ ও মামলা পরিচালনার জন্য সহায়তা দেওয়া হয়। সাতটি বিভাগীয় শহরসহ ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে ও এর মাধ্যমে

একই জায়গা থেকে সমন্বিতভাবে চিকিৎসাসেবা, আইনগত সেবা, পুলিশি সহায়তা, আশ্রয় ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টারের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারীকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ন্যাশনাল হেল্প লাইন সেন্টারের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারী, শিশু বা তার আত্মীয়-স্বজনের সাথে কথা বলে তার সমস্যা প্রসঙ্গে জানার চেষ্টা করা হয় এবং নির্যাতনের ধরন অনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে পরামর্শ প্রদান করা হয়। দেশের ৪০টি জেলা ও ২০টি উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল হতে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হয়। মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের আশ্রয়কেন্দ্র এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিরাপদ আবাসন, বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠনের আশ্রয়কেন্দ্রে নারী ও শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে।

কন্যা, জায়া, না হয় জননী, যেকোনো নারীর পরিচয়ই এই তিনটি সূত্রে গাঁথা। নিজ গৃহে কিংবা কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ প্রদর্শন করতে হবে। সহকর্মী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিযোগী না ভেবে সহযোগী ভাবতে হবে। যেকোনো কাজ বা সিদ্ধান্তের বিষয়ে অবশ্যই নারীর মতামত বিবেচনা করতে হবে। সহিংসতার আকার যেমন হোক না কেন, তা প্রকৃত অর্থে মানবতার জন্য কলঙ্ক। আমাদের প্রত্যাশা, যথার্থ সরকারি উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি বেসরকারি খাত এবং সুশীল সমাজের অংশীদারি নিশ্চিত হোক। কেননা সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ করা সম্ভব বলেই আমরা বিশ্বাস করি। তাই আসুন, আমরা সবাই নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সচেতন হই, আমাদের নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করি।

লেখক : ফ্রিল্যান্সার

স্বপ্নপূরণের নতুন দিগন্তে বাংলাদেশ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুন্সীগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে ফলক ও ম্যুরাল-১ উন্মোচনের মাধ্যমে ২৫ জুন ২০২২ তারিখে 'পদ্মা সেতু' উদ্বোধন করেন

স্বপ্নের পদ্মা সেতু

রাজধানীর উত্তরা-আগারগাঁও সেক্টরে মেট্রোরেলের পরীক্ষামূলক চলাচল

মেট্রোরেলের লাইন

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নির্মিত বীর নিবাস

নির্মাণাধীন কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশন

চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত বঙ্গবন্ধু টানেলের মডেল দেখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত বঙ্গবন্ধু টানেল

পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন

নির্মাণাধীন ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতুর পাশে নির্মিত হচ্ছে দেশের একক বৃহত্তম বঙ্গবন্ধু রেল সেতু

যমুনা নদীর ওপর নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু রেল সেতু

এলএনজি টার্মিনাল

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

কক্সবাজারের খুরুশকুলে নির্মিত দেশের বৃহত্তম আশ্রয়ণ কেন্দ্র

বাংলাদেশ সচিবালয়ের নির্মাণাধীন নতুন ভবন (প্রস্তাবিত ১৩ নম্বর বিল্ডিং)

তথ্য অধিদফতর কর্তৃক সাত খণ্ডে প্রকাশিত 'সংবাদপত্রে পদ্মা সেতু' সংকলনের একটি সেট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেন মাননীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, এমপি

মধুমতী নদীর উপর নড়াইলের কালনা পয়েন্টে নবনির্মিত দেশের প্রথম ৬ লেনের দৃষ্টিনন্দন মধুমতী সেতু